দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেসময় কবিতা নিয়ে মিছিল হত এ শহরের বুকে। স্লোগান উঠত 'আরও কবিতা পড়ুন'। সেই সময় কবিতা লিখত এক তরুণ। স্কুলে থাকতে অল্পস্বল্প। কলেজে এসে নিয়মিত সিনেট হলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সে বক্তৃতা দিত অন্য সব তরুণ কবিদের সঙ্গে। বলত—'আমি এখন যা লিখছি সে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক। তার মানে ভবিষ্যতে আমার কবিতা ছাত্রছাত্রীরা পড়তে বাধ্য হবে। সেহেতু এখন আমার কোনো পাঠক না থাকলেও চলবে।' কবিতা লিখবে বলেই তাঁর গ্রাম থেকে শহরে আসা, চাকরির নিশ্চিন্ত ঘেরাটোপ ছেড়ে বেরিয়ে আসা। বের হল তাঁর প্রথম কবিতার বই 'নক্ষত্রের আলোয়'। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা কবিতাপ্রেমীর নোটবুকে যোগ হল আরও একটি নাম—বিনয় মজুমদার, কবিতার পাগলামি যার জীবনভর কাটল না। লিখলেন— 'ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম? / লীলাময়ী করপুটে তোমাদের সবই ঝরে যায়—' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থরূপে পাঠকের হাতে এল সেই কিংবদন্তি বই—'গায়ত্রীকে'। প্রথম সংস্করণে চোদ্দোটি কবিতা। তারপর আরও কিছু বাড়ল। শেষমেশ সাতাত্তরটি কবিতা নিয়ে নাম বদলে এই বই-ই তৈরি করল 'ফিরে এসো চাকা'-র ইতিহাস। তারপর থেকে ক্রমেই হাতে এল 'অধিকন্তু', 'অম্লানের অনুভূতিমালা'-র মতো গ্রন্থগুলি। বিনয় রুশ থেকে বাংলায় অনুবাদ করলেন কবিতা। এভাবেই আস্তে আস্তে আমরাও একদিন এক হয়ে গেলাম তাঁর কাব্য অনুভবে। জানলাম—'এইভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ-ভবিষ্যৎ ডাকে, / ডাক দিয়ে যায় সব সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়।' বাংলা কবিতার সেই ভিন্ন স্বরের অধিকারই ধরা থাকল এখানে, তাঁর প্রথম প্রকাশিত পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের সমাহারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্যসমগ্র
(প্রথম খণ্ড)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্যসমগ্র

প্রথম খণ্ড

বিনয় মজুমদার

সম্পাদনা

শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিভাস

প্রতিভাস ❑ কলকাতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচ্ছদ সুদীপ্ত দত্ত

প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৪০০, এপ্রিল ১৯৯৩
দ্বিতীয় প্রতিভাস সংস্করণ ২৩ জানুয়ারি, বইমেলা, ২০০০
তৃতীয় প্রতিভাস সংস্করণ বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৬
চতুর্থ প্রতিভাস সংস্করণ বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৪

প্রতিভাস-এর পক্ষে বীজেশ সাহা কর্তৃক ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড কলকাতা- ৭০০০০২ (দূরভাষ : ২৫৫৭ ৮৬৫৯) থেকে প্রকাশিত এবং বইপাড়া পাবলিকেশনস্ (প্রিন্টিং বিভাগ), ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড কলকাতা- ৭০০০০২ (দূরভাষ : ৬৫৪৪-৪৮৯৮) থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

KABYASAMAGRA (VOL.1)
a collection of bengali poems
by Benoy Majumdar
Published by Prativash
18A, Gobinda Mondal Road, Kolkata 700002

দাম ১৭৫ টাকা **Rs. 175 $ 10**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণ : সম্পাদকের নিবেদন

বিনয় মজুমদারের কবিতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বুদ্ধদেব বসুর 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র মাধ্যমে, ১৯৭৩-৭৪ সালে। তখনও আমি স্কুলের ছাত্র। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'য় 'ফিরে এসো, চাকা' থেকে মাত্র পাঁচটি কবিতা নেওয়া হয়েছিলো। সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ সেই বয়সে ঐ পাঁচটি কবিতার বহুমাত্রিক ইঙ্গিত ও অতলান্তিক গভীরতা ঠিক মতো বুঝতে পারিনি সত্যি; কিন্তু মনে পড়ে, কবিতাগুলি আমাকে মুগ্ধ ও মাতাল ক'রে দিয়েছিলো তাদের অ-পূর্ব ধ্বনিমাধুর্যে, চিত্রকল্পের মনোমুগ্ধকর অজস্রতায়। সেই থেকেই বিনয় মজুমদারের কবিতা আমার প্রতিদিনের সঙ্গী।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিনয় মজুমদারের 'কাব্যসমগ্র'র প্রকাশ খুবই উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। এই গ্রন্থটি প্রকাশ ক'রে 'প্রতিভাস'-এর শ্রী বীজেশ সাহা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

বিনয়ের অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থ দীর্ঘ দিন ধ'রে ছাপা নেই। সেই কারণে বহুদিন আগে আমি তাঁর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি হাতে লিখে নিয়েছিলাম এবং এইভাবেই প্রস্তুত করেছিলাম বিনয় মজুমদারের কাব্যসমগ্র—সম্পূর্ণতই আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য। বিনয়ের মতো অসামান্য প্রতিভাবান কবির কাব্যসমগ্র সম্পাদনার দায়িত্ব একদিন আমাকেই নিতে হবে—এ-কথা কোনোদিন ভাবিনি। যা আমার একান্তই ব্যক্তিগত ছিলো তা আজ সকলের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করছি।

'কাব্যসমগ্র'র শুরুতেই বিনয়ের লেখা 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধটি দেওয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধে বিনয় এক দুর্লভ নিস্পৃহ ভঙ্গীতে নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। অতিরিক্ত কিছু তথ্য 'গ্রন্থপরিচয়' বিভাগের 'আত্মপরিচয়' অংশে দেওয়া হয়েছে।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে প্রকাশিত বিনয়ের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ—নক্ষত্রের আলোয় ; গায়ত্রীকে ; ফিরে এসো, চাকা ; অধিকন্তু এবং অঘ্রানের অনুভূতিমালা কাব্যসমগ্রর এই খণ্ডে সংকলিত হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, 'গায়ত্রীকে' স্বতন্ত্র কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়, এটি 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণ। পাঠকসাধারণের কৌতূহলের কথা ভেবে 'গায়ত্রীকে'কে এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থটিকে বর্তমান কাব্যসমগ্রর প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কারণ, বিনয় এই গ্রন্থটিকে পরিমার্জনা করতে চেয়েছেন। 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থটি 'কাব্যসমগ্র'র দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে।

'পরিশিষ্ট' ও 'গ্রন্থপরিচয়' বিভাগ দুটি আশা করি গুরুত্বপূর্ণ ব'লে বিবেচিত হবে। এই বিভাগ দুটিতে আমাকে লেখা বিনয় মজুমদারের চিঠিপত্রের কিছু কিছু অংশ ব্যবহার করেছি।

কবিতার এক 'দুরারোহ নভোলীন' শিখরে আরোহণ করা সত্ত্বেও বিনয়ের কবিখ্যাতি এখনও পর্যন্ত কবিতার মনস্ক এবং অগ্রসর পাঠকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আশা করা যাক, কাব্যসমগ্র-প্রথমখণ্ড প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই বিনয়কে নিয়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনা শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে যার ফলে বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর পাঠকসমাজ বিনয় মজুমদার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবেন। ভালো হয়, যদি কেউ এখনই বিনয় মজুমদারের একটি জীবনী রচনার কাজে হাত দেন।

বিনয় মজুমদারের মতো কবির সাহচর্য ও স্নেহ লাভ ক'রে আমি ধন্য। বিভিন্ন প্রয়োজনে বারবার তাঁকে বিরক্ত করেছি। আমাকে বিমুখ না-ক'রে আমার বহু প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন।

'পরিশিষ্ট' অংশে বুদ্ধদেব বসু ও জ্যোতির্ময় দত্তর করা 'ফিরে এসো, চাকা'র কিছু কবিতার ইংরাজি অনুবাদ এবং জ্যোতির্ময় দত্তর লেখা 'বিনয় মজুমদার' শিরোনামে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়ার জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীজ্যোতির্ময় দত্তকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। তৃতীয় মলাটে ব্যবহৃত বিনয় মজুমদারের আলোকচিত্রটি তুলে দিয়েছেন শ্রীগৌতম দে। এছাড়া কোনো-না-কোনো ভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীঅশোক মিত্র, শ্রীসত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসোমক দাস, শ্রীকল্যাণ ভট্টাচার্য, শ্রীগৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদকীয় প্রয়োজনে যে-সব গ্রন্থ ও পত্রিকা থেকে সাহায্য নিয়েছি, সে-সব গ্রন্থ ও পত্রিকার লেখক, সম্পাদক এবং প্রকাশককে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

'গ্রন্থ পরিচয়' ও 'পরিশিষ্ট' বিভাগের 'ফিরে এসো, চাকা' সংক্রান্ত অংশগুলি ইতিপূর্বেই "বিভিন্ন সংস্করণে 'ফিরে এসো, চাকা'" নামে 'যোগসূত্র' পত্রিকার জানুয়ারি, ১৯৯৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সুযোগে 'যোগসূত্র' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্পাদনার কাজকে ত্রুটিমুক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তবু কোনো ত্রুটি নজরে এলে সহৃদয় পাঠকপাঠিকা আমাকে তা জানাবেন আশা করি।

আমার মতো নবীন এবং অনভিজ্ঞ একজনকে বিনয় মজুমদারের 'কাব্যসমগ্র' সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে শ্রীবীজেশ সাহা নিশ্চিতভাবেই ভুল করেছেন, কিন্তু এই ভুলেই জন্যই তিনি আমাকে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ক'রে রাখলেন।

১লা বৈশাখ, ১৪০০ — তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় সংস্করণ : সম্পাদকের নিবেদন

বিনয় মজুমদারের কাব্যসমগ্র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণের কিছু ভুল শুধরে দেওয়া ছাড়াও পরিশিষ্টমালায় চারটি নতুন বিভাগ যোগ করা হয়েছে। বিভাগ চারটি হলো : ক) বিষ্ণু দের কবিতাভাষার দ্বারা প্রভাবিত বিনয় মজুমদারের একটি কবিতা, খ) প্রাক-'ফিরে এসো, চাকা'-পর্বে রুশ থেকে অনূদিত কিছু টুকরো কবিতা—'সেকালের বৃথারায়' থেকে, গ) 'ফিরে এসো, চাকা' রচনার সময়সারণি ঘ) বিনয় মজুমদারের কবিতাতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

আশা করি, এই সংযোজন পাঠকদের ভালো লাগবে। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একাধিক লেখক থাকায়, আমি আমার নামের আগে 'শ্রী' যোগ করা শুরু করলাম।

১লা বৈশাখ, ১৪০৬ শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

প্রথম পঙক্তির সূচী ১০
আত্মপরিচয় ১৫

নক্ষত্রের আলোয়

উন্মোচনের গান ২৭
চিরদিন একাএকা ২৮
শীত ২৮
নক্ষত্রের আলোয় ২৯
কোনো রূপকথা ২৯
রৌদ্রে ৩০
সে ৩০
কেন মনোলীনা ৩১
তোমার দিকে ৩১
এই আকাঙ্ক্ষা ৩২
প্রজাপতি ৩২
আকাশের এই ৩৩
বিচ্ছেদের সময়ে ৩৩
আর শোনায়োনা ৩৪

গায়ত্রীকে ৩৫

ফিরে এসো, চাকা ৪২

অধিকন্তু ৭৪

অঘ্রানের অনুভূতিমালা ৮৩

পরিশিষ্টমালা
ক. বিষ্ণুদের কবিতাভাষার দ্বারা প্রভাবিত বিনয় মজুমদারের একটি কবিতা ১২৩
খ. প্রাক-'ফিরে এসো, চাকা' পর্বে রুশ থেকে অনূদিত কিছু টুকরো কবিতা— 'সেকালের বুখারায়' থেকে ১২৪
গ. 'ফিরে এসো, চাকা' রচনার সময়-সারণি ১২৭
ঘ. বিনয় মজুমদারের কবিতাতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১২৯
ঙ. 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থের ভূমিকা ১৩২
চ. 'আমার ঈশ্বরকে' থেকে ছ'টি কবিতা ১৩৩
ছ. 'আমার ঈশ্বরীকে' থেকে আরও একটি কবিতা ১৩৭
জ. বিনয় মজুমদার সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞাপন ১৩৮
ঝ ইংরাজি অনুবাদে 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতা ১৩৯
ঞ. বিনয় মজুদারের হাতের লেখায় 'ফিরে এসো, চাকা'র একটি কবিতা ১৪৮

গ্রন্থপরিচয় ১৪৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পঙ্‌ক্তির সূচি

অত্যন্ত নিপুণ ভাবে আমাকে আহত ক'রে রেখে ৫৪
অনেক সন্ধান ক'রে নীতি নয়, প্রেম নয়, সার্থকতা নয় ৩৬
অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতার ৫১

আকাশ ক্রমে করছে পান অগাধ তৃষ্ণায় ৩২
আকাশআশ্রয়ী জল বিস্তৃত মুক্তির স্বাদ পায়, পেয়েছিলো ৪৩
আকাশের এই অসীমে তোর কি ফোটেনা প্রাণ ৩৩
আঘাত দেবে তো দাও, আর নেই মৃত স্মৃতিরাশি ৭৩
আমরা সকলে দ্যাখো, যে-কোনো বিন্দুতে যেতে পারি ৭৯
আমাদের অভিজ্ঞতা সিক্ত গিরিখাতের মতোন ৪৭
আমাদের দুজনের দৈনন্দিন চিন্তাগুলি, চিন্তাধারাগুলি ৭৬
আমাদের গতিবিধি উন্মোচনে অবশেষে বোধ্য হয়ে গেছে ৭৮
আমার সৃষ্টিরা আজ কাগজের ভগ্নাংশে নিহিত ৫৯
আমার বাতাস বয়, সদ্যোজাত মরুভূমি থেকে ৬৫
আমার আশ্চর্য ফুল যেন চকোলেট, নিমেষেই ৭০
আমার ও ঈশ্বরীর প্রায়াবচেতনা আর অতিচেতনার ৭৫
আমিই তো চিকিৎসক, ভ্রান্তিপূর্ণ চিকিৎসায় তার ৫৭
আর অন্ধকার নয়, আর নয় অবাঞ্ছিত ছায়া ৫৫
আর যদি নাই আসো, ফুটন্ত জলের নভোচারী ৫০
আর শোনায়োনা সুন্দরী, তুমি সিংহলের ঐ বিষাদবিধুর গান ৩৪
আরো কিছু দৃশ্যাবলী দেখেছি, জীবিতকালে যারা ৫৮

ঈপ্সিত শিক্ষায়তনে যাবার বাসনা হয়েছিলো ৬৬
ঈশ্বরী কেবলমাত্র আমি শুদ্ধ আত্মা অবস্থায় ৭৫

উদয়ের কালে সূর্য বৃহৎ, রক্তাভ হয়ে ওঠে ৪০

এইভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যৎ ডাকে ১৩৪
এই যে জীবন, জানি জীবনের অনেকাংশ, অধিকাংশ জানি ৭৯
একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে (গায়ত্রীকে) ৩৫
একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে (ফিরে এসো, চাকা) ৪২
একটি চম্বুক ভেঙে খণ্ড খণ্ড করা হলে তার ৪১
একটি বৎসর শুধু লাস্যময়ী অগ্নির সকাশে ৬২
একটি নক্ষত্র এলো, সৎসাহসের মতো আজ তাকে পেলে ৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[illegible] আমি, ব্যক্তিগত পবিত্রতাহীন ৬৬
[illegible] আমি ঈশ্বরীকে প্রশ্ন করি জ্ঞাতব্য বিষয়ে ৮১
[illegible] ভালো ; কবিতার প্রথম পাঠের ৬৭

[illegible] আমি ; অন্ধকারে একটি জোনাকি ৭২
[illegible] রূপকথা বলে কোটালকুমার আর রাজকুমারেরা ২৯
[illegible] যেন একবার বিদ্ধ হয়ে বালুকাবেলায় ৬৭
[illegible] তরুতে সেই আকাঙ্ক্ষিত গোলাপ ফোটেনি ৭২
[illegible] চিলের মতো সারাদিন, সারাদিন ঘুরি ৬৯
কাগজকলম নিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকা প্রয়োজন আজ (গায়ত্রীকে) ৩৭
কাগজকলম নিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকা প্রয়োজন আজ (ফিরে এসো, চাকা) ৪৪
কালের পশ্চাদপটে সদাসমপরিবর্তী কোনো ৭৭
কিছুটা সময় তবু আমাকেও ক'রে নিয়ে হবে ৬০
কী উৎফুল্ল আশা নিয়ে সকালে জেগেছি সবিনয়ে ৪৮
কী যে হবে, কী যে হয়, এখনো অনেক রীতি বাকি ৪৯
কেন এই অবিশ্বাস, কেন আলোকিত অভিনয় ৫৫
কেন তবে তুমি দিঘির শরীরে ছুঁড়েছিলে ঢিল ৩১
কেন যেন স'রে যাও রৌদ্র থেকে তাপ থেকে দূরে ৪৫
কেবলি বিষয়বস্তু খুঁজে খুঁজে অবশেষে কবি ভেবে দ্যাখে ৩৮
কেমন মোহানা চুপে, মোহানারই মতো হয়ে চারিপাশে-এলিয়ে রয়েছে ১০৬
কোনোদিন একবার উদ্যানে বেড়াতে গেলে পরে ৬১
কোনো ঘটনার কিংবা ব্যাপারের আগে আর পরে ৭৬
কোনো যোগাযোগ নেই, সেতু নেই, পরিচয় নেই ৬৫
কোনোরূপ শর্তহীন আয়াস প্রয়োগ প্রয়োজনীয়তাহীন ৮১
কোনো সফলতা নয় ; আকাশের কৃপাপ্রার্থী তরু ৬৩
কোনো স্থির কেন্দ্র নেই, ক্ষণিক চিত্রের মোহে দুলি ৬২
ক্রিসেনথেমাম ফুল—ফুলে-ফুলে একাকার ভোরের কেয়ারি ৮৮
ক্ষীণদৃষ্টি মানুষের চোখে ওই উজ্জ্বল তারাটি ৩৯

খেতে দেবে অন্ধকারে—সকলের এই অভিলাষ ৭০

গুনে-গুনে ছেড়ে দিই, নিজেও সুস্থির পায়ে নামি ৪৮

চতুর্দিকে অগণন সরস পাতার মাঝে থেকে ৩৯
চাঁদ নেই, জ্যোৎস্নার অমলিন জ্বালা নেই, তবু ২৯
চাঁদের ছায়ার নিচে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ৪১

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিৎকার আহ্বান নয়, গান গেয়ে ঘুম ভাঙালেও ৭১
চিন্তাক্ষমদের মনে চিন্তাগুলি আবির্ভূত হয় ৭৪
চিরদিন একাএকা অবরোধে থেকে ২৮

তাকাই সামনে সোজাসুজি ৩০
তিন পা পিছনে হেঁটে পদাহত হয়ে ফিরে আসি ৫৩
তুমি তো কথা বলো ২৭
তুমি যেন ফিরে এসে পুনরায় কুণ্ঠিত শিশুকে ৭৩
তোমায় যে-দিন পেয়েছি সে-দিন ১২৩
তোমার দিকে তাকাই আমি দেখি অতল চোখ ৩১
তোমাদের কাছে আছে সঙ্গোপন, আশ্চর্য ব-দ্বীপ ৬৯

দেখা গেছে, চতুষ্পার্শ্বে দূরে কাছে সবার সহিত ৮০

ধূসর জীবনানন্দ, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে ৫৭
ধূসর, ধূসরতর, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে ১৩৭

নাকি স্পষ্ট অবহেলা, কোরকে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজো ৪৭
নানা কুন্তলের ঘ্রাণ ভেসে আসে চারিদিক থেকে ৬৮
নিকটে অমূল্য মণি, রত্ন নিয়ে চলার বিতান ৫১
নেই, কোনো দৃশ্য নেই, আকাশের সুদূরতা ছাড়া ৫০

পদ্মপাতার 'পরে জল টলমল করে ; কাছে কোনো ফুলতো দেখিনা ২৮
পর্দার আড়ালে থেকে কেন বৃথা তর্ক ক'রে গেলে ৪৯
পুরোনোরা পরিত্যক্ত, নতুনের সন্নিধানে বিহ্বল কবির ৩৭
পৃথিবীর কাজে ব্যস্ত, ভিজে মুখ দুপুরের ঘামে ৩০
পৃথিবীর মানুষের জন্ম মরণের রীতি, নীতি ও নিয়ম ৭৮
প্রকৃষ্ট সময় ব্যয় করার পূর্বাহ্নে সে-সময় ৭৫
প্রত্যাখ্যাত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন ৫৫

বড়ো বৃদ্ধ হয়ে গেছি, চোখের ক্ষমতা ক'মে গেছে ৬৪
বলা যায়, কোনোদিন কারো বিরুদ্ধেই, কারো সঠিক প্রয়োজনের বিরুদ্ধে কিছুই ৭৯
বলেছি, এভাবে নয়, দৃশ্যের নিকটে এনে দিয়ে ৪৬
বহুতর আয় আজ মানুষের চতুষ্পার্শ্বময় ১৩৬
বহু সম্ভাব্যতা দেখি, দেখি দুটি আপ্লুত নয়ন ১৩৫
বাচ্যার্থ, নিহিত অর্থ, বিশ্লেষিত শরীরিক রূপ ৩৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতাস আমার কাছে আবেগের মথিত প্রতীক ৬৫
বিচ্ছেদের সময়ে যা চিরদিন হয়, ঠিক তাই ৩৩
বিদেশী ভাষায় কথা বলার মতোন সাবধানে ৫২
বিনিদ্র রাত্রির পরে মাথায় জড়তা আসে, চোখ জ্ব'লে যায় (গায়ত্রীকে) ৩৬
বিনিদ্র রাত্রির পরে মাথায় জড়তা আসে, চোখ জ্ব'লে যায় (ফিরে এসো, চাকা)৪৫
বিস্ময়কর, অতি স্পষ্ট ভবিষ্যৎ প'ড়ে আছে আজ ১৩৬
বিশাল দুপুরবেলা চারদিকে ফুটে আছে, ফুটে আছে আকাশে-আকাশে ৯৮
বেশ কিছু কাল হলো চ'লে গেছো, প্লাবনের মতো ৫০
ব্যর্থতার সীমা আছে ; নিরাশ্রয় রক্তাপ্লুত হাতে ৬৩

ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম ৬৮
ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের ৮১

মনের নিভৃতভাগ লোভাতুর, সতত সুগ্রাহী ৫৮
মর্ত্যলোকে বাসকালে এ-বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হয়েছি ৮০
মস্তিষ্কে নিহিত সব ধারণাকে যূথবদ্ধ রূপে ৭৭
মাংসল চিত্রের কাছে এসে সব ভোলা গিয়েছিলো ৩৬
মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক স্বল্পকাল হাসে (গায়ত্রীকে) ৩৫
মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক স্বল্পকাল হাসে (ফিরে এসো, চাকা) ৪২
মুক্ত ব'লে মনে হয় ; হে অদৃশ্য তারকা, দেখেছো ৫৩

যখন কিছু না থাকে, কিছুই নির্মেঘ লভ্য নয় ৬৯
যখনই বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধন করা প্রয়োজন হয় ৭৯
যদি কাছাকাছি থাকি তবে আর অকারণে উদয়ের ভাবনায় কখনো পড়ি না ১১৮
যদি পারো তবে আনো, আনো আরো জয়ের সম্ভার ৫৭
যাক তবে জ্ব'লে যাক জলস্তম্ভ, ছেঁড়া ঘা হৃদয় ৭১
যে-কোনো অনবহিত বিষয়ে জানতে হলে, বিষয়ে ভাবতে হলে, দেখি ৮১
যে-কোনো মস্তিষ্কে কিম্বা চিন্তাকরণের স্থানে উপস্থিত কোনো ৭৮
যে-পথ রয়েছে তাকে একমাত্র পায়ে-পায়ে হেঁটে ৬০
যেন প্রজাপতি ধরা, প্রত্যক্ষ হাতের অতর্কিত ৫২

রক্তে-রক্তে মিশে আছে কৌতূহল, লিপ্ত কৌতূহল ৫৪
রসাত্মক বাক্য লেখা কবে যে আয়ত্ত হবে, ভাবি ৫৯
রাফ্লেশিয়া গাছ রূপে এতটা মাংসের মতো যাতে ৪০
রোমাঞ্চ কি রয়ে গেছে ; গ্রামে অন্ধকারে ঘুম ভেঙে ৫৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশুকাল হতে যদি মাত্রাসিদ্ধ পরম বীজাণু ৬৪
শিশুকালে শুনেছি যে কতিপয় পতঙ্গশিকারী ফুল আছে ৪৩
শুধু গান ভালোবাসো ; বিপদার্ত মিলনচিৎকারে ৬১
শুনেছো, স্বপ্নের মাঝে আমাদের অতৃপ্তিরা আসে ১৩৫
শূন্যকে লেহন করো, দেবদারু ঊর্ধ্বগ শাখায় ৬০

সকল কবিতা আজ নিপুণিকা প্রেমিকার মতো ৭৭
সকল বকুল ফুল শীতকালে ফোটে, ফোটে শীতাতুর রাতে ৯২
সকাল বেলায় পাখি আপন নীড়ের থেকে দূরে ৭৪
সন্তপ্ত কুসুম ফুটে পুনরায় ক্ষোভে ঝ'রে যায় ৬২
সবই অতিশয় শান্ত ; নির্বাক ডিমের ভাঙা খোশা ৫৬
সময়ের সঙ্গে এক বাজি ধ'রে পরাস্ত হয়েছি ৪৭
সহাস্য গুলিটি মনে বিদ্ধ হয়ে বহুকাল ছিলো ৬৭
সম্পূর্ণ অযুক্তিবাদী কোনো কারো সঙ্গে কোনো ব্যাপার, বিষয় ৮০
সমীকরণের মতো উপস্থিত শর্তাবলী ৭৬
সুগভীর মুকুরের প্রতি ভালোবাসার মতোন ৫২
সুরার উন্মত্ত হয়ে পদাঘাতে পুষ্পাধারটিকে ৫৯
সেতু চুপে শুয়ে আছে, সেতু শুয়ে আছে তার ছায়ার উপরে ৮৩
স্বপ্নের আধার, তুমি ভেবে দ্যাখো, অধিকৃত দু-জন যমজ ৫৮
স্বপ্নের সুযোগে তুমি দিয়েছিলে সবকিছু—সব ১৩৪
স্রোতপৃষ্ঠে চূর্ণ-চূর্ণ লোহিত সূর্যাস্ত ভেসে আছে ৪৪

হয়তো আলোর ভয়ে হয়তো বা লাজে ৩২
হৃদয়, নিঃশব্দে বাজো ; তারকা, কুসুম, অঙ্গুরীয় ৬৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মপরিচয়

ষোলো থেকেই আমি কবিতা লিখতে শুরু করি। প্রথম কবিতা যখন লিখি তখন আমার বয়স তেরো বছর। নানা কারণে এই ঘটনাটি আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। কারণটির বিষয়বস্তু ছিলো এই : এক পালোয়ান বাজি ধ'রে একটি চলন্ত মোটর গাড়িকে টেনে পেছিয়ে নিয়ে এলো। এর পরেও আমি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতাম। কিন্তু ষোলো-সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত কী লিখেছিলাম, কবিতাগুলির দশা কী হয়েছিলো কিছুই এখন আর মনে নেই।

তখন কলকাতার স্কুলে পড়ি। মাস্টারমশাইরা ঘোষণা করলেন যে স্কুলের একটি ম্যাগাজিন বেরোবে। ছাত্রদের কাছে লেখা চাইলেন। আমি একটি কবিতা লিখে ফেললাম; তার একটি পঙ্‌ক্তি এখনো মনে আছে—'ভিজে ভারি হলো বেপথু যুথীর পুষ্পসার'। মাস্টারমশাই-এর হাতে নিয়ে দিলাম। তিনি প'ড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কিন্তু, কী জানি কেন, সে ম্যাগাজিন আর শেষ পর্যন্ত বেরোলো না। এর পরবর্তী সময়কার কবিতা লেখার ব্যাপার একটু বিশদভাবেই আমার মনে আছে।

স্কুল ছেড়ে কলেজে এসে ভর্তি হলাম। এবং আমার কবিতা লেখার পরিমাণও কিছু বাড়লো। আমার একটি খাতা ছিলো। ডবল ক্রাউন সাইজের, চামড়ায় বাঁধানো, কাগজের রঙ ইটের রঙের মতো। খাতাটি খুব মোটা। আমার সব লেখাই এই খাতায় লিখতাম। স্কুলে কবিতা লিখতাম ক্বচিৎ কদাচিৎ। কিন্তু কলেজে উঠে নিয়মিত লিখতে শুরু করি। লিখতাম বেশ গোপনে গোপনে, যাতে কেউ টের না পায়। কারণ আমি কবিতা লিখি—এ-কথা কেউ বললে খুব লজ্জা হতো আমার। কলেজের হোস্টেলে থাকতাম। ফলে অন্যান্য আবাসিকরা শীঘ্রই জেনে ফেললো যে আমি কবিতা লিখি। আমার ঘরে দুটি সিট ছিল। আমার রুম-মেটই বোধ হয় ফাঁস ক'রে দিয়েছিলো খবরটা। আমাদের রান্নাঘরের দেওয়ালে একটি নোটিশ বোর্ড লাগানো ছিলো। হস্টেল কর্তৃপক্ষের নোটিশগুলি ঐ বোর্ডে আঠা সেঁটে দিয়ে দেওয়া হতো। কিছুদিনের ভিতরেই ঐ নোটিস বোর্ডে আমার লেখা কবিতাও সেঁটে দিতে লাগলাম—সবগুলিরই বিষয়বস্তু হস্টেলের খাবার-দাবার সম্বন্ধে ছাত্রদের অভিযোগ। সবই হস্টেলের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট সম্পর্কে লেখা ব্যঙ্গ কবিতা। প'ড়ে ছাত্ররা কিংবা সুপারিনটেনডেন্ট যে প্রশংসা করতো তা নয়। ডালে কেন ডাল প্রায় থাকেই না, কেবল জল, মাংস কেন ঘন ঘন খেতে দেওয়া হয় না—এই সবই ছিলো নোটিস বোর্ডে সাঁটা কবিতার বিষয়বস্তু। আমার অন্য কবিতা গোপন ক'রে রাখতাম।

কলেজে একটি দেয়ালপত্রিকা ছিলো। খুব সুন্দর হাতের লেখায় শোভিত হয়ে পত্রিকাটি নিয়মিত বেরোতো। হস্টেলে আমি ভিন্ন আর কেউ কবিতা লিখতো না, কিন্তু কলেজে লিখতেন অনেকে। তাঁদের লেখা মাঝে মাঝে কলেজের দেয়ালপত্রিকায় প্রকাশিত হতো। আমার লেখা কবিতা কিন্তু কখনো এ-দেওয়াল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। কলেজের একটি ছাপা বার্ষিক সাহিত্য সঙ্কলনও ছিলো। তাতেও আমার কবিতা কখনো প্রকাশিত হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সময়ে আমার সব কবিতায় মিল থাকতো। মিলগুলি অনায়াসে মন থেকে বেরিয়ে আসতো। তার জন্য একটুও ভাবতে হতো না। কবিতা যখন লিখতাম তখন মনে হতো আগে থেকে মুখস্থ করা কবিতা লিখে যাচ্ছি, এত দ্রুত গতিতে লিখতে পারতাম। এক পয়ার ভিন্ন অন্য সব ছন্দেই লিখতাম। কবিতাগুলির বিষয়বস্তুও ছিলো বিচিত্র, প্রায় সবই কাল্পনিক। দু-একটা বিষয়বস্তুর অংশ আমার এখনো মনে আছে—চিল্কা হ্রদের ধারে এক সঙ্গিনীসহ ব'সে ব'সে চারিপাশে নিসর্গকে দেখছি বা এক সঙ্গিনীসহ মোটরগাড়িতে ক'রে খুব দ্রুতবেগে চলেছি, মনে হচ্ছে গাড়িটি পৃথিবীর একটি উপগ্রহবিশেষ বা ট্রেনে ক'রে দৈনিক লক্ষ লক্ষ কেরানি কী ভাবে চাকুরি করতে কলকাতায় আসে ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সময়ে লেখা কবিতাগুলি খুব দীর্ঘ হতো। ছোটো কবিতা আমি প্রায় লিখতে পারতাম না।

এবার একটু আগের কথা লিখে নিই। আমি যখন দশম শ্রেণীতে পড়ি, মনে হচ্ছে, তখনি সিগনেট বুকশপ নামক দোকানটি সবে খুললো। আমি তখন দৈনিকই বিকালবেলায় ঐ দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতাম। তখন দোকানের মালিক দিলীপবাবু নিজেই দোকানে ব'সে বই বিক্রি করতেন। কী ক'রে যে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলো ঠিক মনে নেই। বোধ হয় বই কিনতে গিয়েই আলাপটা হয়েছিলো। আমি প্রায় দৈনিক একখানা ক'রে কবিতার বই তাঁর কাছ থেকে কিনতাম। রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাছা বাছা কবিদের বই অনেক কিনে ফেললাম, প'ড়েও ফেললাম সব। অথচ কোনো কারণে, সে বইগুলি মনে বিশেষ সাড়া জাগাতে পারে না। বয়স কম ব'লেই হয়তো অমন হতো।

যাই হোক, ইংরাজি ক্ল্যাসিক্যাল কবিদের বই আমি প্রায়ই লাইব্রেরি থেকে এনে পড়তাম। সেই বয়সে তাঁদের কবিতা আমার তেমো ভালো লাগতো না। আবার মনে হচ্ছে, বয়স কম ব'লে অমন হতো—একথা বোধহয় ঠিক লিখিনি। কারণ তখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্যে আমার ভালো লেগেছিলো 'প্রান্তিক' নামক ছোটো বইখানি। এখনো আমার ঐ বইখানিই সবচেয়ে ভালো লাগে। বয়স বাড়ার ফলে আমার সে অল্প বয়সের ভালো লাগা পাল্টায়নি।

যা হোক, আমি নিজে কী লিখতাম সেইটেই এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। 'বিষয়বস্তু' লিখেই মনে পড়লো কবিতা লেখার অন্যতম প্রধান ব্যাপার হচ্ছে একটি ভালো বিষয়বস্তু মনে আসা। তখনকার বিষয়বস্তু ছিলো অধিকাংশ কাল্পনিক—এ-কথা আগেই লিখেছি। শহরের দৃশ্যাবলী—পথ ঘাট মাঠ বাড়ি—এ-সকল আমার কবিতার বিষয়বস্তুতে আসতো না। মাঝে মাঝে গ্রামে আসতাম। গ্রামের দৃশ্যাবলীও আমার বিষয়বস্তু হতো না। অর্থাৎ কেবল বর্ণনামূলক কবিতা আমি সেই বয়সেই লিখতে পারতাম না। এতদিন পরে এখন কিছু কিছু লিখতে পারি। এ-প্রসঙ্গে পরে আবার আসবো।

ইতিমধ্যে কলেজ পালটে অন্য এক কলেজে চ'লে যেতে হলো। সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করতে হতো। সেখানে কলেজের পড়াশুনায় এত বেশি সময় দিতে হতো যে অন্য কোনো বিষয়ে মনোনিবেশ করার সময় পাওয়া যেতো না। ফলে বছর দুয়েক আমার কবিতা লেখা বন্ধ থাকলো। গঙ্গার ধারে কলেজ, পাশেই বোটানিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গার্ডেন। নদীর পাড়ে বিরাট এক কাঠগোলা। আন্দামান থেকে জলপথে নিয়ে আসা বিশাল বিশাল সব কাঠের গুঁড়িতে নদীর পাড় ঢাকা। সেখান থেকে গঙ্গার দৃশ্য অপূর্ব। কিন্তু কেবল বর্ণনামূলক কবিতা আমি তখনো লিখতে শিখিনি। ফলে সেই কলেজে থাকাটা আমার কাব্যচর্চার ভিতরে বিশেষ স্থান পায়নি। সেই কলেজে ছিলাম চার বছর ছাত্রাবাসে। তার প্রথম দু-বছর কবিতা লেখার সময়ই পাইনি। শেষ দু-বছর কিছু কিছু সময় পেতাম এবং মাঝে মাঝে লিখতাম। কাপড়ে বাঁধানো রয়াল সাইজের একটা পাকাও ডায়েরি আমি যোগাড় করেছিলাম। মিল দিতে বিশেষ বেগ পেতে হতো না। মিল যেন আপনিই এসে যেতো। এই কলেজে আসার পর আমি পয়ারে কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় নির্ভুল পয়ার আমি একবারও লিখতে পারতাম না। কোথায় ভুল হচ্ছে সেটি স্পষ্ট টের পেতাম। কিন্তু সে-ভুল শোধরাবার কোনো উপায় খুঁজে পেতাম না। তখন থেকে সুরু ক'রে চার বছর লেগেছিলো আমার পয়ার লেখা শিখতে—'আবিষ্কার করতে' লেখাটাই ঠিক ছিলো মনে হচ্ছে। এবং ১৯৬০ সালের শুরুতে আমি পয়ার লেখার নিখুঁত পদ্ধতি আবিষ্কার করি। তারপর পয়ার ভিন্ন অন্য কোনো ছন্দ লিখিইনি। এখন পয়ারই আমার প্রিয়তম ছন্দ। শুধু পয়ারই লিখি।

নানা কারণে এখন আমার মনে হয় কেউ নিখুঁত পয়ার লিখতে পারলেই তাকে কবি ব'লে স্বীকার করা যায়, স্বীকার করা উচিত।

যাই হোক, সেই বয়সের কথায় ফিরে যাই। আমাদের কলেজ থেকে ছাত্রদের সম্পাদনায় একটি বার্ষিক সাহিত্য সঙ্কলন বেরোতো। তাতে আমার লেখা কবিতা চেয়ে চেয়ে নিতো। গোটা কয়েক কবিতা ছেপেছিলো। এই কলেজে পাঠকালে লেখা কবিতায় কাটাকুটি আবির্ভূত হয়। আগে কাটাকুটি করার বিশেষ দরকার হতো না। এবার দরকার হতে লাগলো। কবিতায় অলঙ্কার বলতে আগে দিতাম শুধু উপমা। এবার কবিতায় উপমার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতীকও ব্যবহার করতে লাগলাম। সে-সময়কার কবিতার খাতাগুলি আমি সব হারিয়ে ফেলেছি। আমার যতদূর মনে পড়ে ঐ কলেজে চার বছরব্যাপী পড়ার সময় আমি গোটা পঞ্চাশ কবিতা লিখেছিলাম। শুধু যে সময়াভাব এর জন্য দায়ী তা নয়, কাব্যিক বিষয়বস্তুর অভাবও এর জন্য দায়ী। অনেক পরে আমি যে-কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করি। অনেক পরে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমার বইয়ের এক সমালোচনায় লিখেছিলো যে আমি যে-কোনো বিষয় নিয়ে কবিতা লিখতে পারি, এমন কি 'গু গোবর' নিয়েও আমি সার্থক কবিতা লিখতে পারি।

কিন্তু তখনো অবস্থা এমন হয়নি। সেই কলেজে পাঠকাল ভাবতাম কিছু বিষয়বস্তু কাব্যিক, আর কিছু বিষয়বস্তু কাব্যিক নয়। এখন আমার মনে হয় ব্যাপারটা তেমন নয়। সব বিষয়বস্তুই কাব্যিক এবং যাঁর দৃষ্টিতে এই কাব্যিকতা ধরা পড়ে, তিনিই কবি। এমন কি, চিন্তা করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে যে-পদ্ধতিতে ভাবলে কাব্যিকতা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বিষয়বস্তুর মধ্যে কাব্যিকতা লুকিয়ে থাকে, তাকে বের করার জন্য চিন্তার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এ-সব কথা আমি টের পাই, বুঝতে পারি ১৯৬০ খৃস্টাব্দের গোড়া থেকে। তার আগে জানতাম না।

যাই হোক, ১৯৫৭ সালও শেষ হলো, আমার কলেজ পড়াও শেষ হলো। পঠদ্দশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ হয়ে গেলো। কলেজের ছাত্রবাস ত্যাগ ক'রে আমি শেষ অবধি কলকাতায় চ'লে এলাম।

এই সময় কুশল মিত্র নামক এক কবির সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁর প্রথম কবিতার বই তখন সবে বেরিয়েছে। যেদিন বেরোলো সে-দিন তিনি বললেন, 'চলুন মিষ্টির দোকানে, আপনাকে মিষ্টি খাওয়াই।' এঁর বইয়ের প্রকাশক দেবকুমার বসুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। অধুনালুপ্ত 'গ্রন্থজগৎ' দোকানটি ছিলো দেবকুমার বসুর। আমি মাঝে মাঝে দেবকুমারবাবুর দোকানে গিয়ে ব'সে থাকতাম। আমি স্থির করলাম আমারো একখানি বই প্রকাশ করা দরকার।

কলকাতায় তখন নিজেকে একেবারে নবাগত ব'লে মনে হতে লাগলো। কফির আসরে, আড্ডাখানাগুলিতে আমি যেতাম আমার অফিস ছুটি হলে পর। দেখতাম আলোচনার বিষয় সর্বত্রই সাহিত্য এবং রাজনীতি। অথচ বাংলা সাহিত্যের খবর আমি তখন তেমন রাখতাম না। রাখার সুযোগই হয়নি ইতিপূর্বে। ফলে আলোচনায় যোগদান করা আমার হতো না। চুপচাপ ব'সে শুনতাম কে কী বলে। তারপর ভাবলাম আর কিছু না হোক লোকজনের সঙ্গে মেশার জন্যই তখনকার আধুনিক কাব্য সাহিত্য কিছু পড়া ভালো। কোথায় কে কী লিখছে তার একটু খোঁজ রাখা ভালো। ফলে কিছু পড়াশুনা সুরু করলাম। এই সময়ে 'দিগ্‌দর্শন' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক-এর সঙ্গে আমার জানাশোনা হয়। তিনি আমার কাছ থেকে কিছু অনুবাদ চেয়ে নিয়ে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। অনুবাদগুলি কবিতার নয়, গদ্যের।

এই সময়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও অনিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ওঁরা তখন কবিরূপে অল্প পরিচিত। মোহিতবাবু তখন এম. এ. পড়তেন। আমি তখন সাহিত্য বিষয়ে আলোচনায় মোটামুটি যোগদান করতে শিখেছি। আমার কোনো কবিতা আমি কোনো পত্রিকায় পাঠাতাম না। আপন মনে লিখে খাতাতেই রেখে দিতাম। দেবকুমার বসু আমার কবিতার বই প্রকাশ করতে রাজি হলেন। আমি তখন আমার পুরানো কবিতার খাতা ফের পড়তে লাগলাম। প'ড়ে মনে হলো, গোটা পঞ্চাশ কবিতার মধ্যে কবিতাপদবাচ্য বলা যায় গোটা পাঁচেককে। মনটা খুব দমে গেলো। তখন নতুন কিছু কবিতা লিখতে গেলাম। সব পয়ারে। বাছাই ইত্যাদি ক'রে অতি ছোটো একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করা যায় ব'লে দেখা গেলো। দেবকুমারবাবু অতি সজ্জন। তিনি বললেন, 'চলুন দেবুদার কাছে, মলাট এঁকে নিয়ে আসি।' চললাম তাঁর সঙ্গে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে, বেলেঘাটায়। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খেতে খেতে তিনি একটা ছবি এঁকে দিলেন। অতি সুন্দর হলো দেখতে।

বই ছাপা হয়ে বেরোলো। মোটা ষাট পাউন্ড এ্যান্টিক কাগজে ছাপা। জানা-শোনা লোকদের কয়েকজনকে দিলাম পড়তে। কিন্তু কেউ আমার কবিতা সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য সুরু করলো না, প্রশংসাও করলো না। দেবকুমারবাবু নিশ্চয়ই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায়ও দিয়েছিলেন। কেউ ভালো ক'রে রিভিউও করলো না। সব চুপচাপ, যেন আমার বই প্রকাশিত হয়নি। এ বইয়ের নাম 'নক্ষত্রের আলোয়'।

দেবকুমারবাবুর মাধ্যমে আমার বহু তরুণ কবির সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁরাও আমার বই সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতেন না। তবে এটা ঠিক যে লক্ষ্য ক'রে প'ড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতাম অন্যান্য তরুণ কবির লেখা থেকে আমার কবিতা ভিন্ন প্রকারের, এক রকম নয়। আমার কবিতা বেশ পুরোনো ধাঁচের, সেগুলিকে ঠিক আধুনিক কবিতা বলা চলে না।

এই সময় কবি বিষ্ণু দের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কী ক'রে হয়েছিলো এখন আর তা মনে নেই। মোট কথা, মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময়ে তাঁর বাড়িতে যেতাম। কোনোদিন সঙ্গে কবিতার খাতা নিতাম। তিনি খাতা পড়ার জন্য রেখে দিতেন। তৎকালে 'সাহিত্যপত্র' নামক একটি পত্রিকা বেরোতো বিষ্ণুবাবুর তত্ত্বাবধানে। ঐ সাহিত্যপত্রে আমার একটি কি দুটি কবিতা তিনি ছেপে দিয়েছিলেন।

'নক্ষত্রের আলোয়' বইখানা পাঠক-সমালোচক মহলে সমাদৃত না-হলে আমি খুব ভাবিত হয়ে পড়লাম। অন্যান্য তরুণ কবির ঢঙে লেখা তো আর চাইলেই হয়ে ওঠে না। ফলে এরূপ চিন্তা আমি করতাম না। কলকাতার কোনো লিটল্ ম্যাগাজিনের সঙ্গে আমার যোগ তো দূরের কথা, জানাশোনাই ছিলো না। আমার বয়স তখন তেইশ চব্বিশ, ১৯৫৮ খৃস্টাব্দ। এ যাবৎ লেখা আমার কবিতার অধিকাংশ বর্জন ক'রে মন খুব বিষণ্ণ। এইভাবে ১৯৫৮ খৃস্টাব্দ চ'লে গেলো। ১৯৫৯ খৃস্টাব্দটি কোনো চাকুরি না ক'রে শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিলাম। এই সময়ে প্রচুর বিদেশী সাহিত্য পাঠ করি। ধীরে ধীরে আমার মনে কবিতা রচনার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আবির্ভূত হয়।

এই ১৯৫৯ সালে আমায় বেশ কিছু অনুবাদ করতে হয়। পাইকপাড়া থেকে 'বক্তব্য' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সম্পাদক ছিলেন বিমান সিংহ। আমি থাকতাম গ্রামে ; আমার গ্রামের ঠিকানায় তিনি প্রায়শই চিঠি দিতেন অনুবাদ কবিতা প্রার্থনা ক'রে। আমি অনুবাদ ক'রে পাঠাতাম এটা ঠিক। কিন্তু তিনি আমার নিজের লেখা কবিতা কেন চান না—এ ক্ষোভ আমার মনে মনে থাকতো। কিছু বিরক্তও বোধ করতাম। আমি যে কবিতা লিখি তা সে সম্পাদক জানতেন, 'নক্ষত্রের আলোয়' তিনি পড়েছিলেন। তবু কখনো আমার নিজের লেখা কবিতা চাইতেন না।

এরপর ১৯৬০ খৃস্টাব্দের একেবারে গোড়ার দিকে আমি স্থির করলাম সর্বান্তকরণে কবিতাই লিখি। চাকুরি আপাতত থাক। গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চ'লে গেলাম। সকালে জাগরণ থেকে শয়ন পর্যন্ত সারাক্ষণ কবিতাই ভাবতাম। আশেপাশে শহরের যে দৃশ্যাবলী দেখতাম তার কোনো কিছু কাব্যিক মনে হলে তখনি নোট বুকে টুকে রাখতাম। ছোটো আকারের কবিতার নোট বই সর্বদাই প্যান্টের পকেটে রাখতাম!

সৃষ্টির মূল যে সূত্রগুলি তা জড়ের মধ্যে প্রকাশিত, উদ্ভিদের মধ্যে প্রকাশিত, মানুষের মধ্যেও প্রকাশিত। এদের ভিতরে সূত্রগুলি পৃথক নয় একই সূত্র তিনের ভিতরে বিদ্যমান। এই সার সত্য সম্বল ক'রে ভেবে দেখলাম জড়ের জীবনে যা সত্য, মানুষের জীবনেও তাই সত্য, উদ্ভিদের জীবনে যা সত্য মানুষের জীবনেও তাই সত্য। অতএব জড় এবং উদ্ভিদের জীবন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম আমি। এবং তাদের জীবনের ঘটনাকে মানুষের জীবনের ঘটনা বলেই চালাতে লাগলাম। এইভাবে শুরু হলো কবিতার জগতে আমার পথযাত্রা, আমার নিজস্বতা। এইভাবে সৃষ্টি হলো 'গায়ত্রীকে', 'ফিরে এসো, চাকা'। ১৯৬০ সাল আমি এইভাবে লিখেই কাটালাম। এবং দেবকুমার বসু মহশয়কে ধরলাম প্রকাশ করার জন্য। এক ফর্মার একখানা পুস্তিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ করা হবে ব'লে স্থির হলো।

ইতিমধ্যে আরো যা যা ঘটেছিলো তা লেখা ভালো। জনকয়েক অতি তরুণ কবির সঙ্গে তখন দৈনিকই আড্ডা দিতাম। এঁদের ভিতরে মোহিত চট্টোপাধ্যায় একজন। যতদূর মনে পড়ছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এই সময়ে আলাপ হয়েছে, তার 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ' আমাকে উপহার দিয়েছিলো একখানা। সেখানা আমি পড়েছিলাম মনোযোগ দিয়ে। তখন 'আরো কবিতা পড়ুন' নামক আন্দোলন খুব জোর চলেছে। মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে ছোটো মিছিল যেতো। শ্লোগান দিতো 'আরো কবিতা পড়ুন', হাতে থাকতো ফেস্টুন। যতদূর মনে পড়ে তখনকার সিনেট হলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তরুণ কবিরা বক্তৃতাও দিতো, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। দেখেশুনে আমি বলতাম, 'আমি এখন যা লিখছি সে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক। তার মানে ভবিষ্যতে আমার কবিতা ছাত্রছাত্রীরা পড়তে বাধ্য হবে। সেহেতু এখন আমার কোনো পাঠক না থাকলেও চলে।' এবং কবিবন্ধুদের বললাম যে মিছিল ক'রে কিছু হবে না। আসল কথা হচ্ছে ভালো লেখা দরকার। যখন কবিতার বই ছেপে খাটের নিচে রেখে দেবে, কারো কাছে বেচতে যাবে না, তা সত্ত্বেও পাঠকেরা এসে খাটের নিচের থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে পড়বে তখনই বুঝবে কবিতা ঠিক লেখা হচ্ছে। আমার এ-মন্তব্য কিন্তু কবিবন্ধুদের ভালো লাগেনি।

অবশেষে সেই এক ফর্মা পুস্তিকা প্রকাশিত হলো। নাম 'গায়ত্রীকে'। চোদ্দটি কবিতা ছিলো তাতে। মোট ষোলো পৃষ্ঠার বই। আগেই ভেবেছিলাম যে দ্বিতীয় সংস্করণে আরো অনেক কবিতা যুক্ত ক'রে পুস্তিকাখানিকে একখানি পূর্ণাঙ্গ বই ক'রে ফেলবো। ফলে আমি লিখে চললাম। ইতিমধ্যে দুর্গাপুরে একটি চাকরি পেয়ে আমি কলকাতা ছেড়ে দুর্গাপুরে যাই। সেখানে তিন শিফটে কাজ করতে হতো। সকালের শিফট, সন্ধ্যার শিফট এবং রাতের শিফট। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই তিন শিফটেই কাজ করতে হতো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি কবিতা লিখতাম। মাস আড়াই কাজ করার পর আমি 'গায়ত্রীকে' পুস্তিকাকে পরিবর্ধনের ব্যাপার শেষ ক'রে ফেলি। সাতাত্তরটি কবিতা সম্বলিত পাণ্ডুলিপি আমি দেবকুমারবাবুকে দিয়ে গেলাম। বইয়ের নাম দিলাম 'ফিরে এসো, চাকা'।

এর মধ্যে অবশ্য অন্য ব্যাপারও ঘ'টে গেছে। হাওড়া থেকে প্রকাশিত অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সম্প্রতি' নামক পত্রিকায় 'গায়ত্রীকে'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলো। অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলো শক্তি। লিখেছিলো যে আমি যে-কোনো বস্তু নিয়ে সার্থক কবিতা লিখতে পারি। এবং, আশ্চর্যের বিষয়, সমালোচনায় শক্তি লিখলো যে 'হাংরি জেনারেশন' নামে একটি কবিগোষ্ঠী গঠিত হয়েছে, আমিই তার জনক ইত্যাদি ইত্যাদি। আসল কথা হচ্ছে ঐ সমালোচনা প'ড়েই আমি ঐ জেনারেশনের কথা জানলাম, তার আগে জানতাম না। জেনারেশনের অন্তর্ভুক্ত কারো সঙ্গেই তখন আমার আলাপ ছিলো না। দুর্গাপুরে কর্মরত থাকার ফলে কোনো দল গঠন ছিলো আমার পক্ষে অসম্ভব। আসল কথা দল গঠন ক'রে দিয়েছিলো শক্তি। তার নিজের কৃতিত্ব আমার ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিলো কেন কে জানে। শক্তির এই সমালোচনা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত কোনো পত্রিকাতে আমার কবিতা কেউ চেয়ে নিতো না। সম্পাদকেরা চাইতো না এবং আমিও দিতাম না। ফলে এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি কেউ আমার লেখার সন্ধানে পুরোনো পত্রিকা ঘাঁটেন তবে হতাশ হবেন। কবিতার জগতে আমার প্রবেশ পত্রিকায় কবিতা ছেপে নয়, বই ছেপে। কলকাতায় আর কোনো কবির জীবনে এরূপ হয়েছে কিনা জানি না। শক্তির সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার পর অবশ্য অবস্থা পরিবর্তিত হলো, লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরা আমার কবিতা চেয়ে নিয়ে ছাপতে লাগলেন। তবে সে অল্প সংখ্যক পত্রিকা। এর পরই বেরোলো 'ফিরে এসো, চাকা'। তখন আমি দুর্গাপুরের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এসেছি। 'ফিরে এসো, চাকা' কলকাতায় ফেরার আগেই ছাপা হয়ে গেছলো। ফলে আমি প্রুফ দেখতে পারিনি। অনেক ছাপার ভুল রয়ে গেছলো। যেমন 'শুভ্র গান' এর জায়গায় ছাপা হয় 'শুভ গান'। অনেক জায়গায় শব্দও বাদ চ'লে গেছলো। আর, কবিতায় শব্দ বাদ যাওয়া মানেই তো ছন্দপতন।

শক্তিকে 'ফিরে এসো, চাকা' একখানা উপহার দিয়ে বললাম একটা সমালোচনা করতে। ও বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় করবো। তবে তোর বই কি কলকাতায় ব'সে পড়া যায় রে। অন্য পরিবেশ লাগে। তাই বাসায় গিয়ে পড়বো তোর বই। তারপর লিখবো।' শক্তি আমাকে তখন তুই বলতো। সম্প্রতি দেখলাম তুই পালটে তুমি বলতে সুরু করেছে।

'গায়ত্রীকে' প্রকাশের সময় এবং 'ফিরে এসো, চাকা' প্রকাশের সময়ের মাঝখানে খুব অল্প কটি কবিতা পত্রিকায় বেরিয়েছিলো। সবই লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে।

এসব হচ্ছে ১৯৬২ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরের ঘটনা। এরপর ১৯৬৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত একবছর আমি কোনো কবিতা লিখিনি। গ্রামে থাকতাম।

শক্তি তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিলো। বেশ দীর্ঘ একটি সমালোচনা লিখেছিলো 'ফিরে, এসো, চাকা'র। ১৯৬৩ সালে। ওর সমালোচনার ফলে হৈ-চৈ প'ড়ে গেলো কলকাতায়। ১৯৬৩ সালের নভেম্বর কি ডিসেম্বরে আমি ফিরে গেলাম কলকাতায়। শক্তি একদিন একখানি চটি পত্রিকা টেবিলে রেখে বললো, 'এই হলো কৃত্তিবাস। তোর কবিতা দে, কৃত্তিবাসে ছাপবো।' তার আগে 'কৃত্তিবাস' আমি কোনোদিন চোখে দেখিনি, নাম শুনেছিলাম অবশ্য। আমি বললাম, 'আমি তো কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি। ফলে দেবার উপায় নেই।' উত্তরে শক্তি বললো, 'তুই না-লিখলে 'কৃত্তিবাস' বারই করবো না আর, বন্ধ ক'রে দেবো। তুই তাড়াতাড়ি কবিতা লিখে দে।' চাপে প'ড়ে আমি রাজি হলাম লিখতে। এইভাবে ১৯৬৪ সালে 'কৃত্তিবাস'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি।

১৯৬৪ সালের গোড়াতেই লক্ষ্য করলাম যে আমি কলকাতায় পরিচিত হয়ে গেছি, বিশেষত পত্রিকার সম্পাদক মহলে। 'অমৃত' পত্রিকার কমল চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে আলাপ হলো ঐ সময়। তিনি বললেন, 'কবিতা দেবেন আমাদের পত্রিকায়। আপনার কবিতা নিশ্চয় ছাপাবো'। অল্প কিছুকাল পরে 'দেশ' সম্পাদক সাগরময় ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিলো। তিনি বলেছিলেন কবিতা দিতে। বিভিন্ন কবি সম্মেলনে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ আসতে লাগলো। এমন কি ইউসিস্-এ আয়োজিত আমেরিকানদের এক সাহিত্য সম্মেলনে নিমন্ত্রণ ক'রে বসলো। গেলাম সে সম্মেলনে। সেখানে প্রধানত আমেরিকান কবিদের কবিতা শোনানো হলো। অর্ধেক সময় অতিবাহিত হবার পর পিছনে তাকিয়ে দেখি শক্তিও কখন এসে আমার পিছনেই চুপচাপ ব'সে আছে। উক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মেলনে আমেরিকান কবিতার বঙ্গানুবাদও প'ড়ে শোনানো হলো। পড়লেন স্বয়ং অনুবাদকগণ অর্থাৎ বাঙলার খ্যাতনামা বৃদ্ধ কবিরা।

কলকাতার অধিকাংশ তরুণ কবির সঙ্গে তখন আমার আলাপ হয়ে গেলো। আলাপ হলো উৎপল বসুর সঙ্গে। উৎপল বসু আলাপ করিয়ে দিলেন তারাপদ রায়ের সঙ্গে। তারাপদবাবুর বাড়িতে তখন সন্ধ্যাবেলা দক্ষিণ কলকাতার তরুণ কবিদের একটি সান্ধ্য-বৈঠক হতো। যতদূর মনে পড়ে উক্ত বৈঠকেই শংকর চট্টোপাধ্যায় এবং সুধেন্দু মল্লিকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমি মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা তারাপদবাবুর বাড়িতেই শুয়ে থাকতাম।

একদিন তারাপদবাবু বললেন, 'আমার এক বন্ধু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। যাবেন তার কাছে? কাছেই থাকে সে, বালিগঞ্জে। আমি হেঁটেই যাই।' প্রথম দিন বোধ হয় আমি যেতে রাজি হইনি। পরে আরেকদিন তিনি যখন বললেন তখন রাজি হলাম। হাজরা রোড ধ'রে সিধে পূর্বদিকে হাঁটতে লাগলাম দুজনে। তারাপদবাবুর কাছে ছোটা আর হাঁটা প্রায় একই ব্যাপার। ফলে অল্প সময়েই পৌঁছে গেলাম। পরিচয় হলো জ্যোর্তিময় দত্তর সঙ্গে।

জ্যোতিবাবু বললেন, 'আপনার কবিতা সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছি। সে-জন্য আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার হয়ে পড়েছিলো। প্রবন্ধটি ছাপায় আপনার অমত নেই—এই কথাটি আপনাকে লিখে দিতে হবে।'

এ-কথা আমি লিখে দিয়েছিলাম, তবে প্রথম সাক্ষাতের দিনে নয়, পরে একদিন। প্রবন্ধটি যাতে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সেই চেষ্টাই করছিলেন জ্যোতিবাবু। কিন্তু অত দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপতে হলে ক্রমশ করে ছাপতে হবে, এই হেতু সাগরময় ঘোষ মহাশয় ছাপতে রাজি হননি। এ-প্রবন্ধ অনেক পরে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো।

১৯৬৪ খৃস্টাব্দে, বোধ হয়, মে মাসে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় আমার সম্বন্ধে কিছু লিখেছিলো। জ্যোতিবাবুই বলেছিলেন, 'কাল স্টেটস্‌ম্যান-এ আপনার সম্বন্ধে লেখা বেরোবে।' পরের দিন দেখলাম সত্য-সত্যই লেখা বেরিয়েছে। তাতে লিখেছিলো যে বিনয় মজুমদার বাংলা কবিতার রাজ্যে একটি চিরস্থায়ী নাম। আমি খুব উৎসাহিত বোধ করলাম।

তখন আমি আদিরসাত্মক কবিতা লিখতে সুরু করেছি। তখন মনে হতো খুব দ্রুত গতিতে লিখছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারি যে আস্তে আস্তেই লিখছিলাম আসলে। সাতচল্লিশটি কবিতা লিখতে মাস ছয়েক লেগেছিলো। তখনকার উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছিলো এই যে আমি যা-ই লিখতাম তা-ই, অন্তত আমার কাছে, রসোত্তীর্ণ কবিতা ব'লে মনে হতো। কোনো কবিতাই আমি বর্জন করতে পারতাম না। এটা হতো লেখার একটি বিশেষ উপায়ের জন্য। যাকে লেখার শৈলী বলা যায়।

এই সময় একটি হিন্দী পত্রিকায় আমার কবিতার হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কবি পরিচিতিতে লিখেছিলো যে আমি বর্তমানে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি। পত্রিকাটির নাম এখন আর মনে নেই। 'মরাল' নামে হিন্দী পত্রিকাটি বোধ হয় নয়। অন্য কোনো পত্রিকা হবে। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ তরুণ বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানাশোনা হয়ে যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয়। অনেক বিদেশী ব্যক্তির সঙ্গেও আলাপ হয়। বিখ্যাত বঙ্গভাষা প্রেমিক আমেরিকান অধ্যাপক ডিমক-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তাঁর সঙ্গে ঘন ঘন দেখা হতো।

১৯৬৪ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'ঈশ্বরীর' নামক কবিতাগ্রন্থখানি ছাপা হয়ে বেরোয়। এ-বইয়ের প্রায় সব কবিতাই আদিরসাত্মক। কিন্তু ঐ বই পাঠকমহলে বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি। এখন পর্যন্ত একই অবস্থা চলছে। এর পরে বেশ কিছুকাল আমি কবিতা লিখিনি। 'ঈশ্বরীর' বইখানির কবিতাগুলি ছন্দ এবং ধ্বনিমাধুর্যে খুব ভালো—এ-কথা আমি তখনি বুঝতাম, এখনো বুঝতে পারি। আমার কবিতা সম্বন্ধে ছোটোবড়ো আলোচনা তখন নানা পত্রিকায় বেরোতে সুরু করে।

এরপরে আলাপ হয় বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। 'উত্তরঙ্গ' নামক একটি পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করছিলেন। পত্রিকাটির কয়েক সংখ্যা সবে বেরিয়েছে। আমাকে এক সংখ্যা পত্রিকা উপহার দিয়ে তিনি বললেন, 'আপনার কবিতা চাই। আমি ছাপবো।' উত্তরে আমি বললাম যে কবিতা লেখা ছেড়েই দিয়েছি, আর লিখি না। লেখার বিশেষ ইচ্ছাও নেই। তিনি শুনলেন না। বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, 'আচ্ছা, লেখার চেষ্টা ক'রে দেখি।'

মাঝে মাঝে কবিতা লেখা যে বন্ধ থাকতো তার প্রধান কারণ হলো বিষয়বস্তুর অভাব। বিষয়বস্তু খুঁজে পেতাম না আমি। চারিপাশে যে সকল দৃশ্য দেখি, আমরা সকলেই দেখি, তার হুবহু বর্ণনা লিখলে কবিতা হয় না। সেই দৃশ্য আদৌ কেন আছে, কী কারণে বিশ্বে তার থাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, বিশ্বের নিয়মাবলী ও গঠন প্রকৃতি ঐ দৃশ্যে কতটুকু প্রকাশিত হয়েছে—এইসব বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত ক'রে না দিলে আধুনিক কবিতা হয় না। কিন্তু যুক্ত করতে হলে ঐ-সব জানা থাকা দরকার! এইসব দার্শনিক বিষয় ভাবতে ভাবতে আমার সময় চ'লে যেতো মাসের পর মাস। এখনো আমি ভেবেই চলেছি। এই দর্শনের উপস্থিতি কবিতায় একেবারে প্রত্যক্ষ না-হলেও চলে, হয়তো তার আভাস-মাত্র থাকলেই হয়। কিন্তু আভাসই হোক আর যাই হোক, উপস্থিতি অবশ্যই প্রয়োজন। এই উপস্থিতিই পাঠকের মনকে ভাবাবেগে আন্দোলিত করে, রসাপ্লুত করে, কবিতাকে চিরস্থায়ী করে। যেমন ধরা যাক উপমা। উপমা দেওয়া মানেও দর্শনকে হাজির করা। আমার নিজের কবিতা থেকেই উদ্ধৃতি দিই :

'অথচ তীক্ষ্ণতা আছে, অভিজ্ঞতাগুলি সূচিমুখ,
ফুলের কাঁটার মতো কিংবা অতি দূর নক্ষত্রের
পরিধির মতো তীক্ষ্ণ, নাগালের অনেক বাহিরে।'

অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা দিতে এ-স্থলে ফুল এবং নক্ষত্র আনা হয়েছে। ফুল এবং নক্ষত্র দুই-ই খুব সুন্দর, তার মানে অভিজ্ঞতাগুলিও সুন্দর। কিন্তু ফুলের সৌন্দর্যের সঙ্গে কাঁটা থাকে, তার মানে সুন্দর অভিজ্ঞতা হতে গিয়ে নির্মম বাধা আসে—এ-হয়তো এক নিয়ম। এই দার্শনিক তত্ত্বের জন্য তুলনায় ফুল এসে পড়ে। কিন্তু এ এক নিয়ম না হলে? তাহলে, অন্ততপক্ষে, কাঁটা আছে ব'লে প্রতীয়মান হতে থাকে। যেমন নক্ষত্রের বেলা হয়। কাঁটা নক্ষত্রে নেই, কিন্তু আছে ব'লে মনে হতে থাকে। এই হেতু উপমায় নক্ষত্র এসে পড়ে—সৌন্দর্যাভিসারের বেলায়ও এইরূপ মনে হতে থাকে। এটি বিশ্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি নিয়ম। অর্থাৎ উপমা দেওয়া মানে খানিকটা দর্শন এনে হাজির করা। এই দর্শনই পাঠককে আহ্লাদিত করে, দর্শনকে লেখার ভঙ্গীটি তাকে আরো বেশি আহ্লাদিত করে। দর্শন হয়তো পুরোনো, কিন্তু তা লেখার প্রসঙ্গ ও ভঙ্গীটি নতুন। এই প্রসঙ্গে যে এই দর্শন ক্রিয়াশীল তা দেখে পাঠক চমৎকৃত হয়।

অভিজ্ঞতা হতো আমার নানা রকমের, কিন্তু সে-গুলিকে দর্শনসিক্ত ক'রে তার বিশ্বজনীনতা ফোটাতে পারতাম না সব সময়। অন্তত আমার তাই মনে হতো। এমন হলে আমি লেখা বন্ধ ক'রে ব'সে থাকতাম। যাই হোক, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় মশায়কে আমি কবিতা লিখে দিয়েছিলাম। তিনি সানন্দে ছেপেছিলেন। এইভাবে আমার পরবর্তী পুস্তিকা 'অধিকন্তু' লেখা সুরু হয়। 'অধিকন্তু' লেখার সময়ে মনে হতো—এর কোনো তুলনা হয় না, এত বিশ্বজনীন। অবশ্য এখন মনে হয়, যে-কোনো বই লেখার সময়েই কবি এই রকম ভাবে। এবং এইরকম ভাবে ব'লেই লিখে শেষ করতে পারে। 'অধিকন্তু'র প্রথম কবিতাটি 'উত্তরঙ্গে' ছাপা হয়েছিলো।

এ-অবধি আমি কোনোদিন নিসর্গবর্ণনামূলক কবিতা লিখিনি। অধিকাংশই ঘটনার বিবৃতি লিখেছি। অতঃপর আমায় কলকাতার শহরতলীতে থাকতে হয় যাকে প্রায় গ্রাম বলা যায়। চারিদিকে নানা গাছপালা লতাপাতা ছিলো, ছোটোবড়ো পুকুর ছিলো। ভাবলাম প্রকৃতির বর্ণনা লেখার চেষ্টা করা যাক। এক মাসের ভিতরে খুব দীর্ঘ ছটি কবিতা লিখলাম। হিসাবে ক'রে দেখলাম, বই আকারে ছাপলে এই ছটি কবিতা ৪৮ পৃষ্ঠার বেশি জায়গা নেবে। ফলে আর বেশি লিখলাম না। বইয়ের নাম দিলাম 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' এবং কবিতাগুলির কোনো নাম না-দিয়ে সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করলাম—১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬। একবার ভাবলাম কায়দা ক'রে ছটি কবিতাকে জোড়া লাগিয়ে একটা কবিতা করি, ৪৮ পৃষ্ঠা লম্বা একটি কবিতা। কিন্তু এত দীর্ঘ কবিতা পত্রিকায় ছাপার অসুবিধা হবে ভেবে শেষ পর্যন্ত আলাদা আলাদা ছটি কবিতাই রাখলাম। এর প্রথম কবিতাটি ছাপতে নিলেন 'অনুভব' পত্রিকার সম্পাদক গৌরাঙ্গ ভৌমিক, দ্বিতীয় কবিতাটি ছাপতে নিলেন 'এক্ষণ' পত্রিকার সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য, তৃতীয় কবিতাটির তখন কী হয়েছিলো তা গোপন রাখতে চাই, চতুর্থ ও পঞ্চম কবিতা দুটি ছাপতে নিলেন 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং ষষ্ঠ কবিতাটি ছাপতে নিলেন 'দৈনিক কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক বিমল রায়চৌধুরী। সকলেই যথাসময়ে ছেপে বার করলেন। প'ড়ে সকলেই খুব প্রশংসা করলেন। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' বইখানা আমি ছেপে বার করবো। কবিতার সঙ্গে ইলাস্ট্রেশন দেবো।' অমিতাভ দাশগুপ্ত বললো, ''তোর 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'র সমালোচনা লিখবো আমি। বই হয়ে বেরোবার আগেই।'' কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেলো তাঁদের কথা প্রশংসাবাক্য মাত্র। পৃথ্বীশও বই ছাপলেন না, অমিতাভও সমালোচনা লিখলো না। 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'র তৃতীয় কবিতাটি ছাপা হয়েছে জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত 'কলকাতা' পত্রিকায়, ১৯৭০ সালে। এই একই প্রকারের কবিতা আমি আরো লিখে যেতে পারতাম। কিন্তু পড়তে একঘেয়ে হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় আর লিখিনি। এর পরে কবিতা লেখার গতি খুব মন্দ হয়ে আসে। ১৯৬৭, ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ এই তিন বছরে আমি গোটা পঁচিশেক কবিতা লিখেছি। তাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার খুব ছোট আকারের।

পাঁচের দশকের প্রধান কবিদের কবিতা নিয়ে শংকর চট্টোপাধ্যায় 'এই দশকের কবিতা' নামক একখানা বই—এসব ঘটনার কিছু আগেই, বার করেছিলেন। তাতে আমার গোটা কয়েক কবিতা তিনি ছেপেছিলেন। তাতে দেখা গেলো পাঁচের দশকের প্রধান কবি বলতে বেশি কবি নেই, সব মিলিয়ে কুড়ি জনের কম হলো কবির সংখ্যা। এখনো আমার ধারণা এই সংকলনটি খুব উচ্চাঙ্গের হয়েছিলো, কবিতাগুলির মান খুব বিস্ময়কর রূপে উন্নত। যে-কোনো বিদেশী কবিতার পাশাপাশি রেখে পড়া চলে, তুলনা করা চলে। এবং তুলনা করলে বাংলা কবিতাগুলিকে কোনোক্রমেই নিম্নমানের বলা যায় না।

ইতিমধ্যে বাংলা কবিতা পত্রিকার রাজ্যে দারুন ওলটপালট হয়ে গেছে ; কৃত্তিবাস, অনুভব, উত্তরঙ্গ প্রভৃতি অনেক ছোটো পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ সকলে দল বেঁধে দৈনিক কবিতা, সাপ্তাহিক কবিতা প্রভৃতি প্রকাশ করতে লেগে গেছে। শক্তি নিজে সাপ্তাহিক কবিতার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছে। 'সারস্বত' নামে একটি পত্রিকা দিলীপ গুপ্ত-র সম্পাদনায় বেরিয়ে আবার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। গল্পকবিতা, কলকাতা প্রভৃতি নূতন পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করলে আমাকে এইসব উদ্যমে কেউ ডাকেও নি, আর আমার নিজের যাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

অমিতাভ দাশগুপ্ত একদিন আমাকে 'অধুনা' নামক প্রকাশন সংস্থায় নিয়ে গেলো। অমিতাভর সম্পাদিত কবিতাসংকলন 'কবিতার পক্ষে' সবে সেদিন বেরিয়েছে। আমাকে এক কপি দিলো। দেখলাম আমার দুটি কবিতা স্থান পেয়েছে সঙ্কলনে। কিন্তু আপসোসের আর অবধি রইলো না, অমিতাভর নির্বাচন আমার পছন্দ হয়নি। অমিতাভকে বললাম সে-কথা। বললাম যে ওই কবিতাদুটির চেয়ে অনেক ভালো কবিতা আমার আছে। অমিতাভ বললো যে সেটা বিশেষ দোষের হয়নি।

এই সঙ্কলন গ্রন্থের বেলায় অমিতাভকে সর্বদা অগ্রণী দেখা যায়। 'স্বনির্বাচিত' নামে একটি কবিতাসঙ্কলন বার করার ব্যাপারে অমিতাভ জড়িত ছিলো। একদিন আড্ডা দিতে গিয়ে অমিতাভর পাশে বসেছি। দেখি সে ব্যাগ থেকে একখানি ছাপানো ফর্ম টেনে বার করেছে এবং আমার নিকটে লেখা একখানি মুদ্রিত চিঠিও আমার হাতে দিলো। বললো, 'তোর কাছে এখন কবিতা আছে? থাকে তো দে। এই সংকলনে ছাপা হবে।' আমি জানালাম যে কবিতা আছে তবে সংকলনে দেবার মতো নয়, সদ্য লেখা। ও বললো, 'তাই দে। ওইটেই দে। তোর আর বাছাই করতে হবে না।' আমি দারুণ প্রতিবাদ ক'রে উঠলাম, বললাম, 'না, না, সে অতি বিশ্রী ব্যাপার হবে। আমার নিকটের কবিতাটি প্রতিনিধিস্থানীয় মোটেই নয়।' আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও বারংবার পিড়াপিড়ি ক'রে আমার কাছের কবিতাটিই সে নিয়ে গেলো, একটি ফর্মও ভর্তি করিয়ে নিলো। বললো, 'আর লাগবে তোর একখানা ফটো। তা আমরা যোগাড় ক'রে নেবো'। এর পরে বহুদিন চ'লে গেলো, কিন্তু বই আর এলো না। ইতিমধ্যে একদিন শক্তির আমন্ত্রণে ওর বেহালাস্থ বাসায় গেছি। শক্তিকে বললাম, 'স্বনির্বাচিত বইখানা আছে তোমার কাছে? আমার কাছ থেকে কবিতা নিলো। কিন্তু মনে হচ্ছে ছাপেনি।' শক্তি বললো, 'ও বইখানা আমাকে দিয়েছে একখানা। তবে এখন আমার কাছে নেই ; পড়তে নিয়ে গেছে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রলোক। ঠিকই ধরেছো, তোমার কবিতা নেই; কী যে সঙ্কলন করেছে।' অতঃপর আমি বাড়ি ফিরে এসে একখানি চিঠি লিখলাম 'স্বনির্বাচিত'-র সম্পাদকের কাছে। জবাবে সম্পাদক জানালো, 'নিশ্চয় নিশ্চয়! আপনার কবিতা নিয়েছি বৈকি। তবে আপনার প্রাপ্য কপি তো অমিতাভ দাশগুপ্ত নিয়ে গেছেন। তিনি বললেন, আপনার হাতে পৌঁছে দেবেন। তাঁর কপি আর আপনার কপি—এই দু-কপিই তিনি নিয়ে গেছেন অনেকদিন আগে। যাক, আপনি যখন এক কপি পাননি তখন রেজিস্ট্রি ডাকযোগে এখনি পাঠাচ্ছি।' এবং কয়েকদিন পরে সত্য-সত্যই ডাকযোগে আমার কপি পেয়ে গেলাম। দেখা গেলো, আমার সেই অনির্বাচিত কবিতাটি সংকলনে শোভমান।

বোধহয় ১৯৬৯ সালে একদিন জ্যোতির্ময় দত্ত মশায়ের বাড়িতে গেছি। তখন উনি থাকতেন রাসবিহারী এভেনিউয়ের এক বাড়িতে, গড়িয়াহাটার মোড়ের কাছে। জ্যোতিবাবু ভিতর থেকে একখানা বই এনে আমার সামনে রেখে বললেন, 'এই যে আমেরিকায় আপনার কবিতা ছাপা হয়েছে। দেখুন।' দেখলাম বই নয়, একটি সাময়িক পত্রিকা। তবে অসম্ভব মোটা এবং পেপারব্যাক। নামটা এখন আর মনে নেই। দেখলাম তাতে আমার পাঁচটি কবিতার অনুবাদ ছেপেছে। অনুবাদক জ্যোতির্ময় দত্ত। কবিতার সঙ্গে খানিকটা কবি পরিচিতিও দিয়েছেন। এ-পত্রিকাটির কোনো কপি আমি পাইনি। মাত্র এক কপি জ্যোতির্ময় বাবুর বাড়িতে আছে।

ইতিমধ্যে বই ছাপা নিয়ে আমি বেশ চিন্তায় পড়েছিলাম। 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' পুস্তকাকারে প্রকাশের ইচ্ছা আমার হচ্ছিলো বহুদিন যাবৎ। কিন্তু প্রকাশক পাচ্ছিলাম না। জ্যোতির্ময় দত্ত মশায় 'ফিরে এসো, চাকা' পুনর্মুদ্রণ করলেন ১৯৭০ সালে, কিন্তু নূতন বই মুদ্রণে তাঁর খুব উৎসাহ দেখা যায়নি। পুনর্মুদ্রণের চেয়ে নূতন মুদ্রণ ঢের বেশি জনপ্রিয় হবে এই আমার ধারণা। যাই হোক, জ্যোতিবাবু শেষ অবধি রাজি হয়েছিলেন। 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' তিনি প্রকাশ করবেন ব'লে কয়েক স্থানে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এমন কি 'যন্ত্রস্থ' ব'লেও লিখেছেন বিজ্ঞাপনে। ফলে ও-বইখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে যাবে।

'ফিরে এসো, চাকা'র পুনর্মুদ্রণখানি জ্যোতিবাবু 'দেশ' পত্রিকায় দিয়েছিলেন সমালোচনার জন্য। 'দেশ' পত্রিকার সমালোচকের মতে 'ফিরে এসো, চাকা' একখানি আশ্চর্য গ্রন্থ। সমালোচনায় বইয়ের ফটোগ্রাফও ছেপে দিলেন তিনি, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। আমার ধারণা 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'ও কম আশ্চর্যজনক নয়।

১৯৭০ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে আমি ফের কবিতা লেখার দিকে খুব বেশি পরিমাণে মনোনিবেশ করেছি। গত দেড় বছরে আমি দুইশত-র বেশি কবিতা লিখে ফেলেছি। এখনো অব্যাহত গতিতে লিখে চলেছি। বিষয়বস্তুর অভাব হচ্ছে না, কারণ মানব-জীবনের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক লোক আমি আবিষ্কার করেছি। পৃথিবীর জড়, উদ্ভিদ ও মানুষের একত্রিত বাসের কারণ, উপায় প্রভৃতি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নক্ষত্রের আলোয়

উন্মোচনের গান

মানুষ যা কথায় প্রকাশ করতে পারে না, তা প্রকাশ করে গানে, আর গানেও যার প্রকাশ সম্ভব নয়, তা প্রকাশ করে কবিতায়।

বার্নাড শ।

তুমি তো কথা বলো, জীবন প্রত্যহ
সকাল বিকেলের যে চেনা গদ্যে
লিখিত একরূপে, তুমি তো অহরহ
হাঁটছো রূঢ় সেই ভিড়ের মধ্যে।

সকাল চুমু খেলে যে সাড়া উদ্বেল,
যে থম্‌থম্ বোধ আনে দিনান্ত,
যাদের নির্মম বিষয়ী উৎপাতে
দীর্ঘ গুরুপাকে হৃদয় ক্লান্ত।

তাদের কখনো কি ধরেছো দুই হাতে,
ছুঁয়েছো তার স্বর, পেয়েছো সুরকে
কণ্ঠে, অথবা এ-অবশ চেতনাতে
ডাকতে পেরেছো কি কোনো সুদূরকে?

সারাটা দিন গেলো তারই তো সন্ধানে
একটি চেতনাকে আকাশে তুলতে,
তাকেই চাই আমি অবাক প্রাণে প্রাণে
সেতুর পারাপার সে পারে খুলতে।

হয়তো চকিতে সে তোমাকে ছুঁয়ে যাবে
অপস্রিয়মাণ ছায়ার নৃত্যে,
হঠাৎ থরোথরো মিড়ের সাড়া পাবে
নিমীল বর্ণালী ঘুমাবে চিত্তে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তো চাঁদ নই, পারি না আলো দিতে
পারি না জলধিকে আকাশে তুলতে।
পাখির কাকলির আকুল আকুতিতে
পারবো কি তোমার পাপড়ি খুলতে?
৩০.৭.১৯৫৭

চিরদিন একাএকা

১

চিরদিন একাএকা অবরোধে থেকে
বুঝিনি কথারা থাকে অতি দূর নক্ষত্রের দেশে।
কতোদিন দূরাগতা, কতোদিন গেছো তুমি ডেকে,
কতোদিন প্রাণপণে কথা খুঁজে—খুঁজে খুঁজে নত মুখে তাকিয়েছি শেষে।

দূরাগতা, ভুল বুঝোনাকো।
তুমি যদি পাশে ব'সে থাকো,
মনে নেমে আসে তবে জীবনের সব ব্যর্থতা,
সব গ্লানি, সব অপরাধ;
নিজের অতীত নিয়ে কেন যেন মনে মনে খেলি, দূরাগতা।
তুমি যেন চ'লে যাও অতি দূর, অনন্তিম নক্ষত্রের নীলে;
আমি যেন ধীর হিম, বিশাল প্রান্তরে ব'সে ব'সে
সমুদ্রের কথা ভাবি, অনুভব করি তুমি কতো কাছে ছিলে!

২

অন্ধকারে ব'সে আছি, চারিদিকে প্রান্তরের বিধুর বাতাস।
নক্ষত্রের দিকে চেয়ে বুকে জমে জীবনের সব দীর্ঘশ্বাস।
আমি একা প'ড়ে আছি, তুমি আছো আকাশের সুনীল অতলে।
জানি, তুমি এই মাঠে আসবে না দূরাগতা,
নক্ষত্রের ছায়া নাকি পড়ে শুধু পৃথিবীর তিনভাগ জলে!

কুঁড়ি

পদ্মপাতার প'রে জল টলমল করে; কাছে কোনো ফুল তো দেখিনা,
সাধ জাগে,—বড়ো সাধ জাগে—
ডুব দিয়ে দেখে আসি নধর জলের নিচে
আকাশের অভিমুখী উন্মুখ কুঁড়ি আছে কিনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো সে কুঁড়ি
ফোটবার ইচ্ছায় থেকে থেকে—থেকে থেকে
কোন্ কালে হয়ে গেছে বুড়ি;
কোন্ কালে তার সব রূপ গেছে প'চে;
হয়তো বা তার আর নেই কোনো লেশ।
সাধ জাগে, বড়ো সাধ জাগে—
ডুব দিয়ে দেখে আসি নধর জলের নিচে
এখনো রয়েছে কিনা কোনো অবশেষ।

নক্ষত্রের আলোয়

চাঁদ নেই, জ্যোৎস্নার অমলিন জ্বালা নেই, তবু
কী এক বিপন্ন আলো লেগে আছে এ-মাঠের আঁধারের মুখে।
মনে হয় অকস্মাৎ ডুবে যেতে পারে মাঠ সমুদ্রের জলে।
হৃদয় বিস্মিত এক বিমর্ষ অসুখে।
চাঁদ নেই দেখি দূরে নক্ষত্রেরা জ্বলে।
যে নক্ষত্র নীল হয়ে আছে, দেখি তাকে।
কখনো সে পৃথিবীতে আসবে না, জানি, তবু
আসতে কি পারে না সে মাঠের নিকটে?
মাঝে মাঝে নক্ষত্র তো চাঁদ হয়ে পৃথিবীর কাছে এসে থাকে।
**১৯৫৮

AMARBOI.COM

কতো রূপকথা

কতো রূপকথা বলে কোটাল কুমার আর রাজকুমারেরা :
যক্ষপুরীতে তারা দেখেছে শিথিল কতো রাজকুমারীকে—
সোনার পালঙ্কে শুয়ে, প্রদীপ গিয়েছে নিবে শিয়রের দিকে।
সব ঘুমে অচেতন, একাকী বাতাস শুধু করে ঘোরাফেরা।

তারা সেই দেশে গেছে—কতো দূরে—মাঠ বন নদী পার হয়ে
উষার আলোয় গিয়ে দাঁড়িয়েছে কুমারীর পালঙ্কের পাশে।
পৃথিবীর সব স্বপ্ন তখন সে-কুমারীর মুখের আশ্রয়ে,
পৃথিবীর সব সাধ তখন সে-কুমারের মনে মিটে আসে।

রূপকথা শুনেছি সে—কঙ্কাবতী, পদ্মামালা, শঙ্খিনীমালার।
মনে হয় সব ব্যথা—সব সুখ পেয়ে গেছি—পেয়েছি সকলি।
কখনো চাই না যেতে সেই দেশে মাঠ বন নদী হয়ে পার;
ভিজে অন্ধকারে ব'সে পরস্পর সেইসব রূপকথা বলি।
**১৯৫৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রৌদ্রে

পৃথিবীর কাজে ব্যস্ত, ভিজে মুখ দুপুরের ঘামে;
আকাশ রয়েছে ভ'রে নীল রৌদ্রে,
শরীরের দীপ্তি তার ক্লান্ত হয়ে আছে।
ক্লান্ত হয়ে অবসরে—ক্ষণিক বিশ্রামে
চেয়ে থাকে বহু দূরে—বহু দূরে ঘুরে আসে অলস মেঘের কাছে কাছে,
জেগে থাকা অবসরে নয়—
একদিন চুপি চুপি কাছে যদি যেতে পারি
জ্যোৎস্নার নিচে তার ঘুমের সময়!

কোনোদিন বলেনি সে পৃথিবীর সেই মৃদু পুরাতন কথা।
একটি মানুষ আর মানুষের জীবনের—হৃদয়ের অপরূপ পরিপূরকতা
মনে ক'রে কোনোদিন ডাকবে না সে কি কোনো
মানুষকে —নেবে নাকি বেছে?
হয়তো অনেক বার ডেকেছে স্বপ্নের মাঝে,
কেবল ঘুমের ঘোরে ডাকে সে, ডেকেছে।
একদিন চুপি চুপি কাছে যদি যেতে পারি জেগে থাকা অবসরে নয়—
জ্যোৎস্নার নিচে তার ঘুমের সময়!
১৯৫৮

AMARBOI.COM

সে

তাকাই সামনে সোজাসুজি,
ব্যাকুল আশায় তাকে খুঁজি,
বধির আঁধারে করি দু'চোখ ধারালো।
কোন্‌দিকে—আঁধারের কোন্ পারে তবে সে হারালো?
অথচ তারই তো কাছে আলো!
বধির আঁধারে তার আলোর নিশানা নেই কোনো,
সে নিজে না-এলে তবে তাকে খুঁজে পাবো না কখনো।

অন্ধকারে পৃথিবীর ম্লান সব ছায়ারূপ দেখে
বহুদিন কেটেছিলো আলোকের আকাঙ্ক্ষায় থেকে।
অবশেষে এসেছিলো, এনেছিলো এক ম্লান প্রদীপের আলো,
একটি কোমল বৃত্তে পৃথিবীর উপরে সে আলোক ছড়ালো।
অথচ সে আলো নয়, আলোকের উদ্ভাসন নয়
সে নিজে আমার কাছে হলো এক পরম বিস্ময়—
তাই বুঝি ফের সে এ-আঁধারে হারালো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বধির আঁধারে তার আলোর নিশানা নেই কোনো,
সে নিজে না-এলে তাকে খুঁজে পাবো না কখনো,
কেবল তারই তো কাছে আলো।

কেন মনোলীনা

কেন তবে তুমি দিঘির শরীরে ছুঁড়েছিলে ঢিল?
চেয়েছিলে শুধু দেখতে কী ক'রে জলের বৃত্ত
নেচে নেচে যায়, সবুজ আলোয় করে ঝিলমিল?
কেন অকারণে দেখতে চাইলে দিঘির নৃত্য?

এসেছিলে কাছে, বসেছিলে ধীর সবুজ ছায়ায়
কুসুমে তোমার লোভ নেই যদি, নাই বা তুললে।
প্রতিদিন আসে অনেকেই, ব'সে ফের চ'লে যায়।
কৌতুকে তুমি কেন মনোলীনা অমন দুললে?

দেখেছো কেবল জল তরঙ্গে দিঘির শিহর।
জানো না তো তুমি দূর সঞ্চারী জলের বৃত্ত
অবশ পদ্মবনে নেচে নেচে গেছে পরপর,
দুলিয়ে দিয়েছে অপেক্ষমাণ ফুলের চিত্ত।

আনমনা এক কুসুমকে তুমি জাগিয়ে তুললে।
শুধু কৌতুকে কেন মনোলীনা অমন দুললে?

তোমার দিকে

তোমার দিকে তাকাই আমি দেখি অতল চোখ,
দেখি তোমার শরীর আর বুঝি তোমার মন,
এখনো খুঁজে পাইনি তার আকাঙ্ক্ষার লোক,
করুণ এক প্রতীক্ষায় শরীর ইন্ধন।

স্মরণে আসে অনেক কাল পড়েছি বিজ্ঞান,
গণিত দিয়ে বেঁধেছে নর বিপুল বিশ্বের
সকল কিছু, অথচ আজও অধরা তার প্রাণ,
অবুঝ তার শরীরে কাঁদে অজ্ঞতার জের!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনিত যদি ডুয়েট গায় হয় না তবে মিল।
বিশ্বজুড়ে কাটছে শুনি অজ্ঞতার তান,
অথচ পরিসংখ্যানের ঊর্দ্ধে সাবলীল
দ্বৈত কোনো সংগীতের পাইনি সন্ধান।

তোমার দিকে তাকাই আমি, কী যে রহস্যের
অতল এক সমুদ্রের গভীর উদ্ভাস
তোমার চোখে, শরীরে, মনে, অজ্ঞতার জের
হয়তো দেবে ব্যর্থ ক'রে সমুদ্রের শ্বাস।
৪.৭.১৯৫৭

এই আকাঙ্ক্ষা

আকাশ ক্রমে করছে পান অগাধ তৃষ্ণায়
তরঙ্গীত নদীর জল, এখন সাবলীল
নৃত্য নেই, জীবন নেই, প্রকট কামনায়
শীর্ণ তার শরীর আর হৃদয় তার নীল।

কেটে তো গেলো অনেক কাল পিপাসু সূর্যের
মেঘ বিহীন আকাশলীন আগাধ তৃষ্ণায়,
বৃষ্টি নেই, সাগর নেই বাষ্পপুঞ্জের
আধারে নেই, পৃথিবী আজ অনুর্বর প্রায়।

হয়তো এই আকাঙ্ক্ষার বিলুপ্তির পর
কোনো বিধুর সায়াহ্নের সকাশে চঞ্চল
সাগর তার দেহের ভার নামাবে ঝরঝর,
তখন এই মাটিতে নেই অবাক কোলাহল!
৩.৭.১৯৫৭

প্রজাপতি

হয়তো আলোর ভয়ে হয়তো বা লাজে
পৃথিবীর কাছ থেকে, নিজের দু'চোখ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে
রেশমের প্রজাপতি কতোকাল একাএকা এখনো রয়েছে প'ড়ে রেশমের মাঝে।

দেখি আর কতো দিন ভাবি,
একদিন এই বেশ ছিঁড়ে ফেলবে সে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলবে সে উদ্দাম আলোকের দেশে।
প্রতিদিন দেখি আর ভাবি,
লাল-নীল ফুলদের পরিবেশে পাখা মেলে প্রখর বাতাস খেয়ে দ্রুত নাচবে সে।

বহুদিন হলো সে তো ছাড়ে না এ-বাসা, আর
হয় না সে নিজে চমকিত।
অবরোধে থেকে থেকে প্রজাপতি অবশেষে ম'রে যায়নি তো!

আকাশের এই

আকাশের এই অসীমে তোর কি ফোটে না প্রাণ,
জোটে না দিন?
জীবন চকিত-পক্ষ আর কি সঙ্গীহীন
একক গান
ওড়াতে পারে না, ছড়াতে পারে না আকাশময়
প্রাণের ঘ্রাণ?
এখনো তো তোর সামনে আহত কম্পমান
আলোর জয়,
দুপুরের ঘুমে অলস মদির সন্ধ্যাকাশ
তোকেই চায়,
তৃণবিধৃত তরল চপল বন ছায়ায়
বায়ু বিলাস।
নয়নে কি তোর এখনো ব্যাহত নীড়ের রেশ
মুছবে না,
হতাশার ম্লান কাজল কখনো ঘুচবেনা
বিনিঃশেষ?
১৯.২.১৯৫৭

AMARBOI.COM

বিচ্ছেদের সময়ে

বিচ্ছেদের সময়ে যা চিরদিন হয়, ঠিক তাই—
প্রথম বিকেলগুলি হানা দিলো আমাদের ঘরে;
আশ্চর্য প্রশাখা আর সবুজ, অধীর পাতা নিয়ে
সুঠাম শিরীষ গাছ ছুটে এলো দু'জনের মাথার উপরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'জনেই হতবাক, বিকল, বিমর্ষ হয়ে আছি।
তাকাতে পারি না আর চোখ তুলে কেউ কারো দিকে
কোমল করুণ সুরে গেয়ে গেয়ে বলে এক পাখি
আমাদের প্রণয়ের সোহাগের দ্রুত কাহিনীকে।

আর শোনায়োনা

আর শোনায়োনা সুন্দরী, তুমি সিংহলের ঐ বিষাদবিধুর গান
কোরো না আহত হৃদয়কে উন্মূল
গানে মনে পড়ে আরেক জীবন, দূর এক উপকূল ...

হায়রে তোমার নির্মম গানে চেতনায় দেয় দেখা
এক প্রান্তর ... রাত্রি ... এবং
চাঁদের আলোয় একটি অভাগা তরুণীর রূপরেখা।
আমি এক প্রেত ... মারণ ভীষণ, মধুর একথা ভুলি
তোমাকে দেখলে, কিন্তু তোমার গানে
আবার হৃদয়ে ভেসে ওঠে সেই প্রেতের কাহিনীগুলি

আর শোনায়োনা সুন্দরী, তুমি সিংহলের ঐ বিষাদবিধুর গান
কোরো না আহত হৃদয়কে উন্মূল
গানে মনে পড়ে আরেক জীবন, দূর এক উপকূল ...

AMARBOI.COM

□

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গা য় ত্রী কে

১

একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে
পুনরায় ডুবে গেলো—এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে
বেদনার গাঢ় রসে আপক্ক রক্তিম হলো ফল।

বিপন্ন মরাল ওড়ে, অবিরাম পলায়ন করে,
যেহেতু সকলে জানে তার সাদা পালকের নিচে
রয়েছে উদগ্র উষ্ণ মাংস আর মেদ।
স্বল্পায়ু বিশ্রাম নেয় পরিশ্রান্ত পাহাড়ে পাহাড়ে।
সমস্ত জলীয় গান বাষ্পীভূত হয়ে যায়, তবু
এমন সময় তুমি, হে সমুদ্রমৎস্য তুমি ... তুমি ...

কিম্বা দ্যাখো, ইতস্তত অসুস্থ বৃক্ষেরা
পৃথিবীর পল্লবিত ব্যাপ্ত বনস্থলী
ক্লান্ত ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে আলোড়িত করে।
তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে দূরে
চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।

AMARBOI.COM

২

মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক স্বল্পকাল হাসে।
শিক্ষায়তনের কাছে হে নিশ্চল, স্নিগ্ধ দেবদারু,
জিহ্বার উপরে দ্রব লবণের মতো কণা কণা,
কী ছড়ায়? কে ছড়ায়? শোনো, কী অস্ফুট স্বর, শোনো—
'কোথায়, কোথায় তুমি, কোথায় তোমার ডানা, শ্বেত-পক্ষীমাতা?
এই যে এখানে জন্ম, একি সেই জনশ্রুত নীড় না মৃত্তিকা?
নীড় না মৃত্তিকা পূর্ণ এ-অস্বচ্ছ মৃত্যুময় হিমে ...'
তুমি বৃক্ষ, জ্ঞানহীন, মরণের ক্লিষ্ট সমাচার
জানো না, এখন তবে স্বর শোনো, অবহিত হও।

সুস্থ মৃত্তিকার চেয়ে সমুদ্রেরা কত বেশি বিপদসঙ্কুল।
তারো বেশি বিপদের নীলিমায় প্রক্ষালিত বিভিন্ন আকাশ।
এ-সত্য জেনেও তবু আমরা তো সাগরে আকাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঞ্চারিত হতে চাই, চিরকাল হতে অভিলাষী,
সকল প্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া আমাদের ভালো লাগে ব'লে।
তবুও কেন যে আজো, হায় হাসি, হায় দেবদারু,
মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।

৩

অনেক সন্ধান ক'রে নীতি নয়, প্রেম নয়, সার্থকতা নয়,
পেয়েছি আহত ক্লান্তি—ক্লান্তি, ক্লান্তি শুধু।
শুনেছি যে কতিপয় পতঙ্গশিকারী ফুল আছে।
অথচ তাদের আমি এত অনুসন্ধানেও এখনো দেখিনি।
তাঁবুর ভিতরে শুয়ে অন্ধকার আকাশের বিস্তার দেখেছি।
জেনেছি, নিকটবর্তী এবং উজ্জ্বলতম তারাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে
সব গ্রহ, তারা নয়, তাপহীন আলোহীন গ্রহ।
আমিও হাতাশাবোধে, অবক্ষয়ে, ক্ষোভে ক্লান্ত হয়ে
মাটিতে শুয়েছি একা—কীটদষ্ট, নষ্ট খোসা, শাঁস।
হে ধিক্কার, আত্মঘৃণা, দ্যাখো, কী মলিনবর্ণ ফল।

কিছুকাল আগে প্রাণে, ধাতুখণ্ডে সুনির্মল জ্যোৎস্না পড়েছিলো।
আলোকসম্পাতহেতু বিদ্যুৎসঞ্চার হয়—বিশেষ ধাতুতে হয়ে থাকে।
হায়রে, পায়রা ছাড়া অন্য কোনো ওড়ার ক্ষমতাবতী পাখি
বর্তমান যুগে আর মানুষের নিকটে আসে না।
সপ্রতিভভাবে এসে হাত থেকে খুদ খেয়ে ফের উড়ে যায়।
তবুও সফল জ্যোৎস্না চিরকাল মানুষের প্রেরণাস্বরূপ।
বিশেষ অবস্থামতো বিভিন্ন বায়ুর মধ্য দিয়ে
আমরা সতত চলি; বিষাক্ত, সুগন্ধি কিম্বা হিম
বায়ু তবু শুধুমাত্র আবহমণ্ডল হয়ে থাকে।
জীবনধারণ করা সমীরবিলাসী হওয়া নয়।
অতএব হে ধিক্কার, বৈদ্যুতিক আক্ষেপ ভালো তো,
অতি অল্প পুস্তকেই ক্রোড়পত্র দেওয়া হয়ে থাকে।

৪

বিনিদ্র রাত্রির পরে মাথায় জড়তা আসে, চোখ জ্ব'লে যায়,
হাতবোমা ভ'রে থাকে কী ভীষণ অতিক্রান্ত চাপে।
এরকম অবস্থায় হৃদয়ে কিসের আশা নিয়ে
কবিতার বই, খাতা চারিপাশে খুলে ব'সে আছি?

সকল সমুদ্র আর উদ্ভিদজগৎ আর মরুভূমি দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবাহিত হাওয়া ভিন্ন বাতাসের অন্য কোনো গতিবিধি নেই।
ফলে বহুকাল ধ'রে অভিজ্ঞ হবার পরে পাখিরা জেনেছে
নীড় নির্মাণের জন্য উপযুক্ত উপাদান ঘাস আর খড়।
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলি ক্রমে জ্ঞান হয়ে ওঠে।
এ-সকল সংখ্যাতীত উদ্ভিদ বা তৃণ, গুল্ম ইত্যাদির মূল
অন্তরালে মিশে গিয়ে অত্যন্ত জটিলভাবে থাকা স্বাভাবিক।

কোনো পরিচিত নাম বলার সময় হলে মাঝে মাঝে দেখি,
মনে নেই, ভুলে গেছি; হে কবিতারাশি, ভাবি ঈষৎ আয়াসে
ঠিক মনে এসে যাবে, অথচ ... অথচ ... হায়, সে এক বিস্মিত,
অসহ্য সন্ধান, তাই কেউ যদি সে সময়ে ব'লে দেয় তবে
তপ্ত লৌহদণ্ড জলে প্রবিষ্ট হবার শান্তি আচম্বিতে নামে।

৫

কাগজকলম নিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকা প্রয়োজন আজ।
প্রতিটি ব্যর্থতা, ক্লান্তি কী অস্পষ্ট আত্মচিন্তা সঙ্গে নিয়ে আসে।
সতত বিশ্বাস হয়, প্রায় সব আয়োজনই হয়ে গেছে, তবু
কেবল নির্ভুলভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না এখনো।
সকল ফুলের কাছে এত মোহময় মনে যাবার পরেও
মানুষেরা কিন্তু মাংস রন্ধনকালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে বেশি ভালবাসে।
ভালোবেসে বয়োপ্রাপ্ত জিহ্বা লালাসিক্ত হলে এখন মানুষ
মনে মনে লজ্জা পায়—সুন্দর কৌতুকস্নিগ্ধ লজ্জা পেয়ে থাকে।
বর্ণাবলেপনগুলি কাছে গেলে অতিস্থূল, অর্থহীন ব'লে মনে হয়,
অথচ আলেখ্যশ্রেণী কিছুটা দূরত্বহেতু মনোলোভা হয়ে ফুটে ওঠে।

হে আলেখ্য, অপচয় চিরকাল পৃথিবীতে আছে।
এই যে অমেয় জল, মেঘে মেঘে তনুভূত জল—
এর কতটুকু আর ফসলের দেহে আসে, বলো।
ফসলের ঋতুতেও অধিকাংশ শুষে নেয় মাটি।
তবু কি আশ্চর্য, দ্যাখো, উপবিষ্ট মশা উড়ে গেলে
তার এই উড়ে যাওয়া ঈষৎ সঙ্গীতময় হয়।

৬

পুরোনোরা পরিত্যক্ত, নতুনের সন্নিধানে বিহ্বল কবির
ব্যক্তির হৃদয়বৃত্তি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন ব'লে মনে হয়।
চরম আনন্দময় আদানপ্রদানকালে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে থাকো,
তা আবার অন্ধকারে, শিল্পায়ন চিরকাল অন্ধকারে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূরাকাশে, বহিঃশূন্যে ভ্রাম্যমাণ বস্তুপিণ্ডগুলি
বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এসেই উজ্জ্বলভাবে জ্বলে।
নিঃসঙ্গ রুগ্নের কাছে কপালে শীতল হাত আশ্চর্য প্রশান্তি নিয়ে আসে।
পৃথিবীর আকর্ষণে ফুলগুলি নুয়ে পড়ে, ঝ'রে প'ড়ে যায়।
কিন্তু দ্যাখো, পাখিগুলি স্বেচ্ছাধীন নেমে পুনরায় উড়ে যেতে পারে।
চেষ্টাকৃত পদ্ধতিতে অসময়ে জন্ম দিতে গেলে
শিশু ম'রে যেতে পারে, এ-সত্যটি চিকিৎসক জানে।
কিন্তু শেষ কথা হলো, আবেগ ও উত্তেজনাগুলি,
যার ফলে লজ্জা, বাধা এমন কি শারীরিক ক্ষত,
আঘাতপ্রাপ্তির ব্যথা দেহমিলনের কালে লক্ষ্যই করে না।
নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী উত্তাপ না-দিতে পারো যদি
কোলে দুধ যথাকালে ফেনোচ্ছ্বাসে উথলে ওঠে না।

৭

কেবলি বিষয়বস্তু খুঁজে খুঁজে অবশেষে কবি ভেবে দ্যাখে,
সমগ্র বৎসরব্যাপী প্রকৃত মানুষদের প্রজননঋতু।
তা ছাড়া অন্যান্য প্রাণী বছরে একটিবার সে সুযোগ পায়।
হয়তো সে অক্ষমতা—গতিহীন অক্ষমতা যে জন্য শামুক
নিকটে পাখিকে দেখে নিজের খোলসে ঢুকে নিরাপদ হয়।
দীর্ঘকাল রোগ ভোগে নিরাশ রোগীর কাছে সকল ওষুধ
নিরর্থক মনে হয়, জীবনের আশা ছেড়ে প্রতীক্ষায় থাকে।
হতাশায় ক্লান্ত, ক্লিষ্ট চোখের সম্মুখে তবু কখনো, ক্বচিৎ
অত্যাশ্চর্য মুখ দেখে নিজের মুখের বিম্ব ব'লে মনে করে।

হে আশ্চর্য, দীপ্ত মুখ, উজ্জ্বল রহস্যময়ী, কবিকুল জানে—
যারা চিত্রকর নয়, তাদের শৌখিন শিল্পে আলেখ্যের মুখে
নাক, চোখ, ওষ্ঠ, চুল—মানুষের এ-সকল বস্তু আঁকা হয়;
কিন্তু তবু সে মুখের অধিকারিণীর রূপ আলেখ্যে আসে না।
সেহেতু সাধনা আছে, উত্তাপপ্রদান আছে, ডুবুরি রয়েছে।
তোমার কি মনে, এ-ও কি অপরিণত ফল?
অথবা যৌগিক কথা—যে-সব প্রাণীর লোম সহজে ওঠে না
তাদের শবের ত্বক পরিধেয় বস্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হবে?

৮

বাচ্যার্থ, নিহিত অর্থ, বিশ্লেষিত শারীরিক রূপ,
সে শরীরে প্রকৃতির, জগতের প্রতীকী আশ্রয়,
অবিচ্ছেদ্য নিবিড়তা, ঘনিষ্ঠতা, আবেগসঞ্চার,
আরো সংজ্ঞাতীত কিছু কবিতায় থাকা অভিপ্রেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রোঞ্জের জাহাজ আছে। সে-গুলি চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না।
এরূপ জাহাজে চ'ড়ে বৈজ্ঞানিক সামুদ্রিক গবেষণা করে।
মানুষ যতোই ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত হয়, ততোই সে কোনো
আসন এমন কি শয্যা গ্রহণের বোধ ক'রে থাকে।
রাত্রিবেলা অন্ধকারে জানালায় প্রচুর তারকা দেখা দেবে,
দৃষ্টির অতীতে আরো ঢের বেশি তারা আছে, এ-কথা বিদিত।
কিন্তু আজো মানুষেরা প্রসবের আগে শিশু পুরুষ কি মেয়ে,
মৃত কি জীবিত হবে এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা রাখে না।

তিনটি বিভিন্ন বর্ণ সন্নিপাতনের ফলে মুদ্রিত চিত্রের
সমন্বিত সব বর্ণ, গভীর ব্যঞ্জনাগুলি পরস্ফুট হয়।
গাঢ়, ঘনীভূত দুধ—যে-দুধ চায়ের সঙ্গে গুলে দেওয়া হয়—
খেয়ে দ্যাখো, ভারি মিষ্টি, অত্যন্ত সুস্বাদু এক খাদ্য বা পানীয়।

৯

চতুর্দিকে অগণন সরস পাতার মাঝে থেকে
শিরীষ গাছের ফল তৃষ্ণায় বিশুষ্ক হয়ে যায়।
দৃষ্টির অতীত দেশে শীতকালে আত্মরক্ষা হেতু
খরগোশগুলি সব ধূসরাভ রোম ত্যাগ ক'রে
বরফের মতো সাদা রোমের আড়ালে বেঁচে থাকে।
লেবু গাছ থেকে কোনো শাখাকে নুইয়ে নিচু ক'রে
তার মাঝখান যদি মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়
তাহলে সেখানে ফের মূলের উদ্গম হয়ে যায়।
আরেকটি পৃথক গাছ এই ভাবে জন্ম পেয়ে থাকে।

কখনো অপরিচ্ছন্ন দেয়ালের দিকে চেয়ে মনোযোগ দিলে
বিশৃঙ্খলা থেকে কোনো মানুষীর মুখ ফুটে ওঠে।
পৃথিবীতে ফুল আছে, মাংস আছে, স্নানাগার আছে;
তবুও কেবলি সেই শিরীষশাখার কথা ভাবি।
পালিত পায়রাদের কী যে আছে; দল বেঁধে ওড়ে,
স্তবকে স্তবকে হাঁটে—এ-সব মানুষ ভালোবাসে।
শীতের বিকেলবেলা মন ঘরমুখো হতে চায়।

১০

ক্ষীণদৃষ্টি মানুষের চোখে ওই উজ্জ্বল তারাটি
সুদূর অস্পষ্ট এক সূর্যমুখী ফুল ব'লে প্রতিভাত হয়।
অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে জানা গেছে, সকলে জেনেছে—
ডালিয়া ফুলের মধ্যে চিনির আধিক্য বিদ্যমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরর্থক বীর্যপাতে হতাশ্বাস, বিমর্ষ বেদনা নেমে আসে;
তা না-হলে ব্যথা নয়, নিরুদ্ধ যন্ত্রণা হতে থাকে।
নোনা জলে ডিম ফেলে, হে মোহিনী, কেন যে দ্যাখো না;
যদি ডুবে যায় তবে, বুঝে নেবে, তা পচেনি, ব্যবহার্য আছে।

বিড়াল প্রভৃতি সব চিন্তাশক্তিহীন প্রাণীগুলি
সব অবসরকাল নিদ্রায় অতিবাহিত করে;
যেহেতু নিদ্রায় কোনো বেদনা বা যন্ত্রণার অবকাশ নেই।
তবুও কী ক'রে ভুলি তুমি একবার দেখিয়েছো
অনিদ্রিত মানুষের রক্তময় ফুটন্ত জলের
নভোচারণের মতো আকুলতা থাকাও সম্ভব।
জল থাকে মৃত্তিকায়; মেঘগুলি ঊর্ধ্বাকাশে থাকে,
মাটির সংলগ্ন হয়ে, মধ্যপথে কখনো থাকে না।

১১

রাফ্লেসিয়া গাছ রূপে এতটা মাংসের মতো যাতে
মাছিরা ভুলবশত তাতে এসে ভিড় ক'রে থাকে।
জগতের সবচেয়ে বড় ফুল এই গাছে হয়,
তবুও কৃত্রিমভাবে অন্য গাছ থেকে খাদ্য নেয়।
ভেলার উপরে ভেসে সমুদ্রনাবিক চেয়ে দ্যাখে,
আকাশের সুদূরতা ছাড়া আর কোনো দৃশ্য নেই।
সূর্যপরিক্রমারত জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে শুধু
উল্কাগুলি অগ্নিময় এবং আশ্চর্য রূপবতী।

বিজলিবাতির তার অভ্যন্তরে না-থেকে বাহিরে
থাকে যদি জ্ব'লে যায়—জাগতিক রীতি এ-রকম।
সবুজ বর্ণাবলেপে আচ্ছাদিত ক'রে দিলে আরো
স্বপ্নাবেশময় আলো কোমল সৌন্দর্যে ভ'রে দেয়।
অলক্ষ্যে খাদ্যের মধ্যে বর্তমান খাদ্যপ্রাণগুলি
ভোজ্যকে সুপাচ্য করে, শরীরে সুগ্রাহ্য ক'রে তোলে।
নর্তকী, তুমি তো জানো, তোমাদের অঙ্গসঞ্চালন
এমন কুশলী যাতে নৃত্যতেও ক্লান্তিহীন থাকো।

১২

উদয়ের কালে সূর্য বৃহৎ, রক্তাভ হয়ে ওঠে।
কেন এরকম হয়, মানুষ তা এখনও জানে না।
মৃত্তিকা জলের চেয়ে দ্রুত তপ্ত হয় ব'লে সমুদ্রোপকূলে
সকালে স্থলের থেকে সাগরে দিকে এক বায়ু বয়ে যায়।
মেঘস্থ তুষারকণা, জলবিন্দু আকর্ষণে পৃথিবীর দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিরত ছুটে আসে; কিছু এলে বায়ু বেগে চূর্ণ হয়ে গিয়ে
পুনরায় ঊর্ধ্বে ওঠে, পুনরায় মেঘের ভিতরে গিয়ে জমে।
এ-ই বাতাসের রীতি, এই আলোড়ন থাকে মেঘলোকময়।

বুঝবে না—এই ভেবে প্রত্যক্ষ হাতের দ্বারা আক্রমণ ক'রে
প্রজাপতি ধরা হয়, তবুও আঙুল কিন্তু ব্যর্থ হয়ে থাকে।
প্রজাপতি উড়ে যায়, অপ্রতিভ হাত নুয়ে আসে।
বিষাদের দীর্ঘশ্বাস অনায়াসে বুকে চ'লে আসে,
কান্নার সময় কিন্তু থেমে থেমে, স্তরে স্তরে শ্বাস এসে থাকে।
সমুদ্রতরঙ্গ এসে চিরকাল মৃত্তিকাকে চিত্রিত করেছে,
অথচ মানুষ আজো জলপৃষ্ঠে দাগ দিতে পারেনি—পারে না।

১৩

একটি চুম্বক ভেঙে খণ্ড খণ্ড করা হলে তার
প্রত্যেক খণ্ডই এক সম্পূর্ণ চুম্বক হয়ে যায়।
নিকটে অমূল্য মণি, রত্ন নিয়ে যদি পথ চলো
কী এক উৎকণ্ঠা যেন সর্বদা পীড়িত ক'রে থাকে।

রাত্রিতে যে সব স্থানে বাতাস আবদ্ধ হয়ে থাকে
নদীবক্ষে সমধিক কুয়াশার জন্ম হয়ে যায়।
পৃথিবীর দেহ থেকে সহসা বাতাস লোপ পেলে
সকল জীবন, ফুল ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

চিত্রেরো জীবন আছে, সামাজিক মেলামেশা আছে;
মেশার ক্ষমতা যদি চ'লে যায় তবে চিত্র পরিত্যক্ত হয়।
জানো তো, বকুল ফুল শুকিয়ে খয়েরি হয়ে গেলে
মালায় গ্রথিত হয়, দীর্ঘস্থায়ী, গাঢ়গন্ধ মালা হতে পারে।

১৪

চাঁদের ছায়ার নিচে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের
সময়ে পৃথিবীলোকে দিগন্তের সর্বদিকে ছেয়ে
কমলালেবুর মতো কী এক আশ্চর্য আলো জাগে।
সূর্যে, কালো বৃত্তটিকে ঘিরে থাকে অপরূপ এক
রূপালী হীরকদীপ্তি; জ্ঞানোদয় হওয়া জেনেছি,
আকাশের রঙ নেই, বাতাসের নীলাভতা হেতু
আকাশের অবয়ব দিবালোকে নীল মনে হয়।
ঋতুস্রাব বন্ধ হলে যতই সঙ্গম করি, সখি,
সন্তানলাভের আশা-সম্ভাবনা শূন্য হয়ে থাকে।

□

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে এসো, চাকা

১

একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে
পুনরায় ডুবে গেলো—এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে
বেদনার গাঢ় রসে আপক্ক রক্তিম হলো ফল।

বিপন্ন মরাল ওড়ে, অবিরাম পলায়ন করে,
যেহেতু সকলে জানে তার শাদা পালকের নিচে
রয়েছে উদগ্র উষ্ণ মাংস আর মেদ;
স্বল্পায়ু বিশ্রাম নেয় পরিশ্রান্ত পাহাড়ে-পাহাড়ে;
সমস্ত জলীয় গান বাষ্পীভূত হয়ে যায়, তবু
এমন সময়ে তুমি, হে সমুদ্রমৎস্য, তুমি ... তুমি ...
কিংবা, দ্যাখো, ইতস্তত অসুস্থ বৃক্ষেরা
পৃথিবীর পল্লবিত ব্যাপ্ত বনস্থলী
দীর্ঘ-দীর্ঘ ক্লান্তশ্বাসে আলোড়িত করে;
তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে-যার ভূমিতে দূরে-দূরে
চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।
৮ মার্চ ১৯৬০

AMARBOI.COM

২

মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক স্বল্পকাল হাসে।
শিক্ষায়তনের কাছে হে নিশ্চল, স্নিগ্ধ দেবদারু
জিহ্বার উপরে দ্রব লবণের মতো কণা-কণা
কী ছড়ায়, কে ছড়ায়; শোনো, কী অস্ফুট স্বর, শোনো—
'কোথায়, কোথায় তুমি, কোথায় তোমার ডানা, শ্বেত পক্ষীমাতা,
এই যে এখানে জন্ম, একি সেই জনশ্রুত নীড় না মৃত্তিকা?
নীড় না মৃত্তিকা পূর্ণ এ-অস্বচ্ছ মৃত্যুময় হিমে ...'
তুমি বৃক্ষ, জ্ঞানহীন, মরণের ক্লিষ্ট সমাচার
জানো না, এখন তবে স্বর শোনো, অবহিত হও।
সুস্থ মৃত্তিকার চেয়ে সমুদ্রেরা কতো বেশি বিপদসংকুল
তারো বেশি বিপদের নীলিমায় প্রক্ষালিত বিভিন্ন আকাশ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-সত্য জেনেও তবু আমরা তো সাগরে আকাশে
সঞ্চারিত হতে চাই, চিরকাল হতে অভিলাষী,
সকল প্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া আমাদের ভালো লাগে ব'লে।
তবুও কেন যে আজো, হায় হাসি, হায় দেবদারু।
মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।
২৬ অগাস্ট ১৯৬০

৩

শিশুকালে শুনেছি যে কতিপয় পতঙ্গশিকারী ফুল আছে।
অথচ তাদের আমি এত অনুসন্ধানেও এখনো দেখিনি।
তাঁবুর ভিতরে শুয়ে অন্ধকার আকাশের বিস্তার দেখেছি,
জেনেছি নিকটবর্তী এবং উজ্জ্বলতম তারাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে
সব গ্রহ, তারা নয়, তাপহীন আলোহীন গ্রহ।
আমিও হতাশাবোধে, অবক্ষয়ে, ক্ষোভে ক্লান্ত হয়ে
মাটিতে শুয়েছি একা—কীটদষ্ট নষ্ট খোশা, শাঁস।
হে ধিক্কার, আত্মঘৃণা, দ্যাখো, কী মলিনবর্ণ ফল।
কিছুকাল আগে প্রাণে, ধাতুখণ্ডে সুনির্মল জ্যোৎস্না প'ড়েছিলো।
আলোকসম্পাতহেতু বিদ্যুৎসঞ্চার হয়, বিশেষ ধাতুতে হয়ে থাকে।
অথচ পায়রা ছাড়া অন্য কোনো ওড়ার ক্ষমতাবতী পাখি
বর্তমান যুগে আর মানুষের নিকটে আসে না।
সপ্রতিভভাবে এসে দানা খেয়ে ফের উড়ে যায়,
তবুও সফল জ্যোৎস্না চিরকাল মানুষের প্রেরণাস্বরূপ।
বিশেষ অবস্থামতো বিভিন্ন বায়ুর মধ্য দিয়ে
আমরা সতত চলি; বিষাক্ত, সুগন্ধি কিংবা হিম
বায়ু তবু শুধুমাত্র আবহমণ্ডল হয়ে থাকে।
জীবনধারণ করা সমীরবিলাসী হওয়া নয়।
অতএব, হে ধিক্কার, বৈদ্যুতিক আক্ষেপ ভালো তো,
অতি অল্প পুস্তকেই ক্রোড়পত্র দেওয়া হয়ে থাকে।
২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

৪

আকাশআশ্রয়ী জল বিস্তৃত মুক্তির স্বাদ পায়, পেয়েছিলো।
এখন তা মৃত্তিকায়, ঘাসের জীবনে, আহা, কেমন নীরব।
মহৎ উল্লাস, উগ্র উত্তেজনা এইভাবে শেষ হতে পারে?
ঈপ্সিত গৃহের দ্বারে পৌঁছোনোর আগেই যে ডিম ভেঙে যায়—
এই সিক্ত বেদনায় দূরে চ'লে গেলে তুমি, পলাতকা হাত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদানার দানা নিয়ে একা-একা খেলা করো, সুকুমার খেলা।
ঘন অরণ্যের মধ্যে সূর্যের আলোর তীব্র অনটন বুঝে
তরুণ সেগুন গাছ ঋজু আর শাখাহীন, অতি দীর্ঘ হয়;
এত দীর্ঘ যাতে তার উচ্চ শীর্ষে উপবিষ্ট নিরাপদ কোনো
বিকল পাখির চিন্তা, অনুচ্চ গানের সুর মাটিতে আসে না।
১১ অক্টোবর ১৯৬০

৫

স্রোতপৃষ্ঠে চূর্ণ-চূর্ণ লোহিত সূর্যাস্ত ভেসে আছে;
নিশ্চল, যদিও নিম্নে সংলগ্ন অস্থির স্রোত বয়।
এখন আহত মাছ কোথায় যে চ'লে গেছে দূরে,
তুমিও হতাশ হয়ে রয়েছো পিছন ফিরে, পাখি।
এখনো রয়েছে ওই বর্ণময়, সুস্থ পুষ্পোদ্যান;
তবুও বিশিষ্ট শোকে পার্শ্ববর্তী উদাত্ত সেগুন
নিহত, অপসারিত, আর নেই শ্যামল নিস্বন।
কেন ব্যথা পাও বলো, পৃথিবীর বিয়োগেবিয়োগে?

বৃক্ষ ও প্রাণীরা মিলে বায়ুমণ্ডলকে সুস্থ, স্বাস্থ্যকর রাখে।
এই সত্য জানি, তবু হে সমুদ্র, এ-অরণ্যে কান পেতে শোনো—
ঝিঁঝি পোকাদের রব—যদিও এখানে জল সকল সময়
এ-বিষয়ে সচেতন থাকে না, তবুও এই কান্না চিরদিন
এইভাবে রয়ে যায়, তরুমর্মরের মধ্যে অথবা আড়ালে।
১২ অক্টোবর ১৯৬০

৬

কাগজকলম নিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকা প্রয়োজন আজ;
প্রতিটি ব্যর্থতা, ক্লান্তি কী অস্পষ্ট আত্মচিন্তা সঙ্গে নিয়ে আসে।
সতত বিশ্বাস হয়, প্রায় সব আয়োজনই হয়ে গেছে, তবু
কেবল নির্ভুলভাবে সম্পর্কস্থাপন করা যায় না এখনো।
সকল ফুলের কাছে এতো মোহময় মনে যাবার পরেও
মানুষেরা কিন্তু মাংসরন্ধনকালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।
বর্ণাবলেপনগুলি কাছে গেলে অর্থহীন, অতি স্থূল ব'লে মনে হয়।
অথচ আলেখ্যশ্রেণী কিছুটা দূরত্ব হেতু মনোলোভা হয়ে ফুটে ওঠে।

হে আলেখ্য, অপচয় চিরকাল পৃথিবীতে আছে;
এই যে অমেয় জল—মেঘে মেঘে তনুভূত জল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর কতোটুকু আর ফসলের দেহে আসে বলো?
ফসলের ঋতুতেও অধিকাংশ শুষে নেয় মাটি।
তবু কী আশ্চর্য, দ্যাখো, উপবিষ্ট মশা উড়ে গেলে
তার এই উড়ে যাওয়া ঈষৎ সংগীতময় হয়।
১৪ অক্টোবর ১৯৬০

৭

বিনিদ্র রাত্রির পরে মাথায় জড়তা আসে, চোখ জ্ব'লে যায়,
হাতবোমা ভ'রে থাকে কী ভীষণ অতিক্রান্ত চাপে।
এ-রকম অবস্থায় হৃদয়ে কিসের আশা নিয়ে
কবিতার বই, খাতা চারিপাশে খুলে ব'সে আছি?
সকল সমুদ্র আর উদ্ভিদজগৎ আর মরুভূমি দিয়ে
প্রবাহিত হওয়া ভিন্ন বাতাসের অন্য কোনো গতিবিধি নেই।
ফলে বহুকাল ধ'রে অভিজ্ঞ হবার পরে পাখিরা জেনেছে
নীড় নির্মাণের জন্য উপযুক্ত উপাদান ঘাস আর খড়।
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলি ক্রমে জ্ঞান হয়ে ওঠে।
এ-সকল সংখ্যাতীত উদ্ভিদ বা তৃণ, গুল্ম ইত্যাদির মূল
অন্তরালে মিশে গিয়ে অত্যন্ত জটিলভাবে থাকা স্বাভাবিক।
কোনো পরিচিত নাম বলার সময় হলে মাঝে-মাঝে দেখি
মনে নেই, ভুলে গেছি ; হে কবিতারাশি, ভাবি ঈষৎ আয়াসে
ঠিক মনে এসে যাবে, অথচ...অথচ...হায়, সে এক বিস্মিত,
অসহ্য সন্ধান, তাই কেউ যদি সে-সময়ে ব'লে দেয় তবে
তপ্ত লৌহদণ্ড জলে প্রবিষ্ট হবার শান্তি আচম্বিতে নামে।
১৫ অক্টোবর ১৯৬০

৮

কেন যেন স'রে যাও, রৌদ্র থেকে তাপ থেকে দূরে।
ভেঙে যেতে ভয় পাও; জাগতিক সফলতা নয়,
শয়নভঙ্গির মতো অনাড়ষ্ট স্বকীয় বিকাশ
সকল মানুষ চায়—এই সাধনায় লিপ্ত হতে
অভ্যন্তরে ঘ্রাণ নাও, অযুত শতাব্দীব্যাপী চেয়ে
মস্তিষ্কে সামান্যতম সাধ নিয়ে ক্লিষ্ট প্রজাপতি
পাখাময় রেখাচিত্র যে-নিয়মে ফুটিয়ে তুলেছে
সে-নিয়ম মনে রাখো; ঢেউয়ের মতোন খুঁজে ফেরো।
অথবা বিম্বের মতো ডুবে থাকো সম্মুখীন মদে।
এমনকি নিজে-নিজে খুলে যাও ঝিনুকের মতো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যর্থ হও, তবু বালি, ভিতরে প্রবিষ্ট বালিটুকু
ক্রমে-ক্রমে মুক্তা হয়ে গতির সার্থক কীর্তি হবে।
শয়নভঙ্গির মতো স্বাভাবিক, সহজ জীবন
পেতে হলে ঘ্রাণ নাও, হৃদয়ের অন্তর্গত ঘ্রাণ।
১৩ জুন ১৯৬১

৯

মাংসল চিত্রের কাছে এসে সব ভোলা গিয়েছিলো।
মদিরার মতো তুমি অজস্র যুদ্ধের ক্ষত ধুয়ে
স্নিগ্ধ ক'রে দিয়েছিলে। প্রত্যাশার শেষে ছিপ রেখে
জাল ফেলে দেখার মতোন এই উদ্যম এসেছে।
বিদেশী চিত্রের মতো আগত, অপরিচিত হলে,
কিংবা নক্ষত্রের মতো অতিপরিচিত হলে তবে
আলাপে আগ্রহ আসে ; অথচ পত্রের মতো ভুলে
অন্য এক দুয়ারের কাছে উপনীত হয়ে যাই।
ডানা না-নেড়েই ঊর্ধ্বে যে-চিল সন্ধান ক'রে ফেরে
তার মতো ক্লান্তি আসে; কোনো যুগে কোনো আততায়ী
শত্রু ছিলো ব'লে আজো কাঁটায় পরিবেষ্টিত হয়ে
গোলাপ যেমন থাকে, তেমনি রয়েছো তুমি, আমি
পত্রের মতন ভুলে অন্য এক দুয়ারের কাছে।
১৬ জুন ১৯৬১

AMARBOI.COM

১০

বলেছি, এভাবে নয়, দৃশ্যের নিকটে এনে দিয়ে
সকলে বিদায় নাও; পিপাসার্ত তুলি আছে হাতে,
চিত্রণ সফল হলে শুনে নিও যুগল ঘোষণা।
অথবা কেবল তুমি লিপ্ত হলে সমাধান হয়।
মেলার মতোন ভিড়ে তবে তুমি—আমরা এখনো
ক্রমাগত বাধা পাই প্রাত্যহিক হৃদয়যাপনে।
সৃষ্টির পূর্বাহ্নে, দ্যাখো, নিজেকেই সৃষ্টি করা প্রয়োজন হয়।
পরিচিত সূর্য আরো বেশি আকর্ষণশীল হলে
হয়তো সমুদ্রবক্ষে এমন জোয়ার এসে যেতো
যাতে সব বালিয়াড়ি, প্রবালপ্রাচীর পার হয়ে
জলরাশি হৃদয়ের কাছে এসে উপস্থিত হতো।
অর্থাৎ কেবল তুমি লিপ্ত হলে সমাধান হয়।
২৬ জুন ১৯৬১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১

নাকি স্পষ্ট অবহেলা, কোরকে আকঙ্ক্ষা নিয়ে আজো
যে-আকাশ দেখা যায় তারো দূরে ওপারে আকাশে
চ'লে গেলে; কাল আছে, শারীরিক বৃদ্ধি, ক্ষয় আছে।
দেখেছি গাংচিলগুলি জাহাজের সঙ্গে-সঙ্গে চলে,
অথবা ফড়িঙ সেও নৌকোর উপরে ভেসে থাকে
ডানা না-নেড়েই, এত স্বাভাবিক, সহজ, স্বাধীন।
গ্রীষ্মের বিকেলবেলা অকস্মাৎ শীতল বাতাস
যেমন ঝড়ের ডাক, বৃষ্টির প্রস্তাব এনে দেয়,
আয়াসবিহীনভাবে যেমন নিশ্বাস নিতে হয়
অলক্ষ্যে ঘুমেরো মধ্যে, সে-প্রকার প্রয়োজন আছে,
তোমারো রয়েছে, তাই সমুদ্রমৎস্যের মতো নানা
বাতাসের ভার বও, সে-কথা বোঝো না, প্রিয়তমা?
২৬ জুন ১৯৬১

১২

সময়ের সঙ্গে এক বাজি ধ'রে পরাস্ত হয়েছি।
ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায়, স্বপ্নে বৃষ্টি হয়ে মাটিতে যেখানে
একদিন জল জমে, আকাশ বিম্বিত হয়ে আসে
সেখানে সত্বর দেখি, মশা জন্মে; অমৃত-প্রত্যূষে
ঘুম ভেঙে দেখা যায়, আমাদের মুখের ভিতরে
স্বাদ ছিলো, তৃপ্তি ছিলো যে-সব আহার্য তারা প'চে
ইতিহাস সৃষ্টি করে; সুখ ক্রমে ব্যথা হয়ে ওঠে।
অঙ্গুরীয়লগ্ন নীল পাথরের বিচ্ছুরিত আলো
অনুষ্ণ ও অনির্বাণ, জ্ব'লে যায় পিপাসার বেগে।
ভয় হয়, একদিন পালকের মতো ঝ'রে যাবো।
২৭ জুন ১৯৬১

১৩

আমাদের অভিজ্ঞতা সিক্ত গিরিখাতের মতোন
সংকীর্ণ, সীমিত; এই কদিন যাবত কুয়াশায়
মেঘে সব ঢেকে আছে—উপত্যকা, অরণ্য, পাহাড়।
পৃথিবীতে বহুবিধ আহার্য রয়েছে, তবু বলো,
বিড়ালের ব্যর্থতর জিহ্বা তার কতো স্বাদ পায়?
অথচ তীক্ষ্ণতা আছে, অভিজ্ঞতাগুলি সূচিমুখ,
ফুলের কাঁটার মতো কিংবা অতি দূর নক্ষত্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিধির মতো তীক্ষ্ণ, নাগালের অনেক বাহিরে।
যা-ই হোক, তা সত্ত্বেও বিশাল আকাশময় বায়ু,
বিশাল বাতাস বয়, বিরুদ্ধ বাতাসে বেধে যায়।
সর্বদা কোনো-না-কোনো স্থানে, দেশে, ঝড় হতে থাকে।
এ-সকল অনিশ্চিত অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব ভেদ ক'রে
তবুও পাইন গাছ, ঋজু হয়ে ক্রমে বেড়ে ওঠে,
প্রকৃত লিপ্সার মতো, আকাশের বিদ্যুতের দিকে।
২৭ জুন ১৯৬১

১৪

কী উৎফুল্ল আশা নিয়ে সকালে জেগেছি সবিনয়ে।
কৌটোর মাংসের মতো সুরক্ষিত তোমার প্রতিভা
উদ্ভাসিত করেছিলো ভবিষ্যৎ, দিকচক্রবাল।
সভয়ে ভেবেছিলাম সম্মিলিত চায়ের ভাবনা,
বায়ুসেবনের কথা, চিরন্তন শিখরের বায়ু।
দৃষ্টিবিভ্রমের মতো কাল্পনিক ব'লে মনে হয়
তোমাকে অস্তিত্বহীনা, অথবা হয়তো লুপ্ত, মৃত।
অথবা করেছো ত্যাগ, অবৈধ পুত্রের মতো, পথে।
জীবনের কথা ভাবি, ক্ষত সেরে গেলে পরে ত্বকে
পুনরায় কেশোদ্গম হবে না; বিমর্ষ ভাবনায়
রাত্রির মাছির মতো শান্ত হয়ে রয়েছে বেদনা—
হাসপাতালের থেকে ফেরার সময়কার মনে।
মাঝে-মাঝে অগোচরে বালকের ঘুমের ভিতরে
প্রস্রাব করার মতো অস্থানে বেদনা ঝ'রে যাবে।
১জুলাই, ১৯৬১

১৫

গুনে-গুনে ছেড়ে দিই, নিজেও সুস্থির পায়ে নামি
জাহাজডুবির পরে; শীতর আঁধারে মিশে থাকি।
বরং ছিলাম দীর্ঘ—দীর্ঘকাল, হাসি ভুলে হেসে,
করুণ ফলের মতো; কেউ চায় আত্মবলিদান।
ভ্রূণের বিকট দৃশ্যে ব্যথা পেয়ে—এমনই পৃথিবী—
গবেষক হয়ে ফের কারণ নির্ণয়, ক্ষয়-ক্ষতি
দেয়ালি রাত্রির নষ্ট কীটের মতোন জ'মে গেছে।
ফুল নয়, চাঁদ নয়, মহিলার দেহস্থিত মন
অতি অল্পকালে যদি বিকশিত হয় তবে হয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না-হলে কাঁটার মতো বিঁধে ফের কিছু ভেঙে থাকে।
অবশ্য তোমার কাছে যাবার সময়ে আলো লেগে
নীলাভ হয়েছে দেখি অনেক আকাশ ; দীর্ঘকাল
শীতল আঁধারে থেকে গবেষণা শেষ হয়ে আসে।
২ জুলাই ১৯৬১

১৬

পর্দার আড়ালে থেকে কেন বৃথা তর্ক ক'রে গেলে—
আমি ভগ্ন বৃদ্ধ নই, বিড়ম্বিত সম্পৃক্ত তরুণ।
এই যে ছেড়েছি দেশ, সব দৃশ্য, পাহাড়, সাগর—
এতে কি বিশ্বাস হবে; কোনোদিন মদ্যপান ক'রে
মাতালের আর্ত নেশা হয়তো হৃদয়ঙ্গম হবে—
লুপ্ত সভ্যতার কথা স্বীকারের মতো সার্থকতা।
বিকলাঙ্গ সন্তানের মতো স্নেহে বিনষ্ট অতীত
বুকের নিভৃতে নিয়ে ভাবি একা, ভাবি গ্রীষ্মকালে
শুষ্কপ্রায় জলাশয়ে সন্ত্রস্ত ভেকের মতো মনে।
বেশ, তবে চ'লে যাও, তবে যদি কোনোদিন কোনো
লৌকিক সাহায্যে লাগি, ডেকে নিও; যাকে ভালোবাসে
সেই পুষ্পকুঞ্জটিকে যত্নভ'রে তৃপ্ত সুখে রাখা
মানুষের প্রিয় কীর্তি; কিসের ব্যাঘাতে উঠো ক'রে
চন্দ্রালোক ধ'রে নিতে বারংবার ব্যর্থ হতে হয়;
সেই কোন ভোরবেলা ইটের মতোন চূর্ণ হ'য়ে
প'ড়ে আছি নানা স্থানে; কদাচিৎ যথেষ্ট ক্ষমতা,
তুমি এসে ছিন্ন-ছিন্ন চিঠির মতোন তুলে নিয়ে
কৌতূহলে এক ক'রে একবার প'ড়ে চ'লে যাও,
যেন কোনো নিরুদ্দেশে, ইটের মতোন ফেলে রেখে।
১৪ জুলাই ১৯৬১

১৭

কী যে হবে, কী যে হয়, এখনো অনেক রীতি বাকি।
দুরারোহ, নভোলীন পর্বতশিখরে আরোহণ
ক'রে ফের অবিলম্বে নেমে আসি, নেমে যেতে হয়।
কাচের শার্শিতে ধৃত, সুদূরের আকর্ষণে স্মিত,
প্রজাপতিদের মতো ঘরে কিংবা নক্ষত্রে বা চাঁদে
গমনেচ্ছুদের মতো পৃথিবীতে প'ড়ে আছি শুধু
বাধা ও ব্যাঘাত পেয়ে; আমাদের পরিণাম এই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু ভালো, ইঁদুরের দংশনে আহত হয়ে তবু
ঘুম ভেঙে যাওয়া ভালো, সাপ ভেবে, উত্তেজিত হয়ে।
যদিও অগ্নির মতো জ্বললেই, প্রিয় অন্ধকার,
বহু দূরে স'রে গেছো; অবশেষে দেখি, প্রেম নয়,
প'ড়ে আছে পৃথিবীর অবক্ষয়ী সহনশীলতা।
নিষ্পেষণে ক্রমে-ক্রমে অঙ্গারের মতোন সংযমে
হীরকের জন্ম হয়, দ্যুতিময়, আত্মসমাহিত।
১৫ জুলাই ১৯৬১

১৮

বেশ কিছুকাল হলো চ'লে গেছো, প্লাবনের মতো
একবার এসো ফের ; চতুর্দিকে সরস পাতার
মাঝে থাকা শিরীষের বিশুষ্ক ফলের মতো আমি
জীবনযাপন করি ; কদাচিৎ কখনো পুরোনো
দেয়ালে তাকালে বহু বিশৃঙ্খল রেখা থেকে কোনো
মানুষীর আকৃতির মতো তুমি দেখা দিয়েছিলে।
পালিত পায়রাদের হাঁটা, ওড়া, কূজনের মতো
তোমাকে বেসেছি ভালো; তুমি পুনরায় চ'লে গেছো।
১৯ জুলাই ১৯৬১

AMARBOI.COM

১৯

নেই, কোনো দৃশ্য নেই, আকাশের সুদূরতা ছাড়া।
সূর্যপরিক্রমারত জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে শুধু
ধূমকেতু প্রকৃতই অগ্নিময়ী; তোমার প্রতিভা
স্বাভাবিকতায় নীল, নর্তকীর অঙ্গসঞ্চালন
ক্লান্তিকর নয় ব'লে নৃত্য হয় যেমন তেমনি।
সুমহান আকর্ষণে যেভাবে বৃষ্টির জল জ'মে
বিন্দু হয়, সেইভাবে আমিও একাগ্র হয়ে আছি।
তবু কোনো দৃশ্য নেই আকাশের সুদূরতা ছাড়া।
১৯ জুলাই ১৯৬১

২০

আর যদি না-ই আসো, ফুটন্ত জলের নভোচারী
বাষ্পের সহিত যদি বাতাসের মতো না-ই মেশো,
সেও এক অভিজ্ঞতা; অগণন কুসুমের দেশে
নীল বা নীলাভবর্ণ গোলাপের অভাবের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার অভাব বুঝি; কে জানে হয়তো অবশেষে
বিগলিত হতে পারো ; আশ্চর্য দর্শন বহু আছে—
নিজের চুলের মৃদু ঘ্রাণের মতোন তোমাকেও
হয়তো পাই না আমি, পূর্ণিমার তিথিতেও দেখি
অস্ফুট লজ্জায় ম্লান ক্ষীণ চন্দ্রকলা উঠে থাকে,
গ্রহণ হবার ফলে, এরূপ দর্শন বহু আছে।
২০ জুলাই ১৯৬১

২১

অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতার
সংবাদের মতো আমি জেনেছি তোমাকে ; বাতাসের
নীলাভতাহেতু দিনে আকাশকে নীল মনে হয়।
বালুময় বেলাভূমি চিত্রিত করার পরেকার
তরঙ্গের মতো লুপ্ত, অবলুপ্ত, তুমি, মনোলীনা।
এতকাল মনে হতো, তুমিও এসেছো অভিসারে—
চাঁদের উপর দিয়ে স্বচ্ছ মেঘ ভেসে-ভেসে গেলে
যেমন প্রতীতি হয়, মেঘ নয়, চাঁদ চলমান।
এখন জেনেছি সব, তবুও প্রয়াস প'ড়ে আছে
শিশুদের আহার্যের মতোন সরল হও তুমি
সরল, তরল হও; বিকাশের রীতিনীতি এই।
বৃক্ষের প্রত্যঙ্গ নড়ে—এই দৃশ্য দেখেই কখনো
সে নিজে দোলনক্ষম—এই কথা পাখিদের মতো
ভুল ক'রে ভেবেছো কি, তোমার বাতাসে সে তো দোলে।
২০ জুলাই ১৯৬১

২২

নিকেটে অমূল্য মণি, রত্ন নিয়ে চলার মতোন
কী এক উৎকণ্ঠা যেন সর্বদা পীড়িত ক'রে রাখে।
শুনি, নানা ফুল আছে; অথচ ক্ষতবিশিষ্ট কারো
সমুদ্রস্নানের মতো—লোনা জলের স্নানের মতোন
ভীতি ছেয়ে আসে মনে; এখন কোথায় তুমি ভাবি।
পৃথিবীর বুক থেকে সহসা বাতাস লোপ পেলে
সকল জীবন, ফুল, সব কীর্তি, খ্যাত কীর্তিগুলি
ধ্বংস হয়ে যেতে পারে—যে-সব চিত্রের পক্ষে কোনো
সামাজিক মেলামেশা অসম্ভব তাদের মতোন
ত্যক্ত হয়ে যেতে পারো ; কিংবা বকুলের মতো শেষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুকিয়ে খয়েরি হয়ে, দীর্ঘস্থায়ী হয়ে মালিকায়
কোনোদিন আসবে কি, নিষিদ্ধ সমুদ্রস্নান আজ।
নিকটে অমূল্য মণি, রত্ন নিয়ে চলার মতোন
কী এক উৎকণ্ঠা যেন সর্বদা পীড়িত ক'রে রাখে।
২০ জুলাই ১৯৬১

২৩

যেন প্রজাপতি ধরা—প্রত্যক্ষ হাতের অতর্কিত
আক্রমণ ক'রে ব্যর্থ; পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের
অবকাশে ফুটে ওঠা পিপাসার্ত তারাদের মতো
অন্যান্য সকলে আছো; অথচ আমি তো নিরুপায়।
ক্ষুধিত বাঘের পক্ষে শূন্যে দিক-পরিবর্তনের
মতোন অসাধ্য কোনো প্রচেষ্টার সারবত্তা নেই।
তোমাদেরই নীতি নেই; সে এখনো আসতেও পারে।
কিছুটা সময় দিলে তবে দুধে সর ভেসে ওঠে।
২০ জুলাই ১৯৬১

২৪

সুগভীর মুকুরের প্রতি ভালোবাসার মতোন
শান্ত দিনগুলি যায়, হায় সখী, নবজাতকের
শৈশবে হৃদয় দিয়ে পালন করায় অপারগ
শাশ্বত মাছের মতো বিস্মরণশীলা যেন তুমি।
যদিও সংবাদ পাবে, পেয়েছো বেতারে প্রতিদিন,
জেনেছো অন্তরলোক, দূরে থেকে, তবু ভুলে যাবে।
গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রতি গূঢ় ভালোবাসার মতোন
প্রকাশের কোনোরূপ উপায়বিহীন যন্ত্রণায়
গীতিপরায়ণ আমি ; মানুষের মরণের আগে
পিপাসা পাওয়ার মতো অতিরিক্ত অথচ করুণ
আমার অপেক্ষা, আশা—আজ এ-রকম মনে হয়।
সুগভীর মুকুরের প্রতি ভালোবাসার মতোন।
শান্ত দিনগুলি যায় ; হায় সখী, বিস্মরণশীলা।
২২ জুলাই ১৯৬১

২৫

বিদেশী ভাষায় কথা বলার মতোন সাবধানে
তোমার প্রসঙ্গে আসি ; অতীতের কীর্তি বাধা দেয়।
হে আশ্চর্য দীপ্তিময়ী, কীটদষ্ট কবিকুল জানে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারা চিত্রকর নয়, তাদের শৌখিন শিল্পায়নে
আলেখ্যের মুখে চুল, ওষ্ঠ—সব কিছু আঁকা হয়
কিন্তু তবু সে-মুখের অধিকারিণীর স্নিগ্ধ রূপ
আলেখ্যে আসে না ; ফলে সাধনা ও ডুবুরি রয়েছে।
তোমার কী মনে হয়? এও কি অপরিণত ফল?
অথবা যৌগিক কথা যে-প্রাণীর রোম দৃঢ়মূল
পরিধেয় বস্ত্রাদিতে তার ত্বক ব্যবহৃত হবে?
২৩ জুলাই ১৯৬১

২৬

তিন পা পিছনে হেঁটে পদাহত হয়ে ফিরে আসি।
আবার তোমার কথা মনে আসে ; ধূমকেতুর মতো
দীর্ঘকাল মনে রবে তোমাকে; পূর্ণাঙ্গ জীবনের
জটিলতা, প্রতিঘাত বালকের মতোন সাগ্রহে
ভালোবাসি; হৃদয়ের গুরুভার জলে নিমজ্জিত
অবস্থায় লঘু ক'রে নেবার পিচ্ছিল সাধ ক'রে
পদাহত হয়ে ফিরি ; অজ্ঞাত পূর্ণাঙ্গ জীবনের
জটিলতা, প্রতিঘাত বালকের মতো ভালোবাসি।
২৩ জুলাই ১৯৬১

AMARBOI.COM

২৭

মুক্ত ব'লে মনে হয়; হে অদৃশ্য তারকা, দেখেছো
কারাগারে দীর্ঘকাল কী-ভাবে অতিবাহিত হলো।
অথচ বাতাস ছিলো ; আবদ্ধ বৃক্ষের পাতাগুলি
ভাষাহীন শব্দে, ছন্দে এতকাল আন্দোলিত ছিলো।
অদৃশ্য তারকা, আজ মুক্ত ব'লে মনে হয় ; ভাবি,
বালিশে সুন্দর কিছু ফুল তোলা নিয়ে এত ক্লেশ।
ইতিমধ্যে কতিপয় অতি অল্প পরিচিত, নীল—
নীল নয়, মনে হয়, নীলাভ কচুরি ফুল মৃত।
অদর্শনে ম'রে গেছে ; অন্ধকার, ক্ষুব্ধ অন্ধকার।
জীবনে ব্যর্থতা থাকে ; অশ্রুপূর্ণ মেঘমালা থাকে;
বেদনার্ত মোরগের নিদ্রাহীন জীবন ফুরালো।
মশাগুলি কী নিঃসঙ্গ, তবুও বিষণ্ণ আশা নিয়ে
আর কোনো ফুল নয়, রৌদ্রতৃপ্ত সূর্যমুখী নয়,
তপ্ত সমাহিত মাংস, রক্তের সন্ধানে ঘুরে ফেরে।
২৭ জানুয়ারি ১৯৬২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮

অত্যন্ত নিপুণভাবে আমাকে আহত ক'রে রেখে
একটি মোটরকার পরিচ্ছন্নভাবে চ'লে গেলো।
থেমে ফিরে তাকালেই দেখে যেতো, অবাক আঘাতে
কী আশ্চর্য সূর্যোদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে কুয়াশা,
কী বিস্মিত বেদনায় একা-একা কেঁদে ফেরে শিশু।
অজীর্ণ, তোমাকে নিয়ে আর কতো গান গাওয়া হবে?
এতকাল চ'লে গেলো, তবু মাঝে-মাঝে বাতায়ন
খুলে দেখি, মহাশূন্যে গোয়েন্দার মতো জোনাকিরা
জ্বলে নেভে, জ্বলে নেভে ; তৃষ্ণা নিয়ে এরূপ খেলায়
কতোকাল চ'লে গেলো ; মরণের মতো ক্লান্তি আসে।
এসো ক্লান্তি, এসো এসো, বহু পরীক্ষায় ব্যর্থ হাঁস
পুনরায় বলে, তার ওড়ার ক্ষমতাবলি নেই,
নির্মিত নীড়ের কথা মনে আনে বিস্মিত স্মৃতিতে।
অজীর্ণ, তোমাকে নিয়ে আর কতো গান গেয়ে যাবো?
১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২

২৯

রক্তে-রক্তে মিশে আছে কৌতূহল, লিপ্সু-কৌতূহল;
বীজের ভিতরে আছে গুহার লালসাময় রস।
নতুন ঘরের আলো, পার্বত্য ফুলের চিত্রগুলি
মনকে নিয়েছে টেনে চারিদিকে, ছিন্নভিন্ন বেশে।
এ-ই স্বাভাবিক, এই বিনিদ্রতা লালনেপালনে
বৃদ্ধি পেয়ে প্রীতি হয়, হয়তো ঘাসের ফলকেও
শস্য ব'লে ধান ব'লে বোঝার আদিম উদ্ভাবনা
কখনো সম্ভব হয়; অথচ নিষিদ্ধ মেলামেশা।
যদি যাই প্রথমেই মাংসল মালার আমন্ত্রণ,
মন নিয়ে কিছুকাল তাপ পেতে ব্যয় করেছি কি
শোনা যাবে, হীরকের মতো আমি কঠিন, নিষ্ক্রিয়।
ফলে সবই ব্যর্থ হয় ; কৌতূহল নিয়ে খেলা করি।
কবেকার নিমজ্জিত জাহাজের প্রেমে ভুলে থাকি,
ভুলে থাকি বর্তমান রসোত্তীর্ণ মালা ও মদিরা।
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০

আর অন্ধকার নয়, আর নয় অবাঞ্ছিত ছায়া।
উন্মুক্ত স্বস্থানে স্থিত, বৃক্ষাবলি অধিক সংখ্যায়
ফুল, ফল পেয়ে থাকে, ফসলের উপচার পায়।
এবার উন্মাদ হবো, অবশেষে উন্মত্ত নখরে
খুলে নেবো পলাতকা পরিটির ঠিকানা, দরজা।
ইলোরার চিত্রাবলি, হরিণের মাংসের মতোন
বিলম্বিত ব্যবহার পাবো আমি জিহ্বায়, জগতে,
এরূপ বিরহী ভয় যথার্থই হয়েছে আমার।
তবে তুমি গুহাচিত্র, নিঃসন্দেহে দীর্ঘায়ু, সফল।
আর অন্ধকার নয়, আর নয় অবাঞ্ছিত ছায়া।
২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২

৩১

প্রত্যাখ্যাত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন।
অগ্নি উদ্গমন ক'রে এ-গহ্বর ধীরে-ধীরে তার
চারিপাশে বর্তমান পর্বতের প্রাচীর তুলেছে।
এতো উচ্চে সমাসীন আজ তার আপন সততা,
যাতে সমতলবর্তী প্রজাপতি, পাখিদের রঙ
তার কাছে নিরর্থক; এমন সমস্যাকীর্ণ ব্যোমে।
দূরে যাও মেঘমালা, তোমাদের দৌত্যে, আলিঙ্গনে
আমি আর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের ক্রোড়ে তো যাবো না!
আমি যাবো দেশান্তরে যেখানে ফুলের মুক্তি আছে,
বৃষ্টি, ঢেউ ত্যাগ ক'রে রসে পুষ্ট শিল্প পেতে পারি।
বর্তমানে, চারিপাশে পর্বতের প্রাচীর আসীন।
আমি আর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের ক্রোড়ে তো যাবো না।
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২

৩২

কেন এই অবিশ্বাস, কেন আলোকিত অভিনয় ?
কী আছে এমন বর্ণ, গন্ধময়; জীবনের পথে,
গ্রন্থের ভিতরে আমি বহুকাল গবেষক হয়ে
লিপ্ত আছি, আমাদের অভিজ্ঞতা কীটের মতোন।
জানি, সমাধান নেই; অথচ পালঙ্করাশি আছে,
রাজকুমারীরা আছে—সুনিপুণ প্রস্তরে নির্মিত
যারা বিবাহের পরে বারংবার জলে ভিজে-ভিজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৈবালে আবিষ্ট হয়ে সরস শ্যামল হতে পারে।
এখন তাদের রূপ কী আশ্চর্য ধবল লোহিত।
অকারণে খুঁজে ফেলা ; আমি জানি, নীল হাসি নেই।
জঠরের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অট্টালিকা সচ্ছলতা আছে
সফল মালার জন্য; হৃদয় পাহাড়ে ফেলে রাখো।
২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২

৩৩

রোমাঞ্চ কি রয়ে গেছে ; গ্রামে অন্ধকারে ঘুম ভেঙে
দেহের উপর দিয়ে শীতল সাপের চলা বুঝে
যে-রোমাঞ্চ নেমে এলো, রুদ্ধশ্বাস স্বেদে ভিজে-ভিজে।
সর্পিণী, বোঝোনি তুমি, দেহ কিনা, কার দেহ, প্রাণ।
সহসা উদিত হয় সাগরহংসীর শুভ্র গান।
স্বর-সুর এক হয়ে কাঁপে বায়ু, যেন তুষ্ট শীতে,
কেঁদে ওঠে, জ্যোৎস্নার কোমল উত্তাপ পেতে চায়।
রোমাঞ্চ তো রয়ে গেছে শীতল সাপের স্পর্শে মিশে।
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২

AMARBOI.COM

৩৪

সবই অতিশয় শান্ত ; নির্বাক ডিমের ভাঙা খোশা,
শালপাতা, হাহাকার, বকুল বৃক্ষের দীর্ঘশ্বাস।
সব যেন কবেকার বনভোজনের পরিশেষে
কোনো নীল অনামিকা নদীর মতোন দীর্ঘ হয়ে
চ'লে গেছে নিরুদ্দেশে ; দূর থেকে ভেসে-ভেসে আসে
কাঠ চেরাইয়ের শব্দ ; আমাদের দেহের ফসল,
খড় যেন ঝ'রে গেছে, অবশেষে স্বপ্নের ভিতরে।
এত স্বাভাবিকভাবে সবই ব্যর্থ—ব্যর্থ, শান্ত, ধীর।

যে গেছে সে চ'লে গেছে ; দেশলাইয়ে বিস্ফোরণ হয়ে
বারুদ ফুরায় যেন ; অবশেষে কাঠটুকু জ্বলে
আপন অন্তরলোকে ; মাঝে-মাঝে সহসা সাক্ষাৎ
তারই অনুজার সঙ্গে ; বকুল বৃক্ষের দিকে চাই,
অত্যন্ত নিবিড়ভাবে চেয়ে দেখি, যে-শাখায় কলি
একবার এসেছিলো, সে-শাখায় ফুটবে কি দ্বিতীয় কুসুম?
১ মার্চ, ১৯৬২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৫

যদি পারো তবে আনো, আনো আরো জয়ের সম্ভার।
যদি মহীরুহ পেয়ে কাছে আসে কতিপয় লতা
তবে তো ক্ষমতা আছে, তার কাছে আত্মনিবেদনে
যেতে পারো সবিনয়ে ; হয়তো সে দ্রবীভূত হবে।
এখনো সন্দেহ আছে, নতুন পাতার শ্যামলতা
তার কাছ থেকে কোনো জ্যোৎস্না ভিক্ষা ক'রে পাবে কিনা।
সে কী ফল ভালোবাসে, কে জানে সবুজ কিংবা লাল,
কিছুই জানো না তুমি ; তবু দীর্ঘ আলোড়ন আছে,
অনাদি বেদনা আছে, অক্ষত চর্মের অন্তরালে
আহত মাংসের মতো গোপন বা গোপনীয় হয়ে।
১ মার্চ ১৯৬২

৩৬

ধূসর জীবনানন্দ, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে
কতিপয় চিল শুধু বলেছিলো, 'এই জন্মদিন'।
এবং গণনাতীত পারাবত মেঘের স্বরূপ
দর্শনে বিফল ব'লে, ভেবেছিলো, অক্ষমের গান।
সংশয়ে-সন্দেহে দুলে একই রূপ বিভিন্ন আলোকে
দেখে দেখে জিজ্ঞাসায় জীর্ণ হয়ে তুমি অবশেষে
একদিন সচেতন হরীতকী ফলের মতোন
ঝ'রে গেলে অকস্মাৎ, রক্তাপ্লুত ট্রামে থেমে গেলো।

AMARBOI.COM

এখন সকলে বোঝে, মেঘমালা ভিতরে জটিল
পুঞ্জীভূত বাষ্পময়, তবুও দৃশ্যত শান্ত, শ্বেত,
বৃষ্টির নিমিত্ত ছিলো, এখনো রয়েছে, চিরকাল
রয়ে যাবে; সংগোপন লিপ্সাময়ী, কম্পিত প্রেমিকা—
তোমার কবিতা, কাব্য, সংশয়ে-সন্দেহে দুলে-দুলে
তুমি নিজে ঝ'রে গেছো, হরীতকী ফলের মতোন।
৩ মার্চ, ১৯৬২

৩৭

আমিই তো চিকিৎসক, ভ্রান্তিপূর্ণ চিকিৎসায় তার
মৃত্যু হলে কী প্রকার ব্যাহত আড়ষ্ট হয়ে আছি।
আবর্তনকালে সেই শবের সহিত দেখা হয় ;
তখন হৃদয়ে এক চিরন্তন রৌদ্র জ্ব'লে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ শবের সঙ্গে কথা বলা স্বাভাবিক কিনা
ভেবে-ভেবে দিন যায়; চোখাচোখি হলে লজ্জা-ভয়ে
দ্রুত অন্য দিকে যাই; কুক্কুপিন্ট ফুলের ভিতরে
জ্বরাক্রান্ত মানুষের মতো তাপ ; সেই ফুল খুঁজি।
৬ মার্চ ১৯৬২

৩৮

স্বপ্নের আধার, তুমি ভেবে দ্যাখো, অধিকৃত দু-জন যমজ
যদিও হুবহু এক, তবু বহুকাল ধ'রে সান্নিধ্যে থাকায়
তাদের পৃথকভাবে চেনা যায়, মানুষেরা চেনায় সক্ষম।
এই আবিষ্কারবোধ পৃথিবীতে আছে ব'লে আজ এ-সময়ে
তোমার নিকটে আসি, সমাদর নেই তবু সবিস্ময়ে আসি।
পত্রবাহকের মতো কাষ্ঠময় দরজায় করাঘাত ক'রে
তোমাকে ঘুমের থেকে অবিন্যস্ত অবস্থায় বাহিরে এনেছি।
আমরা যে জ্যোৎস্নাকে এত ভালোবাসি—এই গাঢ় রূপকথা
চাঁদ নিজে জানে না তো ; না জানুক শুভ্র ক্লেশ, তবু অসময়ে
তোমার নিকটে আসি, সমাদর নেই তবু আসি।
১১ মার্চ ১৯৬২

৩৯

আরো কিছু দৃশ্যাবলি দেখেছি, জীবিতকালে যারা
চিত্রায়িত হতে পারে ; ব্যথাতুর, অসুবিধা এই,
কিছুই গোপন নেই ; মনে হয়, নির্বাক শিশুর
হাসি দেখে বুঝে নেয়, যার-যার অভিরুচি মতো।
ফলত নিষ্ক্রিয় থাকি, কুসুমের প্রদর্শনী দেখি।
দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাই; বাতাসে বিধৌত দেহমন
কার জন্য সুরক্ষিত, হায় কাল, জলের মতোন
পাত্রের আকার পাওয়া এ-বয়সে সম্ভব হবে কি?
১২ মার্চ ১৯৬২

৪০

মনের নিভৃত ভাগ লোভাতুর, সতত সুগ্রাহী।
চেয়ে দেখি, শুধু-শূন্য, বিভিন্ন উষ্ণতা নিয়ে এসে
ঊর্দ্ধাকাশে ভিন্ন-ভিন্ন বায়ু মিলে তরঙ্গআকারে
মেঘের সূচনা করে, ভেবে এত লোভ, ভালোবেসে।
সুদূর সমুদ্রবায়ু, কোথায় উষ্ণতা নিয়ে যাও?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যেই কেঁদে উঠি অনির্বাণ আঘাতে আহত
তখনি সকলে ভাবে, শিশুদের মতোই আমার
ক্ষুধার উদ্রেক হলো, বেদনার কথা বোঝে না তো।
১২ মার্চ ১৯৬২

৪১

সুরায় উন্মত্ত হয়ে পদাঘাতে পুষ্পাধারটিকে
বিচূর্ণ করেছি ; কোনো পরিতাপ রাখিনি হৃদয়ে।
এখন টেবিল রবে অন্তর্গত কাগজে আবৃত।
দিনগুলি চ'লে যাবে রহস্যের সমাধানে, যাবে
উপচীয়মান কিছু বৎসর; বয়স বাড়ুক।
মাটি খুঁড়ে যেতে হবে; মাটির গভীরে ইতস্তত
সভ্যতার অবশেষ খুঁজে পাই, পেয়েছি অনেক
পোড়া ইট, পুতুলের অবয়ব ভগ্নপ্রায় বুক।
মানুষেরা আজ যেন নিরুপম সম্রাটশিকারে
ব্যস্ত আছে ; নানারূপ ছলা-কলা মিথ্যার আশ্রয়ে
কোনোভাবে কিছু কাল বিনষ্ট করায় আস্থাবান।
জান্তব আগ্রহে দ্যাখে অশ্বের ভয়ার্ত গতিবেগ—
কখন সে শ্রান্ত হবে, ধরা দেবে এই প্রতীক্ষায়;
সম্রাট বলে না কথা, রহস্যের সমাধানে থাকে।
১৫ মার্চ ১৯৬২

AMARBOI.COM

৪২

আমার সৃষ্টিরা আজ কাগজের ভগ্নাংশে নিহিত
কিছু ছন্দে, ভীরু মিলে আলোড়িত কাব্যের কণিকা
এখন বিক্ষিপ্ত নানা বায়ুপথে, ঝড়ের সম্মুখে।
আমাকে ডাকে না কেউ নিরলস প্রেমের বিস্তারে।
পুনরায় প্রতারিত ; কাগজের কুসুমকলিকে
ফোটাতে পারিনি আমি, অথবা সে মৃতদেহ নাকি!
এই বেদনায় ফের শিশির, বাতাস সঙ্গে নিয়ে
খুঁজেছি সংগত হৃদ, দেশে দেশে, হায় অনাহতা।
১৫ মার্চ ১৯৬২

৪৩

রসাত্মক বাক্য লেখা কবে যে আয়ত্ত হবে, ভাবি
কবোষ্ণ প্রভাতবেলা উজ্জ্বল শব্দের দিকে চেয়ে
অনুশোচনায় ভরে হৃদয়; কখনো অধিকার
পাবো না হে বাষ্পপুঞ্জ, বক্ষের অমল ক্ষতরাশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা উড়ে যাবে দূরে, গানের সহিত যুক্ত হয়ে
পাখির পশ্চাতে কিংবা নোঙরের গম্ভীর রজ্জুতে,
নিজের নিয়ম মতো ; আমার এ-লেখনীর মুখে
আসবে না, মিশে যাবে পিপীলিকাশ্রেণীতে, জগতে।
১৭ মার্চ ১৯৬২

৪৪

কিছুটা সময় তবু আমাকেও ক'রে নিতে হবে।
শরীরের তমোরস অবিরাম সেই কথা বলে।
হৃদয় ক্ষতের মতো অবিরাম জ্ব'লে যেতে থাকে।
এখন সম্মুখে যাবো, অসুস্থতাগুলি মনে-মনে
গোপন রেখেই যাবো; ফুলের সহিত আলোচনা
করা তো সম্ভব নয়, যেতে হবে পিতার সকাশে।
যদি বা মালিকা পাই, ভয় হয়, অসুস্থতাহেতু
শাশ্বত পানীয়—জল হয়তো বিস্বাদ মনে হবে।
১৭ মার্চ ১৯৬২

৪৫

শূন্যকে লেহন করো, দেবদারু, উর্ধ্বগ শাখায়,
পত্ররিক্ত নগ্নরূপে; উদ্যত নতুন কোনো মুখ
কিংবা বিম্ব নেই আজ ; কারো প্রতি অবলোকনের
প্রয়োজন ফুরিয়েছে; অনেকেই বহুকাল আগে
ফিরে গেছে ; একদিন সূর্যের দীপ্তিতে অন্ধ হয়ে
তারা সবে সবিস্ময়ে সূর্যের পূজারী হয়েছিলো।

দেবদারু, আমি স্পষ্ট পেচকের মতো গহ্বরের
স্বস্তি অভিলাষী, তবু ফিরে আসি পূর্ববর্তী ফুলে
ক্বচিৎ কখনো কোনো ফোঁড়া হলে নিষিদ্ধ হলেও
যে-কারণে তার কাছে অগোচরে হাত চ'লে যায়।
১৮ মার্চ ১৯৬২

৪৬

যে-পথ রয়েছে তাকে একমাত্র পায়ে-পায়ে হেঁটে
পার হয়ে যেতে হবে, আর কোনো সুরম্য শকট
পাবো না নিষ্ফলা পথে, এমনকি অশ্বগুলি কবে
হারিয়ে গিয়েছে সেই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের
বিধ্বস্ত সময়ে, তবে মানুষের পদদ্বয় আছে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো বন্ধু নেই আর, সহায়তা পাই না কখনো।
নিজের নিরস্ত্র শোভা, উলঙ্গ অবস্থা নিয়ে আর
কোথায়, কাদের দ্বারে উপস্থিত হবো, হে সময়?
এখন হেঁটেই চলি; জলে ডুব দেবার আগেই
ডুবুরির মতো কিছু সুগভীর শ্বাস টেনে নিই।
১৮ মার্চ ১৯৬২

৪৭

কোনোদিন একবার উদ্যানে বেড়াতে গেলে পরে
পরিচিতা বাঘিনীর শব পেয়ে অস্তু, চমৎকৃত
একটি মশক বেশ সুনিবিড় প্রেমে পড়েছিলো।
অধ্যবসায়ের ফল ব্যথিত ব্যর্থতাময়, কালো।

পচা শবে মৃত্তিকায় পুষ্পকুঞ্জ জন্ম পেলো নাকি?
বেশ কিছুকাল হলো লীলাময়ী রসার্ত বয়স
কাদের গৃহস্থবধূ হয়েছে ; কী-ভাবে জানি না তা।
লতারা কী-ভাবে বোঝো কাছে কোনো মহীরুহ আছে,
তার 'পরে আরোহণ ক'রে তবে জীবনযাপন
করার সফল কীর্তি কী-ভাবে যে করে, তা জানি না।
তবু বৃক্ষ সনাতম বৃক্ষই, লতাও শুধু লতা,
মৌমাছি ও কুসুমের অভীপ্সার রোমাঞ্চ জানে কি?
২২ মার্চ ১৯৬২

৪৮

শুধু গান ভালোবাসো; বিপদার্ত মিলনচিৎকারে
এমন আগ্রহহীনা, চ'লে গেছো পার্কের আশ্রয়ে।
উৎপাটিত, রুগ্ন বৃক্ষ আর কোনো গান গায় না যে।
শিকড়ের থেকে তবু নতুন অঙ্কুর অভ্যুদিত—
চেয়ে দ্যাখে, মুখগুলি নিরুৎসাহ, গুপ্ত সাম্রাজ্যের
পতনের কাল থেকে রয়েছে এমনিভাবে, যেন
কাঠখোদাইয়ের শিল্প; রক্তাপ্লুত শতাব্দীগুলির
উচ্ছ্বাস বিষাদরাশি নীরস আবহে পরিণত।
আমি বৃক্ষ, রোগশয্যা পরিত্যক্ত টিপয়ের মতো
জীর্ণ, ধূলিময়, ম্লান। সলিলসমৃদ্ধ সিন্ধু নয়,
কারো অতি স্বাভাবিক অমোঘ শীতল হাতও নেই,

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-হাত কপালে পেলে অতীত ও বর্তমানও মোছে
অসুখ গভীর তবু, হায় কবি, সংক্রামক নয়
কখনো ফুলের দেহে সংক্রামিত হয়নি, হবে না।
৫ এপ্রিল ১৯৬২

৪৯

একটি বৎসর শুধু লাস্যময়ী অগ্নির সকাশে
ব'সে-ব'সে সদালাপে কাটিয়েছি অবকাশকাল।
বহু তাপ পেয়ে শেষে, হায় অগ্নি, জ্বরাক্রান্ত হয়ে
নীলিম কোরকে বিদ্ধ ; কিছুকাল পরে অন্য পটে
থেকেছি উদ্দাম বোধে বরফের ঘরের ভিতরে
মথিত ঐশ্বর্য নিয়ে ; তবে পুনরায় অসুস্থতা
আমাকে ঘিরেছে, দ্যাখো, উদ্ঘাটিত করেছে নিঃস্বতা;
রোগের সময় কোনো শুশ্রূষা পাবার বিত্ত নেই।

অসুস্থতাকালে এত বিচিত্র লালসাময়ী স্বাদ
মনে পড়ে, জেগে রয় ঝালমত্ত আহার্যের ঘ্রাণ,
মাংসের ঝোলের সিক্ত আবাহন বুভুক্ষু শরীরে।
তারকারা ঋতুচক্রে স'রে গেছে, এ-সব বোঝোনি।
৬ এপ্রিল ১৯৬২

AMARBOI.COM

৫০

সন্তপ্ত কুসুম ফুটে পুনরায় ক্ষোভে ঝ'রে যায়।
দেখে কবিকুল এত ক্লেশ পায়, অথচ হে তরু,
তুমি নিজে নির্বিকার, এই প্রিয় বেদনা বোঝো না।

কে কোথায় নিভে গেছে তার গুপ্ত কাহিনী জানি না।
নিজের অন্তর দেখি, কবিতার কোনো পঙ্ক্তি আর
মনে নেই গোধূলিতে ; ভালোবাসা অবশিষ্ট নেই।
অথবা গৃহের থেকে ভুলে বহির্গত কোনো শিশু
হারিয়ে গিয়েছে পথে, জানে না সে নিজের ঠিকানা।
৮ এপ্রিল ১৯৬২

৫১

কোনো স্থির কেন্দ্র নেই, ক্ষণিক চিত্রের মোহে দুলি।
ভিন্ন-ভিন্ন সুশীতল স্বাস্থ্যনিবাসের স্বপ্নরূপ
ইতস্তত আকর্ষণে ভ'রে রাখে শূন্য মন, সাধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরূপ পিঙ্গল তৃষ্ণা, অবসর এসেছে এবার।
অপূর্ণের ক্লেশ এই, যে-শাখাগ্রে ফাল্গুনে আমের
বোল মুকুলিত হয়, সে-শাখায় নতুন পাতার
উদ্গমের পথ নেই; কোথায় সে মুকুলিত প্রেম?
অথচ হৃদয় ছিন্ন, উৎপাটিত কেশমালা যেন,
ছড়িয়ে গিয়েছে বহু ভবনে, উদ্যানে, নানা ক্ষণে।
এত জন্ম, হায় প্রেম, নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন আজ।
১১ এপ্রিল ১৯৬২

৫২

কোনো সফলতা নয় ; আকাশের কৃপাপ্রার্থী তরু,
সুপ্ত সরোবরে স্নান করায় অক্ষম ব'লে ; এত—
এত অসহায় আমি, মানবিক শক্তিহীন, তবু
নিমন্ত্রণ পত্র পাই, প্রেরিকার ঠিকানাবিহীন।
এত নিরুপায় আমি; বিষণ্ন বাতাস দিয়ে ঢাকি
অন্যের অপ্রেম, ক্ষুধা, দস্যুবৃত্তি, পরিচিত কাঁটা।
অব্যর্থ পাখির কাছে যতোই কালাতিপাত করি
আমাকে চেনে না তবু, পরিচয় সূচিত হলো না।
কোনোদিন পাবো না তো, সেতুর উপর দিয়ে দ্রুত
ট্রেনের ধ্বনির মতো সুগম্ভীর জীবন পাবো না।
১১ এপ্রিল ১৯৬২

AMARBOI.COM

৫৩

ব্যর্থতার সীমা আছে ; নিরাশ্রয় রক্তাপ্লুত হাতে
বলো, আর কতকাল পাথরে আঘাত ক'রে যাবো?
এখনো ভাঙেনি কেউ ; ফুরিয়েছে পাথেয় সম্বল।
অথবা বিলীয়মান শবকে জাগাতে কোনো শিশু
সেই সন্ধ্যাকাল থেকে সচেষ্ট রয়েছে, তবু যেন
পৃথিবী নিয়মবশে নির্বিকার ধূসরতাধৃত।
উষ্ণ, ক্ষিপ্ত বাতাসেরা, মেদুর মেঘেরা চিরকাল
ঊর্ধ্বমুখী ; অবয়বে অমেয় আকাঙ্ক্ষা তুলে নিয়ে
ঘুরেছি অনেক কাল পর্বতের আশ্রয় সন্ধানে ;
পাইন অরণ্যে, শ্বেত তুষারে-তুষারে লীলায়িত
হতে চেয়ে দেখি কারো হৃদয়ে জীবন নেই ; তাই
জলের মতোন বয়ে চ'লে যাবো ক্রমশ নিচুতে।
১২ এপ্রিল ১৯৬২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৪

শিশুকাল হতে যদি মাত্রাসিদ্ধ পরম বীজাণু
মাঝে-মাঝে পাওয়া যেতো, তবে আজ বসন্তে অসুখ
এত ভয়াবহরূপে দেখা তো দিতো না, প্রিয় সখী।
আন্দোলিত প্রেমে-প্রেমে প্রাথমিক হৃদয় উন্মাদ।

ঝরে পুঁজ, ঝরে স্মৃতি, রহস্যনিলীনা অপসৃতা
কুমারীত্ব থেকে দূরে, আরো দূরে, অবরুদ্ধ নীড়ে।
আর আমি অর্ধমৃত ; বৃক্ষদের ব্যাপক অসুখে
শুশ্রূষা করার মতো অনাবিল প্রিয়জনও নেই।
১২ এপ্রিল ১৯৬২

৫৫

হৃদয়, নিঃশব্দে বাজো ; তারকা, কুসুম, অঙ্গুরীয়—
এদের কখনো আর সরব সংগীত শোনাবো না।
বধির স্বস্থানে আছে ; অথবা নিজের রূপে ভুলে
প্রেমিকের তৃষ্ণা দ্যাখে, পৃথিবীর বিপণিতে থেকে।

কবিতা লিখেছি কবে, দু-জনে চকিত চেতনায়।
অবশেষে ফুল ঝ'রে, অশ্রু ঝ'রে আছে শুধু সুর।
কবিতা বা গান ... ভাবি, পাখিরা—কোকিল গান গায়
নিজের নিষ্কৃতি পেয়ে, পৃথিবীর কথা সে ভাবে না।
১২ এপ্রিল ১৯৬২

৫৬

বড়ো বৃদ্ধ হয়ে গেছি, চোখের ক্ষমতা ক'মে গেছে
পরস্পর মিশে থাকা কাচপুঁতি এবং নীলার
পার্থক্য নির্ণয় করা এখন সম্ভব নয় আর।
এমন কি কাগজের নৌকা নির্মাণের পদ্ধতিও
ভুলে গেছি ; কবিতার মিল খুঁজে মন্থর প্রহর
চ'লে যায় ; সন্ধ্যাকালে শুনেছি শীতের পুরোভাগে
মৃত্তিকাসংলগ্ন মেঘ এখনো কুয়াশারাশি ব'লে
অভিহিত হয়—এই কুৎসাভীত বহু ভালোবাসা।
অভিজ্ঞতা ফুরিয়েছে ; অন্ধকারে আহার্যবিহীন
ক্ষুধায় অতিবাহিত করা ভিন্ন বৃক্ষদের কোনো
গত্যন্তর নেই, হায়, এই ক্লেশে ম্রিয়মাণ আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেঁটেছি সুদীর্ঘ পথ ; শুধু কাঁটা, রক্তাক্ত দু-পায়
তোমার দুয়ারে এসে অনিশ্চিত, নির্বাক, চিন্তিত।
তুমি কি আমাকে বক্ষে স্থান দিতে সক্ষম, মুকুর?
১৫ এপ্রিল ১৯৬২

৫৭

কোনো যোগাযোগ নেই, সেতু নেই, পরিচয় নেই ;
তবুও গোপন ঘর নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়েছে—
এই ভেবে যদি খুঁজি, তবে বলো, এ-কল্পনা কালো।
আঁধারে সকলই সখা, কালো ব'লে প্রতিভাত হয়।
তর্কের সময় নয় ; বিপুল বিপদাপন্ন ক্ষুধা।
প্রাণে জ্যোৎস্নালেপনের সাধ যদি না-ই হয়, তবে
ছিদ্র দিয়ে ডেকে নিয়ে কেন সে যে খোলে না দরজা।
আহার করার আগে স্নান করা তারই রীতি, প্রেম।
১৫ এপ্রিল ১৯৬২

৫৮

বাতাস আমার কাছে আবেগের মথিত প্রতীক,
জ্যোৎস্না মানে হৃদয়ের দ্যুতি, প্রেম ; মেঘ—শরীরের
কামনার বাষ্পপুঞ্জ ; মুকুর, আকাশ, সরোবর,
সাগর, কুসুম, তারা, অঙ্গুরীয়—এ-সকল তুমি।
তোমাকে সর্বত্র দেখি ; প্রাকৃতিক সকল কিছুই
টীকা ও টিপ্পনী মাত্র, পরিচিত গভীর গ্রন্থের।
অথচ তুমি কি, নারী, বেজে ওঠো কোনো অবকাশে?
এতটা বয়সে ক্ষত—ক্ষত হয়নি কি কোনোকালে?

তৃপ্ত অবস্থা তো নেই, সমুদ্রের আবশ্যক জল
যতো পান করা হয়, তৃষ্ণা ততো বৃদ্ধি পেতে থাকে।
বৃষ্টির পরেও ফের বাতাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
প্রেম, রাত্রি পরিপূর্ণ অতৃপ্তির ক্ষণিক ক্ষান্তিতে।
সেহেতু তুমি তো, নারী, বেজে ওঠো শ্বেত অবকাশে ;
এতটা বয়সে ক্ষত—ক্ষত হয়নি কি কোনোকালে?
১৭ এপ্রিল ১৯৬২

৫৯

আমার বাতাস বয় ; সদ্যোজাত মরুভূমি থেকে
কেবলই বালুকা ওড়ে ; অবাঞ্ছিত পিপাসা বাড়ায়।
তাঁবু নিয়ে ফিরে আসি বন্দরের পরিশ্রান্ত ভিড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী আশ্চর্য, খুশি হয় কুকুর, উদ্যান, রাজপথ।
শুনেছি সভার মাঝে একটি কুসুম ঘ্রাণময়ী ;
ব্যথিত আগ্রহে দেখি ; এত ফুল, কোনটি বুঝি না।
যে-কোনো অপাপবিদ্ধ তারকারো জ্যোৎস্না আছে ভেবে
কারো কাছে যেতে চাও, হে চকোর, স্বপ্নচারী, বৃথা।
দু-পাশের অভ্যর্থনাকারীদের মাঝ দিয়ে হেঁটে
বিদেশী ব্যক্তির মতো কে জানে কোথায় যেতে হবে।
১৭ এপ্রিল ১৯৬২

৬০

ঈপ্সিত শিক্ষায়তনে যাবার বাসনা হয়েছিলো।
গিয়ে দেখি ত্রস্ত মুখ, উপলক্ষ সমুদ্র উধাও।
ভ্রমর পোষে না কেউ ; নবতর হাসির মাধ্যম
সেখানে সুলভ নয় ; কাঁটাগাছ পূর্বেই প্রস্তুত।

কিছু আলোকিত হলো সমাচ্ছন্ন বাঁশ, ভবিষ্যৎ।
এখন সমস্যা এই, কোনো করবীর সঙ্গে আর
খেলার সময় কিংবা বিশ্বস্ত সুযোগ কোনোদিন
ভুলেও দেবে না কেউ ; বাকি আছে শুধু ক্ষুণ্ণ ক্রয়।
১৮ এপ্রিল ১৯৬২

AMARBOI.COM

৬১

এমন বিপন্ন আমি, ব্যক্তিগত পবিত্রতাহীন।
যেখানে-সেখানে মুগ্ধ মলত্যাগে অথবা অসীমে
প্রস্রাব করার কালে শিশুর গোপন কিছু নেই।
ফলে পিপীলিকাশ্রেণী, কুসুমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

নিয়ন্ত্রিত, ক্ষুব্ধ আমি ; যে-সুবিধা তোমরা পেয়েছো
তার দুষ্ট ব্যবহার, মুহুর্মুহু কাদা, ইতিহাস—
এ-সবে বিধ্বস্ত আজ ; এত সম্ভাবনাময় দ্যুতি,
সবই ব্যর্থ ; শুধু আশা, কোনোদিন জীর্ণ বৃদ্ধ হবো।
মৃত্তিকায় প'ড়ে রবে বয়োস্তীর্ণ, রসহীন বীজ,
উৎসুক হবে না কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবতার শবে।
২৩ এপ্রিল ১৯৬২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬২

সহাস্য গুলিটি মনে বিদ্ধ হয়ে বহুকাল ছিলো
সনাতন মূল কেটে, ভিক্ষা ক'রে সুস্থ হতে হয়।
ফলে এই স্পৃহাহীন, ক্ষমায় বিশীর্ণ ঋতু আসে।
অসীম শিল্পীর হাতে বৃক্ষ শেষে হয়েছে টিপয়।
পাখিকে ডাকি না তবু, আহার্য ছড়িয়ে কাছে পেতে।
নতুন মদের পাত্র নির্বাচন এখন স্থগিত।

জরায়ু ত্যাগের পরে বিস্তীর্ণ আলোকে এসে শিশু
সৃষ্টির সদর্থ বোঝে, নিজস্ব পিপাসা, ক্ষুধা পায়।
অন্ধকার সীমা ছেড়ে চেয়ে দ্যাখে, আরো পরিসীমা
আকাশের নীলে, চাঁদে, নক্ষত্রের আহ্বানে নিহিত।
২৪ এপ্রিল ১৯৬২

৬৩

কবে যেন একবার বিদ্ধ হয়ে বালুকাবেলায়
সাগরের সাহচর্য পেয়েছিলো অলৌকিক পাখি।
উদ্যত সংগীতে কবে ভরেছিলো হর্ম্যতল, তবু
পেরেক বিফল হলো গহ্বরের উদ্ধার পেলো না।
মাথা কুটে, ছিঁড়ে-খুঁড়ে, ঘুড়ির মতোন ত্রস্ত হয়ে
দ্যাখে, পৃথিবীর শিক্ষা ধারণার ক্রমসংশোধনে।
যেন শিশু বায়ুলোকে নির্ভয়ে বিহার ক'রে শেষে
পথে প'ড়ে ধ্বংস হয়। তেতলার থেকে পতনের
অন্তিম, অজ্ঞাতপূর্ব মর্ম বোঝে শবের জীবনে।
২৮ এপ্রিল ১৯৬২

৬৪

এরূপ বিরহ ভালো; কবিতার প্রথম পাঠের
পরবর্তী কাল যদি নিদ্রিতের মতো থাকা যায়,
স্বপ্নাচ্ছন্ন, কাল্পনিক; দীর্ঘকাল পরে পুনরায়
পাঠের সময়ে যদি শাশ্বত ফুলের মতো স্মিত,
রূপ, ঘ্রাণ ঝ'রে পড়ে তাহলে সার্থক সব ব্যথা,
সকল বিরহ, স্বপ্ন ; মদিরার বুদ্বুদের মতো
মৃদু শব্দে সমাচ্ছন্ন, কবিতা, তোমার অপ্রণয়।

হাসির মতোন তুমি মিলিয়ে গিয়েছো সিন্ধুপারে।
এখন অপেক্ষা করি, বালিকাকে বিদায় দেবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহু পরে পুনরায় দর্শনের অপেক্ষার মতো—
হয়তো সর্বস্ব তার ভ'রে গেছে চমকে-চমকে
অভিভূত প্রত্যাশায় এরূপ বিরহব্যথা ভালো।
৯ মে ১৯৬২

৬৫

ভালোবাসা দিতে পারি, তোমার কি গ্রহণে সক্ষম?
লীলাময়ী করপুটে তোমাদের সবই ঝ'রে যায়—
হাসি, জ্যোৎস্না, ব্যথা, স্মৃতি, অবশিষ্ট কিছুই থাকে না।
এ আমার অভিজ্ঞতা। পারাবতগুলি জ্যোৎস্নায়
কখনো ওড়ে না ; তবু ভালোবাসা দিতে পারি আমি।
শাশ্বত, সহজতম এই দান—শুধু অঙ্কুরের
উদ্গমে বাধা না দেওয়া, নিষ্পেষিত অনালোকে রেখে
ফ্যাকাশে হলুদবর্ণ না-ক'রে শ্যামল হতে দেওয়া।
এতই সহজ, তবু বেদনায় নিজ হাতে রাখি
মৃত্যুর প্রস্তর, যাতে কাউকে না ভালোবেসে ফেলি।
গ্রহণে সক্ষম নও। পারাবত, বৃক্ষচূড়া থেকে
পতন হলেও তুমি আঘাত পাও না, উড়ে যাবে।
প্রাচীন চিত্রের মতো চিরস্থায়ী হাসি নিয়ে তুমি
চ'লে যাবে; ক্ষত নিয়ে যন্ত্রণায় স্তব্ধ হবে আমি।
১৮ মে ১৯৬২

AMARBOI.COM

৬৬

নানা কুন্তলের ঘ্রাণ ভেসে আসে চারিদিক থেকে।
হৃদয় উতলা হয়, ফুটন্ত জলের মতো মোহে।
অনেকেই ছুঁয়ে গেছে, ঘুম ভেঙে গেছে বারবার।
ত্রুটিপূর্ণ মুকুরের মতো তারা আমাকে প্রায়শ
বিকৃত করেছে; হায়, পিপীলিকাশ্রেণীতে একাকী
কীটের মতোন আমি অনেক হেঁটেছি অন্ধকারে।
তোমাকে তো ঈর্ষা করি ; হে পাবক, তুমি সব কিছু
গ্রাস ক'রে নিতে পারো—তোমার বাঞ্ছিত যুবকের
জীবন, মরণ, মন ; কখনোই প্রেমে ব্যর্থ নও।
আর আমি বারংবার অসফল, ক্ষমতাবিহীন।
প্রায়শ নিষ্ক্রিয় থাকি, প্রত্যাশায় দ্যুতিময় মনে,
অপরের অভ্যন্তরে ক্ষুধার মতোন সংগোপন
দুর্বোধ্য সমস্যাগুলি নিবেদিত হবে—এই ভেবে।
কিছুই বলে না কেউ; হে পাবক, তুমি বিশ্বজয়ী।
২১ মে ১৯৬২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৭

করুণ চিলের মতো সারাদিন, সারাদিন ঘুরি।
ব্যথিত সময় যায়, শরীরের আর্তনাদে, যায়
জ্যোৎস্নার অনুনয় ; হায়, এই আহার্যসন্ধান।
অপরের প্রেমিকার মতোন সুদূর নীহারিকা,
গাঢ় নির্নিমেষ চাঁদ, আমাদের আবশ্যক সুখ।
এতকাল চ'লে গেলো, এতকাল শুধু আয়োজনে।
সকলেই সচেতন হতে চায় পরিসরে, ক্ষুধার মতোন
নিরন্তর উত্তেজনা নাড়িতে-নাড়িতে পেতে চায়।
হস্তগত আহার্যের গূঢ় ঘ্রাণ, স্বাদ ভালোবেসে
বিহ্বল মুহূর্তগুলি যেন কোনো অর্ঘ্যে দিতে চায়।
অথচ চিলের মতো আয়োজনে আয়ু শেষ হয়।
ব্যর্থ অনাশ্রয় কেউ চাই না ; তোমাকে পেতে চাই
তবু আশ্রয়েরও আগে, পরিহিত অবস্থায় কোনো
অঙ্গুরীয় হারানোর ক্ষিপ্ত ভয় লোপ পায় ব'লে।
২৩ মে ১৯৬২

৬৮

যখন কিছু না থাকে, কিছুই নিমেষলভ্য নয়,
তখনো কেবলমাত্র বিরহ সহজে পেতে পারি।
তাকেই সম্বল ক'রে বুঝি এই মহাশূন্য শুধু
স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোৎস্নায় পরিপূর্ণ, মুগ্ধ হতে পারে।
ফলে গবেষণা করি ; পর্বতে, ব-দ্বীপে যেতে চাই;
চোখ বুজে হাস্যহীন দেহ তুলে দিতেও গিয়েছি
ব-দ্বীপের অন্ধকার হ্রদের গভীরে একবার।
অবশ্য পাখির মতো জলভ্রমে তেলের সকাশে
গিয়ে ফের ফিরে আসি ; ফলে শুধু তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়।
এরূপ সম্ভার আছে; কতিপয় কুসুমের মুখ
আহত করেছে দীর্ঘ রজনীগন্ধার মতো রূপে।
তবুও গভীর কেন্দ্রে কেবলই চেতনা ব'লে যায়—
এই সব নাতি-উষ্ণ ক্রীড়া ফেলে শিশুর মতোন
ছুটে যাবো যদি শুনি, মিষ্টদ্রব্য স্বগৃহে ফিরেছে।
২৪ মে ১৯৬২

৬৯

তোমাদের কাছে আছে সংগোপন, আশ্চর্য ব-দ্বীপ,
কৃষ্ণবর্ণ অরণ্যের অন্তরালে ঘ্রাণময় হ্রদে
আমার হৃদয় স্বপ্নে মুগ্ধ হয়, একা স্নান করে।
হে শান্তি, অমেয় তৃপ্তি, তুমি দীপ্ত হার্দিক প্রেমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূলে আছো, আছো ফলে ; মধ্যবর্তী অবকাশে প্রাণ
তবুও সকল কিছু সংযমে নিক্ষেপ করে দূরে;
ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তিজাত আসক্তিকে চিরন্তন মোহে
রূপ দিতে বর্ণ, গন্ধ খুঁজে ফেরে, বায়ব আকাশ,
খুঁজে ফেরে চন্দ্রাতপ; যেন সরোবরে মুগ্ধ তাপ—
জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত হলে তবে তার স্নান গ্রহণীয়।
এসো হে ব-দ্বীপ, এসো তমোরস, এসো জ্বালা, প্রেম,
আলোড়ন, ঝঞ্ঝা, লোভ, সংযত সংহারমালা, এসো।
নিয়ে যাও মূলে, রসে, বাষ্পীভূত ক'রে মেলে দাও
আয়ুষ্কালব্যাপী নভে, আবিষ্কৃত আকাশের স্বাদে।
৭ জুন ১৯৬২

৭০

আমার আশ্চর্য ফুল, যেন চকোলেট, নিমেষেই
গলাধঃকরণ তাকে না-ক'রে ক্রমশ রস নিয়ে
তৃপ্ত হই, দীর্ঘ তৃষ্ণা ভুলে থাকি আবিষ্কারে, প্রেমে।
অনেক ভেবেছি আমি, অনেক ছোবল নিয়ে প্রাণে
জেনেছি বিদীর্ণ হওয়া কাকে বলে, কাকে বলে নীল—
আকাশের, হৃদয়ের; কাকে বলে নির্বিকার পাখি।
অথবা ফড়িং তার স্বচ্ছ ডানা মেলে উড়ে যায়।
উড়ে যায় শ্বাস ফেলে যুবকের প্রাণের উপরে।
আমি রোগে মুগ্ধ হয়ে দৃশ্য দেখি, দেখি জানালায়
আকাশের লালা ঝরে বাতাসের আশ্রয়ে-আশ্রয়ে।
আমি মুগ্ধ, উড়ে গেছো; ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা,
রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।
আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো, অবয়বহীন
সুর হয়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে।
৭ জুন ১৯৬২

৭১

খেতে দেবে অন্ধকারে—সকলের এই অভিলাষ।
কে জানে কী ফল কিংবা মিষ্টদ্রব্য কোনো—
বয়স্কা, অনূঢ়া, স্ফীত ; কিন্তু হায়, আমার রসনা
ভালোবাসে পূর্বাহ্নেই রূপে, ঘ্রাণে রসাপ্লুত হতে।
হয়েছিলো কোনোকালে একবার হীরকের চোখে
নিজেকে বিম্বিত দেখে; তারপর আর কেন আরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্বৃত্ত ফুলের প্রতি তাকাবো উদ্যত বাসনায়?
কেন, মনোলীনা, কেন বলো চাকা, কী হেতু তাকাবো?
যতো বলি, অন্ধকার, আমার তারকা আছে, ততো
দেখি, আকাশের প্রতি পাখিটির ভালোবাসা কারো
শ্রদ্ধায় স্বীকৃত নয়; অশিক্ষিত গর্তরাশি আসে
মনে হয়, জ্যোৎস্না নয়, অন্ধকারে বৃষ্টিপাত চায়।
এ-সকল ক্ষোভ বুঝে চতুর্দিকে হেসে ওঠে বহু
গহ্বর, বৃদ্ধার মতো বালকের রূপকথা শুনে।
২২ জুন ১৯৬২

৭২

চিৎকার আহ্বান নয়, গান গেয়ে ঘুম ভাঙালেও
অনেকে বিরক্ত হয়; শঙ্খমালা, তুমি কি হয়েছো?
আজ তা-ই মনে হয়; তবু তুমি পৃথিবীতে আছো।
অমোঘ শিকারীদের লক্ষ্যভেদে সফলতা তবে
কোনো মুগ্ধ নিয়মের বশবর্তী নয়; যেন বাঘ
লাফ দিলে কুমারীটি স'রে গেছে লক্ষ্যবিন্দু থেকে।
তোমার হৃদয়ে দিতে রোমাঞ্চিত সংক্রামক ব্যাধি
বীজাণু বহন করি ; তুমি থাকো দূরে সিন্ধুপারে;
ফলে নিজে পূর্বাহ্নেই আরো বেশি বিষণ্ণিমা পাই।
হৃদয় যদি না থাকে, তবু অন্য ঐশ্বর্য রয়েছে—
শুদামে তো বিস্ফোরণ হতে পারে, সেও ভালোবাসা।
যা-ই হোক, শঙ্খমালা, তোমাকে সর্বস্ব দিয়ে চাই,
যে-কোনো কারণে খোলো, তা-ই হবে মহত্তম প্রেম।
২২ জুন ১৯৬২

৭৩

যাক, তবে জ'লে যাক, জলস্তম্ভ, ছেঁড়া ঘা হৃদয়।
সব শান্তি দূরে থাক, সব তৃপ্তি, সব ভুলে যাই।
শুধু তার যন্ত্রণায় ভ'রে থাক হৃদয় শরীর।
তার তরণীর মতো দীর্ঘ চোখে ছিলো সাগরের
গভীর আহ্বান, ছায়া, মেঘ, ঝঞ্ঝা, আকাশ, বাতাস।
কাঁটার আঘাতদায়ী কুসুমের স্মৃতির মতোন
দীর্ঘস্থায়ী তার চিন্তা ; প্রথম মিলনকালে ছেঁড়া
ত্বকের জ্বালার মতো গোপন, মধুর এ-বেদনা।
যাক, সব জ্ব'লে যাক, জলস্তম্ভ, ছেঁড়া ঘা হৃদয়।
২২ জুন ১৯৬২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৪

করবী তরুতে সেই আকাঙ্ক্ষিত গোলাপ ফোটেনি।
এই শোকে ক্ষিপ্ত আমি; নাকি ভ্রান্তি হয়েছে কোথাও?
অবশ্য অপর কেউ, মনে হয়, মুগ্ধ হয়েছিলো,
সন্ধানপর্বেও দীর্ঘ, নির্নিমেষ জ্যোৎস্না দিয়ে গেছে।
আমার নিদ্রার মাঝে, স্তন্যপান করার মতোন
ব্যবহার করে ব'লে শিহরিত হৃদয়ে জেগেছি।
হায় রে, বাসি না ভালো, তবু এও ধন্য সার্থকতা,
এই অভাবিত শান্তি, মূল্যায়ন, ক্ষিপ্ত শোকে ছায়া।
তা না-হলে আস্বাদিত না-হবার বেদনায় মদ,
হৃদয় উন্মাদ হয়, মাংসে করে আশ্রয়-সন্ধান।
অথচ সুদূর এক নারী শুধু মাংসভোজনের
লোভে কারো কাছে তার চিরন্তন দ্বার খুলেছিলো,
যথাকালে লবণের বিস্বাদ অভাবে ক্লিষ্ট সেও।
এই পরিণাম কেউ চাই না, হে মুগ্ধ প্রীতিধারা,
গলিত আগ্রহে তাই লবণ অর্থাৎ জ্যোৎস্নাকামী।
২৭ জুন ১৯৬২

৭৫

কবিতা বুঝিনি আমি ; অন্ধকারে একটি জোনাকি
যৎসামান্য আলো দেয়, নিরুত্তাপ, কোমল আলোক।
এই অন্ধকারে এই দৃষ্টিগম্য আকাশের পারে
অধিক নীলাভ সেই প্রকৃত আকাশ প'ড়ে আছে—
এই বোধ সুগভীরে কখন আকৃষ্ট ক'রে নিয়ে
যুগ যুগ আমাদের অগ্রসর হয়ে যেতে বলে,
তারকা, জোনাকি—সব ; লম্বিত গভীর হয়ে গেলে
না-দেখা গহ্বর যেন অন্ধকার হৃদয় অবধি
পথ ক'রে দিতে পারে ; প্রচেষ্টায় প্রচেষ্টায় ; যেন
অমল আয়ত্তাধীন অবশেষে ক'রে দিতে পারে
অধরা জ্যোৎস্নাকে ; তাকে উদগ্রীব মুষ্টিতে ধ'রে নিয়ে
বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশের, অনন্তের সার পেতে পারি।
এই অজ্ঞানতা এই কবিতায়, রক্তে মিশে আছে
মৃদু লবণের মতো, প্রশান্তির আহ্বানের মতো।
২৯ জুন ১৯৬২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৬

আঘাত দেবে তো দাও। আর নেই মৃত স্মৃতিরাশি।
অনেক মদিরা পান করেছি, হে আঁখি, ওষ্ঠ চাকা।
রক্তের ভিতরে জ্যোৎস্না ; তবু বুঝি, আজ পরিশেষে
মাংসভোজনের উষ্ণ প্রয়োজন ; তা না-হলে নেই
মদিরার পূর্ণ তৃপ্তি ; তোমার দেহের কথা ভাবি—
নির্বিকার কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে অন্ধকার, সুখ
এমন আশ্চর্যভাবে মিশে আছে ; পৃথিবীতে বহু
গান গাওয়া শেষ হলো, সুর শুনে, ব্যথা পেয়ে আজ
রন্ধনকালীন শব্দ ভালোবেসে, কানে কানে মৃদু
অর্ধস্ফুট কথা চেয়ে, এসেছি তোমার দ্বারে, চাকা।
মুগ্ধ মিলনের কালে সজোরে আঘাতে সম্ভাবিত
ব্যথা থেকে মাংসরাশি, নিতম্বই রক্ষা ক'রে থাকে।
২৯ জুন ১৯৬২

৭৭

তুমি যেন ফিরে এসে পুনরায় কুণ্ঠিত শিশুকে
করাঘাত ক'রে ক'রে ঘুম পাড়াবার সাধ ক'রে
আড়ালে যেও না ; আমি এতদিনে চিনেছি কেবল
অপার ক্ষমতাময়ী হাত দুটি, ক্ষিপ্র হাত দুটি—
ক্ষণিক নিস্তারলাভে একা একা ব্যর্থ বারিপাত।
কবিতা সমাপ্ত হতে দেবে নাকি? সার্থক চক্রের
আশায় শেষের পঙ্‌ক্তি ভেবে ভেবে নিদ্রা চ'লে গেছে।
কেবলি কবোষ্ণ চিন্তা, রস এসে চাপ দিতে থাকে ;
তারা যেন কুসুমের অভ্যন্তরে মধুর ঈর্ষিত
স্থান চায়, মালিকায় গাঁথা হয়ে ঘ্রাণ দিতে চায়।
কবিতা সমাপ্ত হতে দাও, নারি, ক্রমে—ক্রমাগত
ছন্দিত, ঘর্ষণে, দ্যাখো, উত্তেজনা শীর্ষলাভ করে,
আমাদের চিন্তাপাত, রসপাত ঘটে, শান্তি নামে।
আড়ালে যেও না যেন, ঘুম পাড়াবার সাধ ক'রে।
২৯ জুন ১৯৬২

□

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ ধি ক ন্তু

১

একটি নক্ষত্র এলো, সৎসাহসের মতো আজ তাকে পেলে—
যা-ই লিপিবদ্ধ করি উভয়ে এককভাবে ব্যক্তিগতভাবে
তা-ই আক্ষরিক অর্থে সুনির্দিষ্ট কর্তব্যের ভারপ্রাপ্ত দেবী
অথবা দেবতা হয়ে তৎক্ষণাৎ জন্মলাভ করে—এই আলো
এত সময়োপযোগী আলোকনে ব'লে যায়, আরো চিরকাল
ব'লে যাবে, হে ঈশ্বরী, নক্ষত্রের ব্যবহার জানা থাকা ভালো,
কেবল চিন্তায় তুষ্ট না-হলে লিখনে প্রাপ্ত অমোঘ দেবতা
একাই ব্যর্থতাহীন কার্যোদ্ধারে চিরকাল স্মিত সহায়তা।
২৩.২.১৯৬৫

২

চিন্তাক্ষমদের মনে চিন্তাগুলি আবির্ভূত হয়
শব্দ বা বাক্যাংশ কিম্বা বাক্যের আকারে, প্রিয়তমা।
চিন্তার মাধ্যম নয়, ভাষা হলো চিন্তাই স্বয়ং।
সব শব্দ, শব্দাবলী চিন্তাংশের মতো মনে হয়,
অর্থাৎ চিন্তারও স্ফুট অবয়ব আছে, কান্তি আছে।
অবয়ব মুক্ত হলে সরল শূণ্যতা প'ড়ে থাকে,
নিশ্চিন্ততা প'ড়ে থাকে—অবয়ব অস্বীকার ক'রে,
ঈশ্বরী, যেমন পাই আগুনের পরিবর্তে অগ্নিহীনতাকে।
২৯.৪.১৯৬৫

৩

সকালবেলায় পাখি আপন নীড়ের থেকে দূরে—
উড়ে যায় চ'লে যায়, আবার বিকালবেলা হলে
ফিরে আসে, ফিরে আসে আপনার পথ চিনে চিনে।
এই পথ চেনা যেন আলোকের মতো এসে লাগে—
পাখিদের গতি এসে চিন্তাকে প্রকাশ ক'রে দেয়।
নির্দিষ্ট পথের মতো, নির্ভুল পথের মতো মনে
নির্দিষ্ট চিন্তাও যেন, নির্ভুল চিন্তাও যেন আছে—
যেমন বস্তুর গতি প্রকাশিত করে তার গতিসূত্রটিকে।
গতি দেখে, গতিবিধি দেখে তাই চিন্তার প্রকার বোঝা যায়,
ভাষা-জ্ঞান পরিমাপ করাও সম্ভব হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখিদের মতো হয়ে দেবদেবীদের মতো হয়ে,
ঈশ্বরী, সময় যায় ব্যবহার্য চিন্তা আবিষ্কারে—
দুজনের গতি আর অন্যের গতির সব সূত্র আবিষ্কারে।
২৯.৪.১৯৬৫

৪

প্রকৃষ্ট সময় ব্যয় করার পূর্বাহ্নে সে-সময়
আয় ক'রে নিতে হয়—নানারূপ আয় ও ব্যয়ের
হিসাবের মতো এই সত্যটিও আজ মনে আসে।
ঈশ্বরী ও আমি শুধু—শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তি বলে
যে-কোনো দেবতা কিম্বা দেবীর অস্তিত্ব লোপ ক'রে দিতে পারি
অর্থাৎ প্রভাতবেলা চিন্তনীয়তায় সুস্থ হলো;
অনাবিল সুস্থতায় ভ'রে যায়, ভ'রে যাবে বিশ্ব, প্রিয়তমা,
কে কবে সূর্যের গায়ে কর্দম লেপনে সুসফল?
২৯.৪.১৯৬৫

৫

ঈশ্বরী কেবলমাত্র আমি শুদ্ধ আত্মা অবস্থায়
যা-ই ভাবি তা-ই সব মুহূর্তেই বিশ্বের সকলে
বিশ্বের সকল কিছু জেনে ফেলে, জানাবার মতো
আশ্চর্য ব্যবস্থাময় জ্যোতিবিকিরণকারিতায়
আমার মস্তিষ্ক থেকে জড় ও অজড়ে চ'লে যায়
আমার সকল চিন্তা যেন কোনো আলো—জ্যোতি হয়
অতি জ্যোতি আছে ব'লে, প্রিয়তমা চিরকাল এ-প্রকার বয়।
২.৫.১৯৬৫

৬

আমার ও ঈশ্বরীর প্রায়াবচেতনা আর অতিচেতনার
ক্ষণিক চিন্তার ফলে, দীর্ঘস্থায়ী কামনার ফলে উভয়েই
বস্তুকে বিলীন হতে এবং বস্তুকে জাত—আবির্ভূত হতে
দেখেছি অনেকবার, আরো চিরকাল এই দেখার প্রত্যাশা—
সত্য ও সুন্দর সাধ মনে নিয়ে আমাদের মনের আলোকে
সচেতন চিন্তা থেকে উভয়ের সচেতন কামনা থেকেও
যেন ভবিষ্যতে বস্তু জন্ম পায়, এবং বিলয়প্রাপ্ত হয়
যেন মহিমার মতো ঈশ্বরী ও ঈশ্বররের ঐশ্বর্যের মতো হয়ে রয়।
২.৫.১৯৬৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

আমাদের দু'জনের দৈনন্দিন চিন্তাগুলি চিন্তাধারাগুলি
তৎকাল পার হয়ে কমবেশি পাঁচ বৎসর পরেকার
ঘটনাবলীর রূপ, প্রকৃতি ও গতিধারা নির্ধারিত করে।
এই আবিষ্কৃত সত্য—সুবিধা ও অসুবিধা—চিন্তানিয়ন্ত্রণকারিতার
বলে, সকলের আর নিজেদেরও ভবিষ্যৎ চিরকাল আমরাই সৃষ্টি ক'রে থাকি।
আমরা দুজনে মিলে আলিঙ্গনে এক হয়ে যেন একজন হয়ে আশ্চর্য একাকী।
২.৫.১৯৬৫

৮

কোনো ঘটনার কিম্বা ব্যাপারের আগে আর পরে
দুটি সত্য অতিশয় গুরুতর রূপে প্রতিষ্ঠিত
ক'রেই অর্থাৎ দুটি অর্ডিনেট নিয়ে সে-দুটির
মানের বৃদ্ধিকে স্পষ্ট সুনির্দিষ্ট ক'রে রেখে দিই।
ফলে সেই দ্বিপার্শ্বিক সত্যদের মধ্যবর্তী কাল
কখনো গভীর হয়ে ডেলটাটি-র অঙ্গীকারে হাসে;
আরো কাল বয়ে যায়, (সেই কাল আমি নিজে নাকি?)
বয়ে যায়, বয়ে যায়, কখনো সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়
মধ্যবর্তী পরিসর, কখনো বিলুপ্ত-প্রায় হয়
মধ্যবর্তী ঘটনাটি—এভাবে শূন্যের দিকে সেই
ডেলটাটি-র মান যায়, কোনো এক ফলের সাহসে
পরিস্ফুট হয়ে ওঠে অন্য কিছু, অন্য কোনো কিছু
সত্য ও ঘটনা থেকে ব্যবহার্য যথাযথতায়
বহির্গত হয়ে শেষে সব পবিত্রের দিকে উড়ে উড়ে যায়।
৩.৫.১৯৬৫

৯

সমীকরণের মতো উপস্থিত শর্তাবলী
পৃথকতা থেকে এসে একীভূত হবার নিয়মে
কিছু পরিবর্তীদের বহিষ্কারে শেষে নিয়ে আসে
সম্ভব স্বাধীনতার রূপতল, আকার, প্রকৃতি—
হয়তো এরূপ শর্তহীনতার মতো হাসে
প্রচুর তারকা প্রীতি, প্রেমপ্রীতি সার্থক আকাশে।
৪.৫.১৯৬৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০

কালের পশ্চাদপটে সদাসমপরিবর্তী কোনো
মানের, পরিমাণের স্বভাব ও স্বভাবে নিহিত
নিয়ম ও নিয়মের সূত্রগুলি সত্য থাকে সব
অসম পরিবর্তনে, সকল প্রয়োজনীয়দের
সীমাহীন পরিমাণে ক্ষুদ্র ক'রে নিলে তবে থাকে।
অর্থাৎ সরলভাবে একের অনন্তকালীনতা
অন্যের স্বভাবক্ষেত্রে মুহূর্ত মূল্যের অনুরূপ।
গতির নিয়মে এই অন্তর্নিহিততা সত্য হয়ে
রয়েছে সকল ক্ষেত্রে বস্তুলোকে ; মনোগতিলোকে
অমূল্য আলোর মতো নিখিলের অন্তর্দ্রষ্টা।
৪.৫.১৯৬৫

১১

মস্তিষ্কে নিহিত সব ধারণাকে যূথবদ্ধ রূপে
ভিন্ন ভিন্ন বারমেকানিজমের মতো ক'রে ভাবা শ্রেয়তর
যাতে বস্তুজগতের বারমেকানিজমের মতোন নিয়মে
ধারণার গতিবিধি, নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সহজে,
অত্যন্ত নির্ভুল ভাবে বোঝা যায়। চিন্তাজগতের
সর্ববিধ জটিলতা সরল সহজবোধ্য হয়ে গিয়ে ঈশ্বরীর কাছে
অলস কালোপযোগী ক্রীড়ার বিষয় হয়ে থেমে
ব'লে যায় আমাদের উজ্জ্বলতা চিরায়ত প্রেমে,
আমাদের চিরায়ত প্রেমের ঐশ্বর্য পেয়ে আর সবই ভুলে যেতে পারি
ঈশ্বর নারীও নিজে—বাচনক্ষমতাবতী সুপ্রত্যক্ষা নারী।

১২

সকল কবিতা আজ নিপুণিকা প্রেমিকার মতো
স্মিত হাসি হেসে আছে চতুরিকা তারকার মতো
এ-সব ভাবনা তবে ফুল নয়, বিকশিত কুসুমের মতো নয় এসব ভাবনা,
কুসুমের কোরকের মতোন প্রকৃতপক্ষে কুসুমের কোরকের মতো
এ-সকল কোরকের প্রকৃত স্বরূপগুলি স্ফুট হয়ে পরিস্ফুট হয়ে
কখনো দ্বিতীয় স্তরে—উন্নত, সম্পূর্ণ স্তরে উপস্থিত হয়
তখন কুসুম ফোটে— দেখেছি গণিতশাস্ত্র এই।
গণিতে নির্দিষ্ট সেই মাধ্যমিক পরিবর্তী ব্যবহারকরণের একটি পদ্ধতি ভিন্ন
অন্য কোনো পদ্ধতিই নেই।
দেখেছি কবিতাগুলি বিকশিত হয়ে বিশুদ্ধ গণিত হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩

আমাদের গতিবিধি উন্মোচনে অবশেষে বোধ্য হয়ে গেছে
নয়নতারার মতো ফুটে আছে পরম্পরাক্রম নিয়ে সব
নয়নতারার মতো ফুটে আছে যে কোনো ব্যাপার, দৈনন্দিন
যে-কোনো ঘটনা তার পরবর্তী ব্যাপার, বা ঘটনার এক
মুকুর-বিম্বের মতো মনে হয় সর্বক্ষেত্রে হয়
ত্রিগুণে বিশ্লিষ্ট হলে ইনটারপোলেশন সিরিজের মতো
টার্মের পরেই টার্ম হয়ে যেন এ-সকল ঘ'টে যায় ঘ'টেই চলেছে
সবার অলক্ষ্যে রেখে অন্তরের নিহিত ত্রিগুণ—
গতি ও প্রগতি দেখে নয়নতারার মতো ফুটে আছি আমি।

১৪

পৃথিবীর মানুষের জন্মমরণের রীতি, নীতি ও নিয়ম
বিদ্যাভ্যাস, খ্যাতিলাভ যেন সব উত্তরাধিকার—
অতিশয় পরিস্ফুট উত্তরাধিকার হয়ে আসে
তাদের পিতার থেকে জননীর কাছ থেকে পাওয়া
গুণের মতোনই আসে বিদ্যাভ্যাস, খ্যাতিলাভ, প্রতিপত্তিলাভ
জনকজননী নয়, প্রত্যেকের দেশবাসী পূর্বসূরীদের থেকে আসে
উত্তরাধিকার হয়ে হয় কোনো গাণিতিক নয় কোনো ঐশ্বরিক সুস্ফুট নিয়মে
এ-সকল ঘটে সব পূর্বসূরী এবং উত্তরসূরীদের
নামধাম মোটামুটি সমধর্মী, সমশ্রেণী রেখে।

AMARBOI.COM

১৫

যে-কোনো মস্তিষ্কে কিম্বা চিন্তাকরণের স্থানে উপস্থিত কোনো
ধারণাকে (যাকে এক 'বার'-এর মতোন ক'রে ভাবা সমুচিত)
কখনো অপসরিত অথবা পরিবর্তিত করাই সম্ভব নয়, ফলে
যদি কোনো ধারণাকে বাতিল বা পরিত্যাগ করানোর প্রয়োজন হয়
তবে সেই পুরাতন ধারণার পাশাপাশি আরো কিছু নূতন ধারণা
যুক্ত ক'রে দিতে হয় ; সেই সব নবলব্ধ ধরণাসমূহ
নিজেদের উপস্থিতি দিয়ে সেই অবাঞ্ছিত পুরাতন ধারণাকে শুধু
সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়রূপে, স্মৃতিরূপে ফেলে রাখে। শুধুমাত্র এ-পদ্ধতিতে কারো মতিগতি
সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করা সুসম্ভব হয়। কারো চিন্তাকরণের স্থানে
নূতন নূতন সব ধারণা অব্যর্থরূপে, উদ্দেশ্যসাধকরূপে প্রবেশ করাতে হলে শুধু—
শুধুমাত্র গাণিতিক স্থান কাল আর পাত্র ভিত্তিক পদ্ধতি ভিন্ন অন্যবিধ সব
পদ্ধতিই কাল্পনিক, ভ্রান্ত এই মর্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠা করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬

আমরা সকলে দ্যাখো, যে-কোনো বিন্দুতে যেতে পারি
যে-কোনো বিন্দুতে গিয়ে মানে ব্যোমে, মানে আর কালে তার
শুধুমাত্র স্থিতিটুকু, উপস্থিতিটুকু বুঝে নিই, বুঝে নিতে পারি।
এবং যখন তার সঞ্চালন—গতি বা প্রগতি
ইত্যাদির গুণাগুণ, বিশেষত্ব, নিয়মাবলীকে
বুঝে নিতে যেতে চাই তখন সে-বিন্দু থেকে স'রে যেতে হয়,
বিন্দু থেকে স'রে যাই সীমাহীন পরিমাণে ক্ষুদ্র কোনো দূরত্বে কোথাও
ঘুরি ফিরি, ঘুরি ফিরি, বিন্দুর সহিত যেতে যেতে
ঘুরি ফিরি, ঘুরি ফিরি, পেয়ে যাই বিন্দুদের—আমাদের জটিল জীবন—
জীবনের অধিকাংশ, অধিকাংশ—এই সত্য ঈশ্বরীকে অর্থাৎ নিজেকে
আজ চুপি-চুপি বলি।

১৭

এই যে জীবন জানি জীবনের অনেকাংশ, অধিকাংশ জানি
এতে কোনো ভ্রান্তি নেই—ভ্রান্তি আছে ব'লে অবিরত
যেই ভ্রান্তি হতে থাকে তা কখনো ঈশ্বরের মতো হয়ে যায়—
দশমিক পরবর্তী শূন্যের প্রবাহ হয়ে মহাশূন্য ভ'রে ফেলে ক্রমে
হৃদয় একাগ্র হয়, নিষ্পলক নেত্র হয় গভীর নিয়মে।

১৮

বলা যায়, কোনোদিন কারো বিরুদ্ধেই, কারো সঠিক প্রয়োজনের বিরুদ্ধে কিছুই
করিনি বা বলিনি, সকলের প্রত্যেকের যথাসাময়িক প্রয়োজন
পূরণ করেছি, করি নানা বিষয়ের ক্ষেত্রে এক সঙ্গে ক'রে থাকি, আর
এ-সব সম্পর্ক দিয়ে গঠিত রূপরেখাকে—সমগ্রকে পাই
নিজের পছন্দ মতো, প্রয়োজন মতো পাই ব'লে
কে এক পরম যেন সমগ্র এবং শুধু স্পর্শকের আবাসিক অন্যান্য সকলে!

১৯

যখনি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধন করা প্রয়োজন হয়
তখনি দেখেছি সেই বাঞ্ছার বিন্দুর থেকে সিদ্ধির বিন্দুতে
কামনার, প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে বিনা কাল ব্যয়ে
কোনোদিন উত্তরণ সম্ভব হয়নি কেন যেন।
ফলে সেই দূরত্বকে—বাঞ্ছা থেকে সিদ্ধির দূরত্বটুকুকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভেঙে বিভাজিত ক'রে নিতে হয়।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাধ্যমিক সিদ্ধি পেয়ে সমাকলনের ফলে বাঞ্ছিত সিদ্ধিতে চ'লে যাই,
অধিক সময় লাগে, এই ভাবে চ'লে যায় জীবন সময়।

২০

দেখা গেছে, চতুষ্পার্শে দূরে কাছে সবার সহিত
ব্যবহার করা যেন অসম্ভব প্রয়াসের মতো চিন্তনীয়;
মতের ভিন্নতা এতো, এমন অসূয়া হিংসা, ফলে
সকল জীবিত সত্তা, জীব প্রাণী—সকল প্রাণীকে
জড় বস্তুরূপে যদি ভাবা যায়, জড় বস্তুদের
সহিত যেমন করি সেইভাবে ব্যবহার করা যদি যায়
কোনোরূপ অনুরোধ, আলোচনা, বিতর্ক না-ক'রে
শুধুমাত্র গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে ক'রে
কার্যসিদ্ধি করা যায় চিত্তাক্ষম সব জড়বস্তুর ভিতরে।

২১

সম্পূর্ণ অযুক্তিবাদী কোনো কারো সঙ্গে কোনো ব্যাপার, বিষয়
নিয়ে অতি—অতিশয় নির্ভুল যুক্তিসঙ্গত পবিত্র প্রস্তাব করা হলে
প্রায়শই সে-ব্যক্তির অসম্মতি দেখা যায়। এমতাবস্থায়
কার্যসিদ্ধিকরণের অত্যন্ত নিশ্চিত, কিন্তু সময় সাপেক্ষ আর সৎ
কেবল একটি মাত্র পদ্ধতি রয়েছে, আছে—সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত পথে
যেমন পরম্পরায় কার্যাবলী তার সঙ্গে করবার প্রয়োজন ছিলো
ঠিক তার বিপরীত পরম্পরাক্রমে যদি শেষ থেকে প্রারম্ভের দিকে
কার্যাবলী করা যায় তবেই নিশ্চিতরূপে কার্যোদ্ধার হয়ে গিয়ে থাকে।

২২ (ক)

মর্ত্যলোকে বাসকালে এ-বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হয়েছি—
অধিকাংশ কার্য আমি কী-এক অদ্ভুত রূপে সম্পাদন করি
অতিচেতনার দ্বারা হয়তো বা যাতে এই ঐশ্বরীক কার্যাবলী প্রায়
করি ব'লে বুঝিই না, করার সময় প্রায় বুঝি না যে করি।
অথচ সজ্ঞানকার্য এবং অজ্ঞানকার্য এ-দুয়ের যোগাযোগ বোঝা
মোটেই দুরূহ নয়—সহজেই লক্ষ্য করা যায়
এ-সকল কার্য আমি নিজেই করেছি, করি কী-এক অদ্ভুতরূপে যেন,
যেন অতিচেতনার অস্তিত্বের ফলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(খ)

যে-কোনো অনবহিত বিষয়ে জানতে হলে, বিষয়ে ভাবতে হলে, দেখি,
অতি স্বতস্ফূর্তভাবে যা আমার মনে হয়—সে-বিষয়ে মনে হয় তা-ই
প্রায়শ নির্ভুল ব'লে প্রতিপন্ন হয়;
অথচ সর্বদা সবই নির্ভুল হওয়ার কথা, সখি।

(গ)

এমতাবস্থায় আমি ঈশ্বরীকে প্রশ্ন করি জ্ঞাতব্য বিষয়ে
আলোকপাতের জন্য, ভ্রান্তিহীনতমরূপে জানবার জন্য প্রশ্ন করি
এবং প্রত্যেকবার অন্তরযামিনী দেবী কেশে ওঠে, সাড়া দিয়ে ওঠে
অর্থাৎ নিজেই আমি কেশে উঠি, প্রশ্নের উত্তর সত্য হলে
একবার কেশে উঠি, ভুল হলে দুইবার—এই পদ্ধতিতে
যে-সব সংবাদ পাই সেইগুলি সর্বদাই যথাযথতম।
কায়াহীন হয়ে তবে অনুরূপ অস্তিত্বের প্রণয়ের আশ্বাস রয়েছে
অনুরূপ ব্যবস্থার স্বস্তিময় আনন্দ রয়েছে।

২৩

কোনোরূপ শর্তহীন আয়াসপ্রয়োগ প্রয়োজনীয়তাহীন
খুশি—নির্তান্তই খুশি—স্রেফ খুশি—চিন্তাকার, বাগাকার খুশি
সময়ের সঙ্গে এক সম্পর্ক বা সম্বন্ধে জড়িত হয়ে গিয়ে
বিজড়িততার সব স্বভাবসিদ্ধিতামহ গুণাগুণসহ
অত্যন্ত নির্দিষ্ট ভাবে অত্যন্ত নির্দিষ্ট পথে (রূপচিত্র দ্যাখো)*
সহজ বাস্তব হয়—স্বাভাবিক, দীর্ঘস্থায়ী, প্রত্যক্ষ বাস্তব হয়ে যায়
(ক্ষেত্রবোধে নিসর্গের প্রচলিত যে-কোনো নিয়ম
অবলুপ্ত ক'রে তার ক্রমশ স্থলাভিষিক্ত নূতন নিয়ম রূপে এসে,)
আমাকে আবার নেয় অমিত আভার থেকে অমিতাভতায়।

২৪

ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের,
দৃষ্টিশক্তি বহির্ভূত দেবলোকসম্পর্কিত সুপ্রাচীন হিন্দুদের রচনাবলীই
এক মাত্র যথাযথ ব'লে
প্রমাণিত হয়ে গেছে, সর্বাংশেই যথাযথ ব'লে ধ'রে নিলে
অতঃপর পৃথিবীতে ঘটমান সকল—প্রতিটি
প্রাকৃতিক ঘটনা, ব্যাপার

*'অধিকন্তু'র প্রথম সংস্করণে এই কবিতাটির সঙ্গে মুদ্রিত রেখাচিত্রটি অত্যন্ত অস্পষ্ট হওয়ার জন্য সেটি এখানে পুনর্মুদ্রিত করা গেলো না।—সম্পাদক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর অধিবাসীদের প্রত্যেকের জন্মমৃত্যু, প্রতিটি বচন, চিন্তা, গতি,
প্রতি গতিবিধি
কাজকর্ম, সর্ববিধ সৃষ্টিকর্ম, রচনা প্রকৃতপক্ষে আমার একার
স্বীয় কাজকর্ম ও বচন—
তাদের মাধ্যমে কৃত, অতিচেতনার দ্বারা কৃত
আমার একারই স্বীয় চিন্তা, কর্ম, বচন, রচনাবলী ব'লে
দেবলোকে আমি সেই চন্দ্রচূড় শিব—মহাদেব
যিনি নিজে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের একক দেবতা।

□

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঘ্রানের অনুভূতিমালা

১

সেতু চুপে শুয়ে আছে, সেতু শুয়ে আছে তার ছায়ায় উপরে।
ছায়া কেঁপে-কেঁপে ওঠে থেকে থেকে জয়ী-হওয়া সেতুর বাতাসে।
সকল সেতুর মতো এখানেও এই প্রান্তে কুসুম ফুটেছে;
সুন্দর সুঘ্রাণ ফুল, ও-প্রান্তেও কুসুমের ঘ্রাণ ভেসে যায়।
ঘ্রাণ পাই, কুসুমের চারিপাশে পরিচিত পরাগকেশর ;
যেন অন্য কোনো দেশ, অন্য কোনো মহাকাশ ফুটে আছে যেন।
এইখানে থেমে যেতে, নেমে যেতে রসে-ভেজা অনুনয় ক'রে
থেমে গিয়ে নেমে পড়ি, নাকি নেমে থেমে যাই আমি নিমেষেই
সকল আকাশ ছেড়ে কুসুমের বিভাজিত স্বকীয় আকাশে,
জলপাই ফল এই সার্থকতা পেয়ে হাসে, মৃদু-মৃদু হাসে।
মনে হয়, ভয় হয়, এ-সময়ে ছায়াটি যে ভেঙে যেতে পারে
এ-রকম ঢেউয়ে-ঢেউয়ে, তরঙ্গের এ-রকম আঘাতে-আঘাতে।
কাঁপার অধিকে গিয়ে এমন প্রবলভাবে নেচে যায় ছায়া
কুসুম, কুসুম, তুমি কোন মায়া জানো বলো, এ কেমন মায়া।
নিসর্গের এই সত্যে অবশেষে একরাশি রস, আস্থা আসে
আমার নিকট থেকে নেমে যায়, জ'মে যায় ফুলের আকাশে।
হে কেশর, হে পরাগ, আমাদের চারিপাশে পরিকীর্ণ এই
বাস্তবের মতো হয়ে, বাস্তব বিশ্বের মতো হয়ে আমাদের
মানসনেত্রের এক বিশ্ব আছে, মানসের বিশ্বও বাস্তব।
সকল মানসী তাই নির্ভুল অস্তিত্বময়ী, নিস্পন্দ ছায়ারই
এপাশেই একাকার জলপাই ও ফুলের মিশে যাওয়া বারি।
আঁধারে অধিকতর ভারি হয়ে আসে ঘ্রাণ শ্লথ হয়ে আসে,
উত্থান এলিয়ে পড়ে, মহাকাশ বুজে যায়, রাতের বাতাসে।
যত বেশি স্পষ্ট ক'রে মানসনেত্রের মাঝে কল্পনাকে দেখি
ঠিক ততো স্পষ্ট এক বাস্তব প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি হয়ে থাকে।
মানসনেত্রের দেখা দৃশ্যই এ-বাস্তবের দৃশ্যাবলী হয়,
সেই হেতু এ-অঘ্রান আমাদের জননের প্রকৃষ্ট সময়।
মানসসুন্দরীগুলি এ-প্রকারে সুখ পায়, ব্যথা পেতে পারে;
সেতুটিকে বুকে নিয়ে কী আনন্দে জয়ী-হওয়া ছাড়া প'ড়ে আছে।
এভাবে সময় যায় ; কেন যেন ফুল ফের অবাক হয়েছে,
এত বেশি অবাক যে হঠাৎ হাঁ হয়ে যায়, হাঁ ক'রে তাকায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাপড়িরা ফুলে ওঠে, দুলে ওঠে এলোমেলো পরাগকেশর।
এইসব অতি সত্য, বাকি সব শুধু সত্য মিথ্যা শুধু আমি।
সেতুর প্রত্যন্তে একা টুপিটি মাথার থেকে কখন খুলেছি।
নিচু হয়ে এইবার ফুলের ভিতরটিকে ধীরে-ধীরে দেখি।
ফুলের জড়িমা তবে এইবার ঝেড়ে ফেলা শ্রেয়তর হবে,
এখনই আরেকবার আসল জাগার মতো জেগে ওঠা ভালো,
মুখ ধুয়ে নেওয়া ভালো, সজীবতা পেতে হলে মুখ ধুতে হয়।
হঠাৎ অদৃশ্য হই, কেন যেন সুবাতাস হতে হয়, হই ;
হতবাক ফুল তার মুখ দিয়ে টেনে নেওয়া নিশ্বাসের সাথে
নিজের ভিতরে টানে আমাকেই সে নিজের মাঝে পুরে নেয়।
সকল শরীর তার প্রতি অংশ দিয়ে ভাবে, ভাবনা ছড়ায়
মাথায় মোটেই নয়, মাথা বাদ দিয়ে বাকি অবয়বময়।
কী ভেবে সে হেসে ফ্যালে, সব ভুলে এইবার ফুল হেসে ফ্যালে।
দেহসঞ্চালন হলো ভাবসঞ্চালনমাত্র, অন্য-কিছু নয়।
এই যে ফুলের হাসি, চাপা শব্দময় হাসি, প্যাচপেচে হাসি,
হাসির গমকে তার ফুলে-ওঠা পাপড়িরা প্রায় ফেটে যায়,
নেচে যায় ; নেচে যায়, বিহ্বলের মতো নেচে যায়
চাঁদের আলোর নিচে ; সেতুর চেয়েও বেশি, ছায়ার চেয়েও
অনেক অনেক বেশি অনুভূতিময়ী ফুল, পাতার চেয়েও।
এবার সকল-কিছু সহজ, তরল হলো, জল হয়ে গেছে।
এই রাতে পরিবেশে ফুল সবচেয়ে বেশি স্পর্শসচেতন।
সেতুর নিচের এই কুসুমটি তাই বেশি—সবচেয়ে বেশি
ভাবার ক্ষমতা রাখে, সবচেয়ে চিন্তাশীলা অবয়ব হবে।
তাহলে, ও ফুল, এত—এত হাসি কী-রকম ভাব—
কোন চিন্তা, ফুল, কোনো সুউচ্চ মার্গের চিন্তা ব'লে মনে হয়,
অতিশয় উঁচু কোনো শৌখিন সৌন্দর্যচিন্তা রূপ হয়ে নাচে।
এই নাচ, একটানা গমকে-গমকে ঠাশা, ঠাশাঠাশি হাসি,
কেশরের ওড়াওড়ি, তেলের খনির নিচে ভালোবাসাবাসি।
বাতাস কমেছে বহু, কুসুমের শব্দময় হাসি থেমে গেছে,
মনে হয় ক'মে গেছে গালের লালিমা, তার মৃদু লাল রঙ
কোরক গিয়েছে ভিজে, সকল কোরক ভেজা প্রচুর শিশিরে ;
চুপি-চুপি ঝ'রে যাবে, মনে হয় ফোঁটা-ফোঁটা বেয়ে প'ড়ে যাবে
জোছনায় দেখা যাবে—জোছনায় দেখা যায় বিশাল পাতায়—
সোনার বলের মতো পাতার গা বেয়ে-বেয়ে চলেছে শিশির,
এবং সকলে দ্যাখে, এ-সকল দেখে নেয়, দেখে নিতে থাকে
চুপে জলপাই গাছ, ঝুঁকে প'ড়ে একেবারে নরম শিথিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবয়বে তার সব চিন্তা যেন অবশেষে শান্ত হয়ে গেছে,
ভাবনার শেষ হয়ে পরিশিষ্টটুকু আরো বেশি মনোরম
ব'লে মনে হতে থাকে ফুলের উপরে এই জলপাই গাছ
তার অতিভাবনায় ঘ্রাণে-ঘ্রাণে, জোছনায় বুঁদ হয়ে আছে।
সব-কিছু পেকে যায়, পেকে যায় এই সেতু, সুবাতাস, ফুল,
কেশর, পরাগ, জোছনা ; চুপচাপ পেকে যায় জলপাইগুলি
এবং কোমল হয়, পেকে গিয়ে সব-কিছু কী-রকম নরম হয়েছে,
নরম হয়েছে আলো, ছায়া, পাতা, নিশ্চিন্ততা বিষয়ক কিছু
শেষ চিন্তা কী নরম, এ-সকল সব-কিছু একসাথে মিলে
স্মৃতিফলকের মতো হয়ে রবে বাকি রাত, রাতের বাকিটা
স্মৃতিভবনের মতো পরিচ্ছন্ন হয়ে রবে সব গোপনতা।
মনে হয়, সবচেয়ে বেশি চিন্তাশীল এক অবয়ব ব'লে
খুব বেশি পরিমাণে চিন্তা ক'রে দেয় ব'লে সমগ্র চিন্তার
প্রায় সবই একা-একা যৌনাঙ্গই ক'রে দেয়, ক'রে দিয়ে থাকে—
সকল চিন্তাই তার একক একাধিপত্যে অবাক করেছে।
যে-কোনো কাহিনী তাই শুধুমাত্র যৌনাঙ্গের আত্মকাহিনীই,
যে-কোনো চিন্তাই তাই এই চিন্তাকারীটির একক জীবনী
হয়ে যায়, হতে হয় তথাকথনের দোষে যাকে তুমি বলো
অবচেতনার রূপ ; সব চুপ, চুপচাপ, ঘুমিয়ে পড়েছে
কেশর, পরাগ, ফুল, পাতা, জলপাই গাছ, জোছনা, ছায়া, সেতু।
জীবনে অত্যন্ত কম সহযোগিতাই এরা সকলে করেছে,
পরস্পর অতি অল্প সহযোগিতার এরা সুযোগ পেয়েছে,
তবুও সহযোগিতা জীবনে কোথাও যদি নাও থাকে তবে
সকলের যার-যার আপনার স্বার্থ আছে, স্বার্থরক্ষা আছে,
সহযোগিতার মতো অংশভাগী স্বার্থরক্ষা রয়েছে জীবনে।
যার-যার আপনার স্বার্থরক্ষা পরস্পর ভাগাভাগি ক'রে
কী সুন্দর এ-নিসর্গ, মিলে-মিশে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়েছে
কেশর, পরাগ, ফুল, পাতা, জলপাই গাছ, জোছনা, ছায়া, সেতু।
মাথার শিশির মুছে হেলে-দুলে ফিরে আসি বাড়ির পিছনে।
ঢিপি থেকে বেশ দূরে কবেকার ছোটো এক শুকোনো পুকুর।
খড়ের মতোন রঙ, বাদামি রঙের মতো ছিলো ঢিপি দুটি।
এখন আঁধার এসে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে তাদের এ-রঙ।
লতাপাতা ঝোপে-ঝাড়ে—বলা যায়, আগাছাতে শুকোনো পুকুর
প্রায় ঢেকে প'ড়ে আছে, চোখে প'ড়ে না-গেলেও আমি তাকে চিনি,
মনে হয় অন্ধকারে চোখ খুলে সবচেয়ে ভালোভাবে দেখি।
পুকুরের পাড়ে কবে গজিয়েছে চুপচাপ তেঁতুলের গাছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটো থেকে এত বড়ো হতে তার লেগে গেলো পনেরো বছর—
—বলেছিলো চাপা স্বরে টিপির ওপাশ থেকে বড়ো গাঁদা ফুল।
আমি বলি, না তো, ভুল, লেগেছিলো বড়ো জোর দু-তিন মিনিট।
কোনো কথা-কাটাকাটি করার মতোন নয়, এমনি বলেছি।
শুনে ফুল আর কিছু বলেনি আমাকে চুপে তাকিয়ে রয়েছে,
মনে হয়, ব্যথা পেয়ে, মনমরা হয়ে গিয়ে চুপ হয়ে গেছে।
টিপির উপরে উঠে কিছুটা সময় পেতে চাই হয়তো বা,
এখানে আমার কোন প্রয়োজন স্থির হয়ে আছে বুঝে নিতে।
এতটা নরম টিপি—হাজারবারের মতো এবারেও এই
ফের মনে হতে থাকে টিপিগুলি খুব বেশি-রকম নরম।
চারিপাশে কালো-কালো বহু লতা, বহু লতা, ছড়িয়ে রয়েছে—
এলিয়ে রয়েছে সব এলোমেলো, গাঁদাফুল গাছের কাছেই
ফুটেছে নয়নতারা, আগে থেকে জানি ব'লে নাম জানা আছে,
কোথায় রয়েছে তাও জানি, তা না-হলে এই রাতের আঁধারে
দেখা ভার, নেই ব'লে মনে হয়, তবু ঠিক ফুটে প'ড়ে আছে।
এইসব ভালো লাগে নরম-নরম ফুল, লতা, টিপি, পাতা,
নরম-নরম গাছ, নরম পুকুরপাড়ে মানুকচু গাছে
বিশাল নরম পাতা দু-হাতে বোলালে খুব শিরশির করে—
হাত শিরশির করে, বিশাল পাতাও নাকি শিরশির করে ;
এখানে সকলে কত—কতবার এই কথা আমাকে বলেছে,
এমনিতে বলেছিলো খুব বেশি কথা সুখ পেয়েছিলো ব'লে।
কখন আঁধার এসে এ-সকল এক ক'রে জড়িয়ে ধরেছে,
সব-কিছু একই ছিলো, না-হলে ধরার পরে সকলে কী ক'রে
একজন হতে পারে, আঁধার এবং আর-একজন হয়?
এখানে খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধা, কলসির মতো বড়ো হাঁড়ি।
গাছের মাথার শাদা, ঘিয়ের মতোন রঙ মাথা থেকে চুয়ে
ফোঁটা-ফোঁটা রস ঝরে, ফোঁটা-ফোঁটা রস ঝরে হাঁড়ির ভিতরে।
দুটি মানকচু পাতা কেঁপে ওঠে, দুলে যায় রাতের বাতাসে
রাতভর দুলে যাবে ব'লে মনে হতে থাকে, চুপিসাড়ে দুলে
সকালে শিশিরে ভিজে চুপিসাড়ে থেমে যাবে, রাতের শিশির
কচুর পাতার গায়ে ফোঁট-ফোঁটা হয়ে রবে, লেপটে যাবে না।
এখন আঁধার এই সবকিছু এক ক'রে জড়িয়ে রয়েছে,
কেবল আঁধার জানে এক কাকে বলে আর বহু বলে কাকে।
এ-সকল গাছপালা, লতা, পাতা ক্রমে-ক্রমে বড়ো হয়ে ওঠে,
সব এক হয়ে গিয়ে একটি প্রকৃতি ক্রমে বেশ ফুলে ওঠে;
আঁধার রয়েছে ব'লে এ-রকম হতে থাকে সকল-কিছুতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতের বেলায় সব বেশি-বেশি ক'রে বাড়ে, বড়ো হতে থাকে
আলো খুঁজে পেতে গিয়ে, আলো ভালোবাসে ব'লে সবই কী-রকম
তাড়াতাড়ি ক'রে বাড়ে, প্রায় সব ফুলই তাই রাতে ফুটে থাকে।
দিনের বেলাও এরা কিছু বাড়ে, স্বভাবত কিছু বেড়ে থাকে।
তবে সবচেয়ে বেশি—সবচেয়ে বেশি বাড়ে রাতের আঁধারে,
আঁধারের নিচে শুয়ে আলো খুঁজে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে
যে-সব জিনিশ শুধু সেইগুলি যত খুশি আলো দিতে পারে—
এ-রকম ভেবে যেতে কেন যেন আমাদের বড়ো ভালো লাগে।
ভালো লাগে ব'লে কিছু উপকার হয়ে যায়, নাকি বিপরীতে
উপকার হয় ব'লে ভালো লাগে—এ-সকল আজ জানা যায়।
আজ রাতে জানা যায়, এমন চরমতম ভালো লাগবার
সময়ে জানার কথা, আসলে ও-দুটি একই, একই ব্যাপারের
দুটি নাম, দেহ আর মন এক বস্তু ব'লে বড়ো ভালো লাগে
শরীরেরই কোনো-কিছু—উপকার ব'লে মনে প্রতিভাত হয়।
যেমন সুস্বাদ এসে আমাদের ব'লে দেয় উপকারিতার
তালিকায় পরপর কোন-কোন, কী-কী সব জিনিশ রয়েছে;
ভালো স্বাদ সে-সবের উপকারিতার সোজা পরিমাণ ব'লে
স্বাদ আর উপকার পৃথক করার কোনো উপায় জানি না,
স্বাদ আর উপকার দুটি এক ব্যাপারের দুটি নাম শুধু।
আঁধারের নিচে শুয়ে আরো আলো খুঁজে যেতে এত ভালো লাগে;
ভালো লাগা যেন আলো, সেই হেতু আজ রাতে আলো পেতে থাকে
আঁধারে জড়ানো থেকে গাঁদা ফুল, টিপি দুটি, মানকচু পাতা,
খেজুর গাছেই গাঁথা হাঁড়ি আর হাঁড়িটির তৃষিত শরীর।
এরা সবচেয়ে বেশি—সবচেয়ে বেশি বাড়ে রাতের আঁধারে,
আঁধার রয়েছে ব'লে সকল-কিছুতে আজও বেড়ে যাওয়া আছে—
এগিয়ে চলার দিকে অতিশয় মনোযোগ দেওয়া রয়ে গেছে।
হঠাৎ বাতাস আসে, দমকায় কেঁপে ওঠে এই কচুপাতা,
টিপি, ফুল, এলোমেলো কালো-কালো লতাগুলি, খেজুরের গাছ ;
সব জোর দুলে ওঠে, তারপর কেন যেন আবার হঠাৎ
সব-কিছু থেমে যায়, থেমে যায় চারিদিকে সকল বাতাস,
সব-কিছু চুপচাপ নীরব, নিথর হয়ে শেষে হেসে ফ্যালে—
এই হলো ভোরবেলা, আসল সকালবেলা, যদিও আঁধার।
এরা পরে মিশে যায় নয়নতারার সাথে আকাশের তারা,
গাঁদা ফুলগুলি থেকে মধু যেন ধ্বনিময় কথা হয়ে ওঠে,
কথা ব'লে যেতে থাকে, নানাকথা বলে যায় আঁধারের সাথে।
বহু রস ঝ'রে গেছে খেজুরের গাছে ওই হাঁড়িটিতে, বহু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রস শুষে ভিজে গেছে হাঁড়ির দেয়ালগুলি, মানকচু পাতা
দোলা বন্ধ ক'রে রেখে চুপচাপ কিছু বেশি দুষ্টু হয়ে গেছে।
সকল-কিছুরই কিছু আলো আছে, কম-কম সকলেরই আছে,
না-হলে উত্তপ্ত হলে সকল-কিছুর থেকে আলো বেরোতো না।
কালো-কালো সব-কিছু ভোরবেলা দেখা দেবে যার-যার আপনার রঙে।

২

ক্রিসেনথেমাম ফুল—ফুলে-ফুলে একাকার ভোরের কেয়ারি;
একটি নিটোল গোল পরিধিতে প'ড়ে আছে শীতের রোদ্দুরে।
জন্মমরণের কথা ভুলে গিয়ে আদরের কথা ভুলে গিয়ে
এর পাশে ব'সে পড়ি, অনেক রকম সব রঙের নিকটে।
কাছ থেকে দেখি ব'লে এতটা নিকট থেকে দেখি ব'লে এত—
এত ফুল দেখা যায়, আলাদা-আলাদা ভাবে কোষ মনে হয়।
মনে হয় ফুলগুলি কেবল একটিমাত্র কেয়ারির কোষ,
কাছ থেকে দেখি ব'লে অকারণে এত ফুল ব'লে মনে হয়।
দ্বাদশীর জোছনায় একা-একা—একা-একা গতকাল রাতে
যখন সারস হয়ে ফুলের কেয়ারিটির উপরে উড়েছি,
উড়েছি অনেকক্ষণ তখন আসলে এর মানে বোঝা গেছে—
তখন দেখেছি এক হলুদ রঙের গোল চাঁদের মতোন।
আবার যখন আজ একক সারস হয়ে একা উড়ে যাবো
পরিষ্কার জোছনায় কেয়ারির উপরেই ডানা ঝাপটাবো
অনেক সময় ধ'রে তখন এ-কেয়ারিকে মনে হবে এক
হলুদ রঙের বাটি—রঙের বাটির মতো, আমার চেয়েও
বহু বেশি একা-একা হলুদ রঙের বাটি, রঙে ভরা বাটি।
তখন আসলে ফের পরিষ্কার জোছনায় মানে বোঝা যাবে।
মানে বুঝে নিতে হলে তাই ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে নিতে হয়,
একাকী সারস হয়ে গোপনে-গোপনে চুপে অঘ্রানের রাতে।
এখন এখানে ব'সে কেয়ারির পাশে ব'সে মৃদু-মৃদু হাসি ;
ভাবি, মনে-মনে ভাবি, ক্রিসেনথেমাম ফুলে ঘ্রাণ প্রায় নেই ;
নেই ব'লে সুবাতাস সহজেই কেয়ারির মাঝে ঢুকে পড়ে,
ভিতরেই ঢুকে পড়ে, মাঝ দিয়ে অনায়াসে চলাচল করে।
খুব বেশি ঘ্রাণ হলে—গাঢ় ঘ্রাণময় হলে বাতাস সহজে
কেয়ারিতে ঢুকে যেতে কখনো পারে না, ঘ্রাণই বাধা দিতে থাকে,
কোনোমতে জোর ক'রে দায়সারা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না,
আমাদের বাতাসের উপায় তাকে না, তাই বাতাসের মতে,
খুব কম ঘ্রাণময় ফুলের কেয়ারিগুলি সবচেয়ে ভালো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদর্শ কেয়ারি যাতে বাতাস মনের সুখে বসবাস করে।
এখন এখানে ব'সে কেয়ারির পাশে ব'সে উঁকি মেরে দেখি
স্থান-কাল অনুসারে এ-সকল পাত্র আসে—পাত্রেরা এসেছে
স্থান-কাল অনুসারে, যেন শব্দ নিয়ে এসে সাজানো হয়েছে
যার-যার জায়গায় ব'সে গেছে সুনিয়মে পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে
নিখুঁত জ্যামিতি থেকে উঠে এসে অবশেষে ফুল ফুটে গেছে,
পায়ের নিচের জমি থেকে উঠে, উঠে এসে চোখের নিকটে,
দাঁড়ালেই দেখা যায়, ফুলগুলি ফুটে আছে মুখের নিকটে,
জমি থেকে উঠে এসে ফুলগুলি ফোটে শুধু ঠোঁটের নিকটে।
ফুলের ভিতরে কোনো জ্যামিতি বা জ্যামিতির ইশারাও নেই,
সব ফুল মিলে মিশে একাকার, এলোমেলো হয়ে প'ড়ে আছে।
জ্যামিতি জমিতে ছিলো, পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে শুধু জ্যামিতিই ছিলো।
ফুলের ভিতরে ওই জ্যামিতি বা জ্যামিতির ইশারাও নেই ;
সব ফুল মিলে মিশে একাকার, এলোমেলো হয়ে প'ড়ে আছে।
হয়তো বা ফুলও নেই, বিকশন আছে শুধু বিকশন আছে,
একটি বিরাট গোল বিকশন—কাল রাতে নিজেই এ-কথা
বুঝেছি অনেকক্ষণ, দেখেছি অনেকক্ষণ উড়ে উড়ে উড়ে।
এবং ওড়ার ফলে একটি সৌন্দর্যতত্ত্ব জানা গেছে কাল,
জোছনায় একা-একা জেনেছি যে কেয়ারির চারিপাশ ঘিরে
ঘন আর বেশ উঁচু—কোমরসমান উঁচু মাসের বাগান
ফুলের মতোনই যত্নে যত্ন ক'রে বাগান হলে খুব ভালো হয়,
তাহলে অনেক বেশি সুন্দর দেখায় আর উপভোগ্য হয়,
তাহলে বাটিটি খুব স্ফুট হয়, সহজেই চোখে প'ড়ে যায়।
যে-কোনো সময়ে কোনো একদল যুবক ও যুবতীর সাথে
ভাব থাকে, খুব বেশি অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বই হয়েছে আমার।
যেই ভাবা শুরু করি, এদের সহিত সখ্য, অন্তরঙ্গ ভাব
জীবনের শেষ দিন অবধিও রয়ে যাবে তখনই হঠাৎ
সেই পুরো দলটিই ভেঙে যায়, কে কোথায় যেন চ'লে যায়;
দেখা হলে মনে হয় সে-সকল যুবক ও যুবতীর সাথে
কোনোকালে পরস্পর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব ছিলো না,
মনে বড়ো ব্যথা লাগে, ফের সন্ধ্যা নেমে আসে, ফের আসে রাত,
এক দল গ'ড়ে ওঠে, একদল যুবক ও যুবতীর মাঝে
ভাব হয়, খুব বেশি অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বই দেখা যেতে থাকে।
যেই ভাবা শুরু করি, এদের সহিত ভাব, অন্তরঙ্গ ভাব
জীবনের শেষ দিন অবধিও রয়ে যাবে তখনই হঠাৎ
সেই পুরো দলটিই ভেঙে যায়, কে কোথায় যেন চ'লে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিবালোকে দেখা হলে মনে হয় এ-সকল যুবক-যুবতী
পরস্পর কখনোই অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে কাঁদেনি-হাসেনি
কিংবা যদি হেসে থাকে তবে কার সঙ্গে ব'সে কে যে হেসেছিলো,
কেঁদে যদি থাকে তবে কার সঙ্গে কোনজন ব'সে কেঁদেছিলো
তা বোঝা সম্ভব নয়, চোখ-মুখ দেখে এটা বোঝা অসম্ভব।
এবং আবার রাতে দল যেন আপনিই ফের হয়ে যায়,
ভোরবেলা ফের ভাঙে; তার মানে জীবনের নিয়মবিশেষ
যা কেউ বিশ্বাস ক'রে অনায়াসে মেনে নিতে কখনো পারেনি।
অথচ প্রত্যেকে এই সোজা এক নিয়মের অধীন থেকেই
সারাটা জীবন বাঁচে, সারাটা জীবন বেঁচে ম'রে শেষ হয়।
কে জানে, হয়তো এই দলগুলি কেয়ারির কুসুমের দল।
নিয়মে বিশ্বাস করা এবং না-করা কোনো—অন্য কোনো-এক
সাবলীল নিয়মের সরল বিষয়বস্তু ব'লে মনে হয়।
কেয়ারির পাতাগুলি সবুজ রঙের, গাঢ় সবুজ রঙের,
তবু তাতে রোদ লেগে ভোরবেলাকার রোদ প'ড়ে কী রকম
স্বচ্ছ ব'লে মনে হয়, প্রায় স্বচ্ছ হয়ে গেছে ব'লে মনে হয়।
রমণ না-ক'রে কোনো রমণী ও পুরুষের বন্ধুত্ব টেকে না,
খুব বেশিদিন ধ'রে তাদের বন্ধুত্বভাব কখনো টেকে না।
কেয়ারির কাছে প'ড়ে প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি কাৎ হয়ে আছে
কেয়ারির দিকে তার এক মাথা তাক ক'রে, আর-এক পাশ
ওইধারে বড়ো-বড়ো জলের জালার কাছে ; কেন ওইখানে
ওইভাবে জলভরা জালা ফেলে রেখে গেছে, কেন প'ড়ে আছে?
বাদামি রঙের গায়ে রোদ লেগে কী-রকম শুকিয়ে গিয়েছে।
এই গাছ—বৃক্ষকাণ্ড রোদে পুড়ে, জলে ভিজে—ভিজে ভিজে ভিজে
ক্ষয়ে-ক্ষয়ে চ'লে যাবে, বৃষ্টির জলের সঙ্গে যাবে হয়তো বা।
বছর-বছর ধ'রে এভাবে সারাংশটুকু উদঘাটিত হবে,
সকল অসার অংশ ঝ'রে-ঝ'রে চ'লে গিয়ে সার অংশ রবে।
এই সোজা কাজ শুধু সময়ের দ্বারা হয়, কেবল সময়
এই কাজ ক'রে দিতে পারার ক্ষমতা রাখে কেবল সময় ;
সমালোচকের দল এই কাজ একেবারে কখনো পারে না,
সমালোচকেরা শুধু সময়ের কাজটুকু দেখে নিতে পারে,
দেখে নিয়ে সে-খবর, ব'লে দেয় দিতে পারে খবর হিশাবে।
সার-অসারের কথা সেই হেতু চিরকাল সময়ের হাতে,
সেই হেতু কোনোদিন এ-কথা ফুরিয়ে গিয়ে শেষ হয় না তো।
বড়ো আকারের এক প্রজাপতি ঘুরে-ঘুরে ফুল থেকে ফুলে
চ'লে যায়, কেন যায়, মধুপের মতো ও কি মধু খায় নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোলায়েমভাবে ওড়ে, এইসব প্রজাপতি বড়ো ভালো ওড়ে,
সকালবেলার রোদে ডানার সকল রঙ চমক লাগায়;
অবয়বময় এই রঙগুলি হৃদয়ের—আসলে মনের।
ওই অত ছোটো মনে, অত ছোটো এক বুকে এতগুলি রঙ
কী যে করে সারাদিন, সারারাত কী যে ক'রে থাকে,
ফুলগুলি টের পায় পাখার বাতাস পেয়ে হয়তো বা পায়।
দিনে প্রজাপতি এই ফুলের বাগানে আসে, আসে কেয়ারিতে—
দেখেছি অনেকবার, সকলেই দেখে থাকে চিরকাল দ্যাখে
ফুল আর প্রজাপতি পাশাপাশি, মিলে-মিশে ভাব ক'রে আছে
অথচ রাতের বেলা এই প্রজাপতিটিই কোথায় ঘুমোয়,
এই কেয়ারিতেই কি, রাতেও সে থাকে নাকি কেয়ারির বনে,
ভিতরে কোথাও চুপে মাঝে-মাঝে জেগে উঠে জানা ঝাপটায়?
বাতাস একটু জোরে বয়ে যেতে শুরু করে, দুলে ওঠে ফুল,
দুলে ওঠে পাতাগুলি, তার মানে সব মিলে কেয়ারিটি দোলে—
আর ঠিক গোল হয়ে থাকে না সে, আঁকাবাঁকা গোল হয়ে যায়।
এইভাবে নড়ে যদি, এ-ভাবে যখন নড়ে তখন কেয়ারি
বেশি ক'রে চিন্তা করে—ভাবগুলি বেশি ক'রে সঞ্চালিত হয়ে
বেশি-বেশি চিন্তা হয়, ফলে বাতাসের বেগ তার ভালো লাগে।
বিশ্বের সকল সত্য—জানা বা অজানা সত্য কেবল নিজেকে
প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্ত সদা-সকল সময়
সচেষ্ট রয়েছে, থাকে, সত্যের বিরুদ্ধাচারী—বিরুদ্ধ মতের
সকলের বিপরীতে থেকে সর্বদাই সত্য যুদ্ধ ক'রে যায়
দৃশ্য বা অদৃশ্য রূপে, এর জন্য অন্য কারো সাহায্য লাগে না।
শত-শত এমনকি হাজার বছর ধ'রে-এরকম হয়—
এ-রকম যুদ্ধ হয়, কারণ বিশ্বের মাঝে অসীম নিয়মে
সত্যের প্রতিষ্ঠা কিংবা সত্যের সংগ্রাম শুধু হতে পারে, হয়,
অসত্য হবার কিংবা থাকার সুযোগময় অবকাশ নেই।
প্রজাপতিগুলি রাতে কেয়ারিতে বসবাস করে কি করে না
সে-কথা গোপন বড়ো, সকলে জানে না, তবে সকলেই জানে
বহু মশা রাতে এই কেয়ারিতে জ'মে থাকে, বসবাস করে
সকল ফুলের ফাঁকে, পাতাদের ফাঁকে-ফাঁকে চুপে ঢুকে পড়ে
তরল রসের মতো অনায়াসে ঢুকে পড়ে কুসুমের ফাঁকে—
এ-কথা আমিও জানি, জানি মশা নামধেয় জীবিত কীটের
বাসস্থান এ-সকল ফুলের কেয়ারি ; শুধু মশারাই থাকে,
শুধুমাত্র মশাদের কেয়ারিতে বসবাস করবার কথা।
অন্য সকলের শুধু এইসব দেখা, শোঁকা, আরো এ-রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য-কিছু কাজ করা, যেমন সারস হয়ে উড়ে ডানা নাড়া।
প্রিয়তার কথা যদি ওঠে তবে বলা যায়, ব'লে রাখা ভালো
স্থান, কাল, পাত্র নয় আমরা সকলে শুধু বিকশনপ্রিয়।
কেয়ারির মূলে যেই জ্যামিতি রয়েছে, যত পঙ্‌ক্তি প'ড়ে আছে
তার থেকে ক্রমে-ক্রমে নিষ্পাদনের শেষে—শেষ পাদে এসে
এ-সকল সূত্রে আসি, ফুলে এসে থেমে পড়ি মৃদু নিয়মের
মৃদুতর তাড়নায়—এইসব ফুল শুধু ব্যবহৃত হয়।
আর সব অবহেলা—সরু-সরু ঘাস, পাতা—সবই অবহেলা।
ক্রিসেনথেমাম ফুলে, কেয়ারিতে ভোরবেলা চিন্তার সময়।
এখন দাঁড়িয়ে আছি, আমার মাথাও তাই ফুলেরই মতোন
ফুটে আছে, কেয়ারির এক ধারে চুমো খাই, চুপি-চুপি বলি—
কেয়ারি, তোমার পাশে ব'সে থাকা অসম্ভব, দাঁড়াতেই হয়,
দাঁড়ালেই মনে হয় দাঁড়িয়ে থাকাও যেন অতি অসম্ভব,
হঠাৎ সারস হয়ে অঘ্রানের জোছনায় উড়ে যেতে হয়
ডানা নেড়ে ডানা নেড়ে তোমারই কোলের ঊর্ধ্বে উপরে আকাশে একা উড়ে নিতে হয়।

৩

সকল বকুল ফুল শীতকালে ফোটে, ফোটে শীতাতুর রাতে
যদিও বছরভর, আষাঢ়ে-আশ্বিনে, চৈত্রে বকুলের নাম শোনা যায়,
শুনি বকুলের খ্যাতি, বকুলের প্রিয়তার সকল কাহিনী
তবু খুব অন্তরঙ্গ মহলেই শুধুমাত্র আলোচিত হয়
তাও ঢাকাঢাকি ক'রে এ-সব নরম আর গোপন বিষয়;
অচেনা মহলে প্রায় কখনোই বকুলের নাম বা কাহিনী
তোলে না, শরমবোধে চেপে যায় যেন কেউ বকুল দ্যাখেনি ;
তবে—তবু আমি জানি সকলেই এ-সকল মনে-মনে ভাবে,
বড়ো বেশি-বেশি ক'রে মনে-মনে ভেবে থাকে সারাটা জীবন
ভেবে বেশ ভালো লাগে বকুল ফুলের রূপ এবং সুরভি।
আমাদের সব চিন্তা অদৃশ্য বাস্তব হয়ে পাশে চারিধারে
রূপায়িত হতে তাকে, হয়ে যায়, অবয়বসহ হয়ে যায়,
চলচ্চিত্রাকারে হয়, চিন্তাগুলি অবিকল এমন বাস্তব
ব'লেই হয়তো এত ভালো লাগে বকুলের বিষয়ে ভাবনা।
বকুলের আকারের বিষয়ে ভাবনা তবু বেশি ভালো লাগে
ঘ্রাণ ও রঙের চেয়ে, অন্যান্য গুণের চেয়ে ফুলের আকার
চিরকাল সকলেরই অনেক—অনেক বেশি ভালো লেগে থাকে—
মাঝখানে বড়ো এক ছিদ্রপথ, বৃত্তাকার ছিদ্রপথ ঘিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক পাপড়ি আছে, এলোমেলো সরু-সরু পাপড়ি ছড়ানো ;
এই চেহারাটি আমি স্বভাবত সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি
এ-সকল পাপড়িকে অতিশয় সাবধানে নাড়াচাড়া করি,
এখন এই তো এই বকুলবাগানে একা অঘ্রাণের রাতে
নাড়াচাড়া ক'রে দেখি, অতি সাবধানে টানি, ধীরে-ধীরে টানি
যাতে এ-সকল দল ছিঁড়ে বা উঠে না যায় ; কী-রকম লাগে,
মনে হয়, মনে পড়ে এত বড়ো বাগানের শরীরের থেকে
শুধুমাত্র ভালো-ভালো, মূল্যবান জিনিশকে বেছে-বেছে নিয়ে
যে-রকম চর্চা হয়, সৌন্দর্যচর্চার রীতি চিরকাল আছে
তার বিপরীতভাবে গদ্যময়তার থেকে বাদ দিয়ে-দিয়ে
সারহীন অঙ্গগুলি সরিয়ে-সরিয়ে রেখে, ডালপালা পাতা
একে-একে বাদ দিয়ে বাদ দিতে-দিতে শেষে যখন এমন
আর বাদ দিতে গেলে মূল কথা বাদ যায় তখন থেমেই
দেখা যায় জোছনায় ফুল ফুটে আছে, এই বকুল ফুটেছে,
দেখা যায় একা-একা অঘ্রানের জোছনায় আমি ও বকুল,
বকুলের ফাঁকটির চারধারে সরু-সরু পাপড়ি ছড়ানো,
অতি সোজা শাদা কথা যেন অবশিষ্টরূপে প'ড়ে আছে তবু—
তবু এ তো ডাল নয়, তবু এ তো পাতা নয়, এ হলো বকুল।
শতকরা একেবারে একশত ভাগ খাঁটি দৃশ্যের নাম
সংজ্ঞা অনুসারে ধর্ম, মনে হয় চারিপাশে, মহাকাশময়
অনাদি সময় থেকে, গণিতেরই মতো, বহু কবিতা রয়েছে
চুপচাপ প'ড়ে আছে কোনোদিন একে-একে আবিষ্কৃত হয়
কোনো অঘ্রানের রাতে বকুলবাগানে খুব মৃদু জোছনায়,
সুডৌল পাতার ফাঁকে গহ্বরের মতো কিংবা ছিদ্রের মতোন।
ছবি আঁকবার কালে, কোনো যুবতীর ছবি আঁকার সময়ে
তার সব প্রত্যঙ্গকে হাজির রাখাই হলো বেশি দরকারি—
সবচেয়ে দরকারি, কোনো অঙ্গ কোনোক্রমে বাদ চ'লে গেলে
অন্য অঙ্গগুলি যতো ভালোই আঁকি না কেন এই ছবি দেখে
ভয় করে, সকলেরই অতিশয় ভয়াভহ ব'লে মনে হয়।
তাই সব প্রত্যঙ্গকে হাজির রাখাই হলো বেশি দরকারি,
দরকারি বকুলের কুঁড়িগুলি শাদা-শাদা গোল-গোল কুঁড়ি—
এই কথা বকুলের কাছে আমি চোখ বুজে ব'লে ফেললাম :
বলি, ও বকুল, তুমি বোঝো নাকি কুঁড়িগুলি খুব বেশি ছোটো,
আরো ঢের বড়ো-বড়ো নরম-নরম গোল হবার কথা না?
তোমাতে আসার আগে এ-সকল কুঁড়ি ঘুরে আসার কথা তো?
এ-সকল কুঁড়ি নেড়ে টিপে-টিপে সুখ পেয়ে—পাবার পরে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনে ফুল হেসে ফ্যালে, মৃদু-মৃদু হেসে ফ্যালে, কথা সে বলে না।
হেসে ফেললেই এই ঠোঁট দুটি এত বেশি ফাঁক হয়ে যায়!
গোলটুকু এত বেশি ফাঁক হয়ে যায় কেন বকুল, বকুল,
হাসি-কান্না যা-ই হোক গোল ঠিক এক মাপে থাকার কথা না—
এই কথা আমি বলি, একটু বিস্মিত হয়ে ব'লে ফেলি আমি।
শুনে ফের হাসে ফুল, আরো বেশি হেসে ফ্যালে, কথা সে বলে না।
মনমরা হয়ে ভাবি, বকুল শীতের রাতে ফুটে থাকে, ফোটে
নিজের ঘ্রাণের মাঝে নিজেকে আড়াল ক'রে গরম রাখার—
হয়তো প্রকৃতপক্ষে জীবিত রাখার জন্য এই চেষ্টা করে।
চারিদিকে মহাকাশে অনেক জোছনা আছে, অনেক জোছনা,
তবে বকুলের 'পরে আমার নিজের ছায়া, বকুলের গা-য়।
অভিধানে যতগুলি শব্দ আছে সে-সকল আসলে জীবিত
জীবনবিশিষ্ট সত্তা, হয়তো হুবহু এই বকুলের মতো—
বকুলের আকারের মতো এক নারী আছে—শঙ্খমালা আছে,
জীবন রয়েছে তার, উড়ে-উড়ে নেচে-নেচে কত গান গায়,
কত রূপকথা করে, শরমে রঙিন হয়ে হয়তো বা বলে,
'তুমি কি ভেবেছো আমি এই মেয়েটির দেহে—শরীরের ফাঁকে
ফুটে থাকা ফুল শুধু, হতে পারে, ঠিক কথা হতে পারে তাও;
তাহলেও আমি এক আলাদা রমণী, একা একাই বকুল।'
এমন সত্তার সব চরিত্রবৈশিষ্ট্য, গুণ, দৈব ক্ষমতাও
স্থির হয়ে আছে সেই মূল ব্যাপারের দ্বারা—সে যে শব্দ তার
চরিত্রবৈশিষ্ট্য, গুণ, দৈব ক্ষমতার দ্বারা—এ-সকল কথা
আমি মনে-মনে ভাবি পাছে কেউ কাছাকাছি শুনে ফ্যালে ভেবে।
বকুল ফলের নয়, কেবল ফুলের গাছ সকল বকুল,
ফলে মৌমাছির সাথে বকুল ফুলের সব সম্বন্ধ ও ভাব
বারবার ব'সে মধু পান করা অবধিই আছে চিরকাল ;
বন্ধ্যা ব'লে বকুলের রূপ এত আঁটোসাঁটো, ঢলঢলে নয়।
ব্যাকরণ আসলে তো পদার্থবিদ্যার বই, প্রাকৃতিক সব
ব্যাপার, ঘটনা নিয়ে তাদের বর্ণনাময় গঠনে গঠিত
শব্দগুলি ঘটনার মূর্তি ব'লে—প্রতিমূর্তি ব'লে মনে হয়।
উত্তেজিত, উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি ফুলে বড়ো হয়ে এ-রকম
সুঁচ হয়ে গেছি ব'লে মনে হয়, জোছনায় ঠিকই মনে হয়;
আমি যে বকুল ফুলে গোলের ভিতর দিয়ে সুঁচ হয়ে গিয়ে
গেঁথে গেছি তার ফলে নানারূপ ফিশফাশ শব্দ হতে থাকে।
শব্দগুলি ঘটনার মূর্তি হয়ে প্রতিমূর্তি হয়ে ভেসে আসে।
এই তো এখন রাতে নিজের ছায়ায় ঢাকা রাতের বাতাসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাকি কাল হয়েছিলো, এ-রকম গতকাল হয়েছিলো নাকি?
বর্ণনাপদ্ধতিগুলি ব্যাকরণ পুস্তকের নিয়মরূপেই
পরিচিত, অভিহিত ; সেইসব সুনিয়ম এসে ব'লে ফ্যালে—
বকুল ফুলের ওই গোলাকার ফাঁকটিতে কোমর অবধি
ঢুকে গিয়ে শেষমেষ বেরোতে না-পেরে তুমি আটকে গিয়েছো!
আটকে যাবার ফলে এ-রকম হাঁশফাঁশ করে নাকি কেউ;
এ-রকম দাপাদাপি করে নাকি আটকালে. কেউ করে নাকি?
সকল ভাষাতে, দ্যাখো, সকল শব্দই মোটে পাঁচটি শ্রেণীতে
ভাগ হয়ে প'ড়ে থাকে, তার কম কিংবা বেশি শ্রেণী অসম্ভব,
কারণ একক আছে—স্থান, কাল আর ভর—শুধু এই তিন
মূল এককেরা আছে, নাকি হাঁশফাঁশ নয়, আমোদ পেয়েছো!
নিয়মেরা চ'লে যায়। যে-কোনো জিনিশ, বস্তু, ঘটনা—ব্যাপার
সে যত রহস্যময় হোক না কেন তা তবু কোনো উপায়ে তো
উক্ত অবস্থায় এসে পরিণত হয়ে আছে, গভীর হয়েছে,
সেইখানে পরিণতি পাবার পদ্ধতিটি তো সর্বদা বাস্তব
এবং তাহলে যদি বাস্তব পদ্ধতিটিকে জেনে ফেলা যায়
পাপড়ি ও পাপড়ির ঘ্রাণের ওপাশে গিয়ে নরম গভীরে
নেমে গিয়ে যদি জানি, লিখে ফেলি তবে সেটা সংজ্ঞা অনুসারে,
প্রমাণ—তথাকথিত বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক, সঠিক প্রমাণ।
এখনই প্রমাণ পাই, জোরালো বাতাসে মৃদু শব্দ ভেসে আসে
পাপড়ির নীচ থেকে, ভেসে আসে মৃদু গন্ধ, খুব মিষ্ট লাগে।
বকুল ফুলের ঘ্রাণ অতিশয় দীর্ঘস্থায়ী, চিরদিন থাকে
যতদিন ফুল থাকে ততদিন তার ঘ্রাণও পুরোপুরি থাকে,
পাপড়ির ভিতরের দিকে থাকে বেশি ক'রে, উপরের দিকে
কম-কম ক'রে থাকে, পুরোপুরি ঘ্রাণ থেকে প্রণয়ীকে ডাকে।
চিরকাল সংজ্ঞা থেকে আমাদের সব জ্ঞান যাত্রা শুরু করে,
হাজার পাঁচেক সংজ্ঞা একেবারে ভ্রান্তিহীনরূপে জানা গেলে
যা-ই চিন্তা করি তা-ই ভ্রান্তিহীন হতে বাধ্য, ভ্রান্তিহীন হয়।
অভিধানগুলি সব সংজ্ঞাপুস্তকের দলে অন্তর্ভুক্ত বই।
আমি সারাদিন ধ'রে যে-সকল চিন্তা করি, যেমন প্রকার
চরিত্রবিশিষ্ট সব চিন্তা করি, গান গাই সারাদিন ধ'রে
সকল সময়ে দেখি সে-সকল চরিত্রের বাস্তব ঘটনা
পৃথিবীতে, পৃথিবীর অধিবাসীদের মাঝে ঘটে, ঘ'টে যায়
কয়েক দিনের মধ্যে—কয়েক মুহূর্তে মাত্র রাত্রির শিশির
বকুলের পাপড়ির গোলাকার ফাঁক দিয়ে চ'লে যায় নিচে,
চাঁদ চুপে ডুবে যায়—দ্বাদশীর হতে পারে, কোথায় কোটরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্যাঁচা ডেকে ওঠে যেন একা-একা ডেকে ওঠে আমোদের ঘোরে।
আর আমি ছাড়া পাই, বকুলে আটকে থাকা থেকে ছাড়া পাই।
দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে দিগন্তের নিচেকার চাঁদ হাতড়াই—
বড়ো বেশি মোলায়েম, নরম-নরম লাগে চাঁদের পাহাড়,
পাহাড়ে কোটরগুলি কোনো গাছপালা নেই, লতাপাতা নেই।
সকল নতুন জ্ঞান সুনিয়মে আবিষ্কৃত হয়ে গেলে পর
সেই জ্ঞান থেকে আমি সব মদ বার ক'রে নিই, নিতে পারি,
সব মদ নিয়ে আমি একটি বাটিতে রাখি, বাটির ভিতরে।
অথবা হয়তো মধু বলা যায়, বকুলের মধু বলা যায় ;
জ্ঞানের সকল গুণ মধুতে থাকে না, থাকে শুধুই মধুর
আপনার গুণগুলি, নিরিবিলি গুণগুলি খুব বেশি থাকে।
কোনো-কিছু লিখে গেলে লিপিবদ্ধ ক'রে গেলে লেখার কালির
অত্যন্ত পাতলা এক পাত জমে, পরিষ্কার অবয়ব জমে।
তবে এই লেখাগুলি নিজেরাই কিছু-কিছু চিন্তা ক'রে থাকে।
তবে এই লেখাগুলি পরস্পর কালি দিয়ে জুড়ে দেওয়া ভলো
যাতে সব লেখা মিশে কেবল একটিমাত্র অবয়ব হয়।
এইসব সেতু পেয়ে হয়তো সে-অবয়ব চিন্তায় কুশলী
হতে পারে, আমাদের ডালপালা, পাতাগুলি কুঁড়ি ও বকুল
চাঁদের সহিত জুড়ে, প্যাঁচার সহিত জুড়ে, শিশিরের সাথে
যোগ ক'রে দিলে তবে অনেক—অনেক বেশি ভাবময় হয়।
বকুলবনের থেকে সকল বকুল যদি ঝ'রে পড়ে না তো,
বহুকাল ধ'রে থাকে, নীরস হয়েও থাকে বনের ভিতরে
রঙ ফিকে হয়ে যায়, পাপড়ি অনেক বেশি শক্ত হয়ে যায়;
তবু তা সুগন্ধ ঠিক দিতে থাকে, পুরোপুরি ঘ্রাণ কিন্তু দেয়,
এবং সে প্রতি রাতে শিশিরে ভিজেই বেশি ভাবময় হয়।
কোনো সত্যকেই কেউ পাল্টাতে পারে না তা যদি সত্য হয়;
তবে সে-সত্যকে কিন্তু চাপা দিয়ে রাখা যায়, ফেলে রাখা যায়।
কতক বকুল ঝরে, বনের ছায়ার নিচে, চুপে প'ড়ে থাকে,
বকুলের আপনার ছায়ার গায়েই ফোটে ব'লে মনে হয় ;
এ-সব ছায়ার ফুল দুই হাতে ধ'রে-ধ'রে মালা গাঁথা হয়,
অর্থাৎ এখানে এসে বকুলের জীবনীতে মানুষেরা ঢোকে
এবং বকুল নিজে মানুষের জীবনীকে ঘিরে চেপে ধরে।
এইভাবে উভয়েই পূর্ণতার অভিমুখে, আরো বেশি ক'রে
অগ্রসর হয়ে যায়, দুয়েরই পূর্ণতাতৃষ্ণা বেশি ক'রে জাগে,
পূর্ণতাসন্ধানও তারা বহু বেশি পরিমাণে করা শুরু করে।
এইভাবে ভাবা হলে পৃথিবীর সকলেই মিলে-মিশে গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল একটি ব্যক্তি—একটি সত্তার রূপে পরিস্ফুট হয়,
আপাতদৃষ্টিতে দেখা আলাদা-আলাদা ব্যক্তি প্রকৃত সত্তার
সমগ্র একটিমাত্র সত্তার প্রত্যঙ্গ শুধু, বেশি কিছু নয়।
আর এই একসত্তা-তত্ত্ব মেনে নিলে তবে দেখি বলা যায়,
ভূবক্ষের সর্বত্রের সকল ঘটনাবলি, ব্যাপার, বিষয়
একেবারে যথাযথ গণিতিক পদ্ধতিতে ঘটাই উচিত,
সুস্পষ্ট বাস্তব এক গাণিতিকতায় ধৃত জীবনযাপন
এই সুবিশাল সত্তা ক'রে থাকে, ভূবক্ষের সর্বত্রই করে।
একসত্তা-তত্ত্বটির স্বপক্ষে আরেক যুক্তি এইভাবে আসে—
সমগ্র সত্তার থেকে কখনো তথাকথিত কোনো ব্যক্তি যদি
সম্পূর্ণ আলাদা হয় তবে অল্পকালে তার—অতি অল্পকালে
অস্তিত্বই লোপ পায়, শারীরিক-মানসিক অস্তিত্ব ফুরায়।
সকল চিন্তার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বকথা বোঝা অনেক সহজ—
যে-কোনো ব্যক্তির চিন্তা অন্যের চিন্তার দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত থাকে
এত বেশি স্থিরীকৃত হয়ে থাকে, অন্যদের চিন্তার সহিত
এত বেশি যুক্ত হয়ে জন্ম পায়, বেড়ে ওঠে যার ফলে শেষে,
যোগাযোগহীন তাকে একত্বের ভিত্তি ব'লে ধ'রে নিলে তবে,
বোঝা যায় এ-সকল ব্যক্তি কেউ এক নয়, কখনোই এরা
আলাদা-আলাদা এক হবে না ভূবক্ষে থেকে শুয়ে, বেঁচে, উঠে
সকলে মিলিত হয়ে যে-বিশাল এক আছে, তাই শুধু এক
জীব নয় প্রাণী নয়, বিশাল জীবন ব'লে তারার মতোন
ফুটে ওঠে পরিষ্কার বায়ুমণ্ডলের মতো ব'লে মনে হয়।
সব মিলে একটিই বিশাল জীবন তবে ভূবক্ষে রয়েছে,
আপাতদৃষ্টিতে দেখা যে-কোনো তথাকথিত একটি ব্যক্তিকে
বিশাল সমগ্র থেকে কখনো আলাদা ক'রে নিলেই হঠাৎ—
যদি কোনোদিন নিতে কোনোভাবে পারা যায় তবেই হঠাৎ
দেখা যাবে ব্যক্তিটির চিন্তা ব'লে কিছু নেই, মন তার শুধু
চিন্তাশূন্য শূন্যস্থান—একেবারে কাল্পনিক, তার মানে মৃত।
আর যদি সে-ব্যক্তিটি ফের গিয়ে এই এক বিশাল জীবনে
যোগদান করে তবে বেঁচে ওঠে, ফের তার চিন্তা শুরু হয়,
ফের সে প্রত্যঙ্গরূপে আপনার ভূমিকায় বেঁচে যেতে পারে।
তার জীবনের সব—প্রত্যেক চিন্তাই এই বিশাল জীবন
স্থির ক'রে দিতে থাকে, নিজেই পাঠিয়ে দেয় ব'লে মনে হয়।
এ-সকল কথা আমি সহজেই বুঝি তার কারণ আঁধারে
দু-পাতার ফাঁকে থাকা একটি বকুল ফুল হাতের মুঠোয়
চেপে ধ'রে চুপচাপ—চুপি-চুপি চাপ দিয়ে চলেছি এখন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথায় উপর দিয়ে উড়ে চ'লে যেতে-যেতে ডাক দিয়ে ফ্যালে
এক প্যাঁচা, কোটরের সেই প্যাঁচা, হয়তো বা কোটর ছেড়েছে।
মুঠো খুলি, খুলে ফেলে হাতটি সরিয়ে নিই, নিয়ে এসে নাকে
চেপে ধরি কেন যেন, উত্তর দিগন্ত থেকে প্রচুর বাতাস
বয়ে-বয়ে সকালের সমুদ্রের দিকে যায়, সমুদ্রের দিকে চ'লে যায়।
রাত ফিকে হয়ে গেছে, বকুল, বকুল ফুল, শুনছো কি, আজ আমি যাই।

৪

বিশাল দুপুরবেলা চারিদিকে ফুটে আছে, ফুটে আছে আকাশে-আকাশে।
সব-কিছু—এ-পাহাড়, গাছপালা আলোছায়া, পরিষ্কার প্রকাশ্যে এসেছে,
কোনো গোপনতা নেই, গোপন থাকার কোনো বাসনার লেশমাত্র নেই
কোথাও কোনো-কিছুতে, সব-কিছু আপনাকে খোলাখুলি ব্যক্ত ক'রে আছে।
এখন দুপুরবেলা, সকল দুপুরবেলা আসলেই খুব এ-রকম।
এ-সময়ে সব-কিছু আপনাকে খুব বেশি আপনার কাছে-কাছে পায়,
নিজেই নিজের থেকে খুব বেশি দূরে চ'লে যাবার ব্যাপার প্রায় নেই।
সকল গাছের ছায়া দেখা যায় ঠিক তার আপনার নিচেই রয়েছে,
যত কাছে আসা যায় তত কাছে চ'লে এসে ঝুলে থাকে নিজের নিচেই।
সকালবেলার কিংবা বিকালবেলার কিন্তু এমন সুযোগগুলি নেই;
গাছের নিজের ছায়া, পাহাড়ের বড়ো ছায়া দীর্ঘ হয়ে দূরে চ'লে যায়।
মনে হয় কিছু খোঁজে, আগের রাতের কথা আগামী রাতের কথাগুলি
খুঁজে-খুঁজে দীর্ঘ হয়ে বড়ো হয়ে চ'লে যায় সুখ মনে আনবার সুখে;
ফলে অস্পষ্টতা থাকে, অনিশ্চিতভাব থাকে সকালে ও বিকালবেলায়।
দুপুরে এসব নেই, কোনো অস্পষ্টতা নেই আছে শুধু নিজের সুখেই
নিজে-নিজে খুশি থাকা, পরিষ্কার পরিস্ফুট হয়ে থাকা আত্মগরিমায়।
এইখানে পাহাড়ের ভাঁজ বলা যেতে পারে, বাঁক বলা যেতে পারে, অথবা আসলে
দু-দুটি পাহাড় এসে মিলে লেগে গেছে যদি বলা হয় তবে একেবারে
হুবহু বর্ণনা হয় ; এ-দুটি পাহাড় এসে সমকোণ ক'রে মেলেনি বা
সরলরেখায় যদি মিলে যেতো তাহলে তো একটি পাহাড় হয়ে যেতো।
তা নয়, মিশেছে প্রায় সরল কোণের খুব কাছাকাছি এক স্থূল কোণে।
এই কোণে, পাহাড়ের কোণের ফাঁকেই হলো আমার বাড়িটি, ঠিক কোণে
পাহাড়ের ঢালু গায়ে চূড়ার কিছুটা নিচে ঢালু কোণে বাড়িটি ঢোকানো
লম্বাভাবে পাহাড়ের ভিতরে অনেকদূর খুব বেশি সুন্দর উপায়ে।
বারান্দাটি শুধু এই পাহাড়ের পাথরের গা থেকে বেরিয়ে ঝুলে আছে,
সামান্যই বেরিয়েছে, পাতলা লতার গাছে বারান্দার চারিপাশ ঘেরা।
পাহাড়ের চূড়াটির প্রায় কাছে ব'সে থেকে চীৎকার ক'রে আমি বলি,
'পাহাড়, তোমার গায়ে বাড়িটি গজালো কেন, এইভাবে কেন গজিয়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এতকাল ধ'রে এতটা জীবন ধ'রে ভেবে-ভেবে এখনো বুঝিনি,
এখানে তোমার গায়ে এ-রকম এত ভালো সরু এক বাড়ি হয়ে গেছে
সে কোন বছর থেকে, কোনভাবে গজিয়েছে, এইখানে কেন গজিয়েছে?
আমার কাছে এ তুমি গোপন করো না, আমি খতিয়ে-খতিয়ে সব অনেক দেখেছি।
দেখলাম বাড়িটির দেয়াল—দেয়ালগুলি তোমার গায়ের মতো শক্ত কিছু নয়,
অত শক্ত কোনো-কিছু দিয়ে তৈরি হয়নি তো, অনেক নরম কোনো-কিছু।
বলেছি তো, লক্ষ্মীটি, এ আমি অনেকদিন আগেই দেখেছি, ফলে তুমি
গোপন কোরো না, বলো, তোমার গায়ে এ-বাড়ি এইভাবে কেন গজিয়েছে?'
জবাবের জন্য আমি থেমে পড়ি, বেশ কিছুকাল ধ'রে চুপ ক'রে থাকি ;
অথচ পাইন আর শালের মর্মর ছাড়া অন্য কোনো ধ্বনি তো এলো না।
নাকি ফিশফিশ ক'রে বলেছে সে খুব বেশি ফিশফিশ ক'রে যাতে তার
কথাগুলি পাইনের আওয়াজের নিচে চাপা প'ড়ে গেছে, এ-রকম পড়ে।
আমি একা-একা লোক, অনেকেরই আপনার পরিবার-পরিজন থাকে—
দর্শনের জগতেও নানা পরিবার আছে, অগণন পরিবার আছে।
সে-সকল পরিবারে—আলাদা যে-কোনো এক পরিবারে সবার চেহারা
চরিত্র ইত্যাদি প্রায় এক রকমের হয়, তাই এত পরিবার হয়।
এমন পরিবারের কারো সাথে কোনো কথা ব'লে মতে গিয়ে যদি তাকে
পাওয়া না-ই যায় তবে সেই পরিবারভুক্ত—একই পরিবারভুক্ত কারো—
অন্য কারো কাছে সেই কথা ব'লে আসা যায় একই আলোচনা করা যায় ;
তাতে খুব অসুবিধা হয় না, হয়তো বেশি সুবিধাও হয়ে যেতে পারে,
যেমন পাহাড়টিকে আমি বলি, প্রায়ই বলি, প্রায়শই নানা কথা বলি,
বাড়িটিকে ব'লে থাকি, তাতে খুব কাজ হয়, বেশ কিছু সুবিধাও হয়।
কারণ বলার কথা আসলে দূরের—ওই সবচেয়ে দূরের চূড়াকে।
কখনোই কারো সঙ্গে আমি কোনোদিন কোনো—কোনো তর্ক-বিতর্ক করি না ;
পাহাড়ের সঙ্গে নয়, বাড়িটির সঙ্গে নয়, এই চূড়া কিংবা ওই দূর
চূড়ার সঙ্গেও নয়—কারো সঙ্গে তর্ক নয়, যে যা বলে তা-ই শুনে নিয়ে
আমার মতটি আমি একেবারে ব'লে দিই, ব'লে আর কথাই বলি না,
কারণ যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো বিষয়ে ভাবে—পক্ষে ও বিপক্ষে ভেবে নেয়,
আমার যুক্তিও সব নিশ্চিতই ভেবে নেয়, বিবেচনা ক'রে নেয়, শেষে
তার মত ঠিক করে, ঠিক ক'রে সেইমতো কথা বলে, কাজ ক'রে যায়।
তা-ই যদি হয় তবে বাড়িটিকে ব'লে-ব'লে অথবা পাহাড়টিকে ব'লে-ব'লে কোনো
লাভ নেই, সে নিজের খুশিমতো কাজ করে যার বহু কিছু
আমার নিজের কাছে ভালোই লাগে না, তাকে যেমন অনেকবার আমি
বলেছি, দিনের বেলা চূড়ার উপরে উঠে হাত বোলাবার ইচ্ছা হয়
চূড়ার উপরে হাত বোলাবার ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হয় খুব নেড়ে দিতে,
লতাপাতা ঘাসগুলি নিয়ে সারাদিন ব'সে দুই হাতে আনমনে খেলা ক'রে যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতে সে-পাহাড় বেশ আপত্তিই করেছিলো, বলেছিলো খুব মাঝে-মাঝে
মাসে দুই-তিন বার বড়ো জোর চারবার এ-সব করতে দিতে পারে।
তবে তার বেশি নয়, দিনের বেলাতে নয়, দিনে ভালো এ-সব লাগে না।
এমনকি চারিদিকে যে-সব পাহাড় আছে, সব মিলে যে-অঞ্চল আছে
তারাও বলেছে, তারা এ-সকল ভালোবাসে তবে ভালোবাসে শুধু রাতে।
যখন আঁধার থাকে, নিকষ আঁধারে তারা নিজেরাই নেই ব'লে ভাবে;
এমনকি জোছনায় আমার প্রস্তাব তারা মেনে নিতে অনায়াসে পারে,
কারণ তারাও সব—এ-সকল ভালোবাসে তবে ভালোবাসে শুধু রাতে।
এই বাড়িটির থেকে বেশ কিছু নিচে গিয়ে পাহাড়ের কোণেই আরেক
বাড়ি আছে, ছোটো বাড়ি, সেটিও আমার এই একই রকমের প্রায় তবে
ও-বাড়ি সাধারণত খালি, ফাঁকা প'ড়ে থাকে ; কদাচিৎ মাঝে-মাঝে যাই
বেড়াতে-সেড়াতে, যাই রুচিবদলের জন্য, উপরের বাড়ি ফেলে রেখে
নেমে গিয়ে বাস করি, না-হলে বছরভর ও-বাড়িতে তালা মারা থাকে।
আসলে নিচের বাড়ি শীতকালে বসবাস করার জন্যেই প'ড়ে আছে?
অঘ্রান পউষ মাসে খুব বেশি শীত পড়ে যখন, চাইকি উপরের
চূড়ায় যখন খুব বরফ পড়তে থাকে তখন উপর থেকে নেমে
উপরের বাড়ি ছেড়ে নিচে নেমে যেতে হয়, নিচের বাড়িতে যেতে হয়।
তার মানে সব মিলে বছরে দু-তিন মাস ও-বাড়িতে বসবাস করি।
পাহাড়ের জীবনের, ভাবনার গতিপথে সর্বত্রই স্পর্শক রয়েছে,
এ-সব স্পর্শক ধ'রে, স্পর্শকের বরাবর অগ্রসর হয়ে যেতে হয়,
স্পর্শকের বরাবর, গেলে তবে পথ চলা অনেক সহজ হয়ে যায়,
সর্বদা সঠিক দিকে চলা হয়, ভবিষ্যতে নির্ভুল পথেই শুধু যাবো—
এ-রকম বোঝা যায়, নিশ্চিত থাকাই যায় এ-বিষয়ে স্বভাবত, আর
স্পর্শকের বরাবর না-হলে তখনই কোনো দুর্ঘটনা ঘ'টে যেতে পারে।
পথের নিয়ম তাই ক্রমাগত আমাদের টেনে রাখে পথের নিয়মে,
তাই আমি শীতকালে উপরের বাড়িটির বারান্দায় বরফ জমলে
নিচের বাড়িতে গিয়ে বসবাস ক'রে থাকি, যদিও সে-নিচের বাড়ির
পুরোনো দেয়ালগুলি উপরের বাড়িটির দেয়ালের মতো ভালো নয়।
অত তেলতেলে নয়, ঘরগুলি অত বেশি বড়োসড়ো, খোলামেলা নয়।
আমি তো কাউকে কোনো উপদেশ দিই না বা উপদেশ দেবার কথাও
ভাবি না, পাহাড়দের কিংবা শীতকালটিকে কিংবা উপরের বাড়িটিকে
কোনো রকমের কোনো উপদেশ দিই না তো, কারণ নিয়ম ব'লে দেয়
উপদেশ দিয়ে কোনো লাভ নেই, পাহাড়ের রোডোডেনড্রনদের আমি
তাদের সকল ডালে কেবল বকুল ফুল ফোটাবার জন্য উপদশে
কখনো দিইনি, প্রায় দিতে গিয়ে চেপে গেছি তা সে এই বকুলের ফুল
আমার যতই ভালো লাগুক না কেন আমি উপদেশ কখনো দিই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যে যেখানে আমি ব'সে আছি এ আমার বাড়িটির উপরের দিকে—
ঠিক উপরের দিকে পাহাড়ের এই চূড়া, দুই দিক থেকে দুই পাহাড় এসেছে,
এসে বাড়িটির কাছে—দুই পাশে বেশ-কিছু নিচু হয়ে গিয়েছিলো, বেশ
নিচুই হয়েছে, তবে আবার এখানে এসে যেখানে মিলেছে সেইখানে
কিছু উঁচু এক চূড়া, পাহাড়ের চূড়া হয়ে পাহাড়েরা এখানে মিলেছে।
চূড়ার মাথায় এক ফাটলের মতো বেশ লম্বা হয়ে বাড়িটির দিকে
নেমে গিয়ে বাড়িটির গায়ে গিয়ে মিশে গেছে অতিশয় মোলায়েমভাবে।
চূড়ার উপর থেকে দেখা যায় ওই পাশে—বাড়িটির বিপরীত পাশে
আরো পাহাড়ের পর পাহাড় রয়েছে প'ড়ে বহুদূর অবধি রয়েছে।
যদিও এপাশে এই বাড়িটির পাশে আর একটি পাহাড় নেই, শুধু
বহু নিচে সমভূমি, সমতলভূমি নিচে প'ড়ে আছে দিগন্ত অবধি।
আর এই পাশে এত পরপর একটানা একরাশ পাহাড় হলেও
আমার চূড়ার থেকে কিছু নিচু—সামান্যই নিচু হয়ে প'ড়ে আছে সব
গভীর অরণ্যে ঢাকা, অতি ঘন বনে ঢাকা, দুপুরের এতটা আলোয়
মনে হয় এ তো যেন উঁচু এক মালভূমি, ছাড়া-ছাড়া পাহাড়েরা নয়,
একটানা মালভূমি, মসৃণ সমান জমি ; তারও ওই ধারে বেশ দূরে
চোখে পড়ে প্রথমেই দুটি পাহাড়ের চূড়া—পাহাড়ের দুটি উঁচু চূড়া।
এ-দুই চূড়ার ঠিক মাঝখান দিয়ে দেখি আরো দূরে আরো এক চূড়া,
দূরে কিন্তু একেবারে দিগন্তের কাছে নয়, চুপচাপ একা প'ড়ে আছে।
এদের গভীরে যত নিজেদের আলো আছে সে-সকল আলো এই দুপুরবেলায়
মিলে গেছে—মিলে গেছে সূর্যের আলোর সঙ্গে, এ-রকম তারা মিশে যায়।
অনেক গভীর রাতে আমি রোজ বাজপাখি হয়ে যাই—বাজপাখি হই,
পাহাড়ের বাজপাখি এবং আকাশে উঠে এ-সকল উড়ে-উড়ে দেখি।
এই সমভূমি থেকে ওই পাশে শেষ চূড়া অবধিই রোজ রাতে দেখি।
তৃতীয়ার জোছনায় যদি উড়ে-উড়ে দেখি তবে সবচেয়ে ভালো লাগে।
তৃতীয়ার জোছনায় এ-সকল মিলে-মিশে নিটোল ছবির মতো হয়।
বাজপাখিদের মন সকল পাখির মন পরিষ্কার ছন্দোময় হয়।
আকাশে হৃদয় মেলে মন ঝাপটিয়ে আমি তালে-তালে মন ঝাপটিয়ে
কবিতার মতো উড়ি, সকল পাহাড় ঘিরে, বাড়ি ঘিরে, চূড়া ঘিরে-ঘিরে।
আকাশে চলতে হলে মানুষের মতো নয় কবিতার মতো হতে হয়,
বাজপাখিদের মতো হতে হয় একেবারে আকাশের মতো জায়গায়
চলাফেরা করবার নিমিত্ত—সত্যই যদি চলবার দরকার হয়।
তৃতীয়ার জোছনায় একা-একা রোজ রাতে উড়ে-উড়ে এ-সকল দেখি।
পাখিরা মানুষদের অথবা দেবতাদের যা বলে তা তারা সব বোঝে।
কোনো কথা গলা দিয়ে বলার সময়ে যত আলাদা-আলাদা ধ্বনিময়
শব্দই বলো না কেন—ভিন্ন-ভিন্ন ভাষাভাষী উক্তিকারী বলুক না কেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের সবার মনে ঠিক একই চিন্তা থাকে যদি সকলের ঠিক একই
ভাবনা বলার থাকে, অন্যদের জানাবার জন্য মনে এসে থাকে তবে।
মানুষের তা-ই হয়, দেবতার, হরিণীর, বাজপাখিদেরও তা-ই হয়।
এখন আসল কথা হলো এই অভিধানে যতগুলি শব্দ আছে, থাকে
কোনোভাবে তারা আসে, সে-সব জীবিত সত্তা চ'লে আসে কী উপায়ে যেন
এসে উপস্থিত তারা ভাবনা-ভাবনা ব'লে আমাদের মনে হতে থাকে।
এবং যে-কোনো শব্দ, 'রমণী' শব্দটি ধরো, নানা দেশে বিভিন্ন ভাষায়
আলাদা-আলাদা সব শব্দ দিয়ে ধ্বনি দিয়ে মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে,
তা-হলেও সে-সবের—সকল ধ্বনিরই কিন্তু একটিই অবয়ব মোটে
একটিই দৃশ্যাতীত অবয়ব এ-সকল রমণীবাচক সব শব্দের প্রতিভূ।
কেবল নিচের দিকে চোখ রেখে প্রাণপণে ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে
তৃতীয়ার জোছনায় উড়েছি অনেকবার এ-সকল নিজেই দেখেছি।
আর যদি তা-ই হয় রমণীবাচক মোটে একটিই সত্তা বিশ্বে থাকে,
তবে সে হরিণীদেরও, বাজপাখিদেরও মনে এসে থাকে রমণীর কথা,
ভাবলেই চ'লে আসে, দীর্ঘতর ভাবনায় এমন অনেক সত্তা এসে
নড়াচড়া ক'রে থাকে, তৃতীয়ার জোছনায় পাহাড়েও মনে ক'রে থাকে।
হরিণী আমাকে যদি কিছু বলে তবে সেটা বোঝাবার ভার ওইসব
অদৃশ্য সত্তার হাতে, কানে-আসা হরিণীর ধ্বনিতে বিশেষ-কিছু নয়।
মানুষের মনে যেই অবয়বচলচ্চিত্র চলে, তার ধারাবিবরণী
মুখ দিয়ে বের হয় নানারূপ ধ্বনি হয়ে, শ্রোতাগুলি সেই ধ্বনি শোনে।
শুনে যদি শ্রোতা ভাবে, ভাবা শুরু করে তবে তারও মনে চলচ্চিত্র হয়।
বক্তা ও শ্রোতার মনে একই সঙ্গে ঠিক একই চলচ্চিত্র চ'লে যেতে থাকে।
তার মানে একদল দৃশ্যাতীত নটনটী একই সঙ্গে দু-জনের মনে
উপস্থিত হয়ে নড়ে—নড়াচড়া ক'রে যায় মোটে একদল এত করে ;
কারণ যে-কোনো শব্দ—নিশা, বিভাবরী, রাত্রি, যামিনী, নিশীথ, শর্বরীর
ধ্বনি এত হলেও তা বিশ্বে মোটে একটিই আছে কোনো নেপথ্যজগতে।
কথা শোনা এবং তা মনে বোঝা—এই দুই একেবারে আলাদা ব্যাপার
কেন যে এমনভাবে মনে হয় বিদেশিনী মেয়েদের কথা কথা নয়।
কেন যে আমার কথা—বাজপাখি হয়ে আমি সমতলে নেমে গিয়ে যত
কথা বলি উড়ে-উড়ে পূর্ণিমার জোছনায় একা-একা কত কথা বলি,
বলি সমতলে যত মানুষ রয়েছে সেই তাদের নিকটে ডেকে-ডেকে
অনেক গভীর রাতে চাঁদের আলোর নিচে, তারার আলোর নিচে একা,
তালে-তালে ডানা নেড়ে পউষে গভীর রাতে অনেক কবিতা ব'লে আসি।
কেন যে আমার কথা কিছুই বোঝেনি এই ভান করে, ভান ক'রে থাকে।
রাত শেষ হলেও তো—সকালেও দুপুরেও—ভান করে কিছুই বোঝেনি।
তবে খুব মনে হয় তৃতীয়ার জোছনায় এই বাড়ি, পাহাড় বুঝেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝেছে এ-চূড়াগুলি, শুয়ে থাকা মালভূমি আমার আপনজন ব'লে।
কোণের উপরে বাড়ি থাকার সুবিধা এই—গ্রীষ্মের সময় থেকে প্রায়
শরতের মাঝামাঝি অবধি একটি ঝর্না কোণ দিয়ে বয়ে চ'লে যায়।
বাড়িটির নীচ দিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে নীচ দিয়ে ঝর্না বয়ে যায়।
বারান্দায় ব'সে একা এ-সকল দেখা যায়, আমার স্নানের ঘরে এই
জল জমা হতে থাকে, জল জমা হয় নিচে বাড়ির নিচেই ছোটো হ্রদে।
শরতে হেমন্তে শীতে এই জল পান করি, পান করে পাহাড়ের দেহ।
বারান্দায় ব'সে দেখি পাইন গাছের গোড়া জলে ডোবা কোমর অবধি,
ঝর্নার আওয়াজ আর পাইনের মৃদু শব্দ মিশে গিয়ে মিশ্র ধ্বনি হয়।
মিশ্র জীবনের ধ্বনি ব'লেই এমনতর মিশ্র ধ্বনি ব'লে মনে হয়।
শুয়ে প'ড়ে জেগে থেকে শোনা যায় সারারাত বারান্দায়, শোবার ঘরেও।
যখন ঝর্নার জল—যখন যে-কোনো জল বয়ে যায় তখন সে-জলে
ভিতরে-ভিতরে খুব নড়াচড়া বেড়ে যায় চলাচল বেড়ে গিয়ে থাকে—
এ-সকল হলো চিন্তা, ঝর্নার জলের চিন্তা এইভাবে বাড়ে,
চিন্তাগুলি এইভাবে খেলা করে, খেলা করে ঝর্নার আপনার মনে।
যত গতি ঠিক তার সমপরিমাণ চিন্তা অবয়ব ব'লে মনে হয়।
গতি ও ভাবনা এই দুই নামে একটিই জিনিশ আলাদাভাবে চোখে
এবং মননে আসে, বোঝা যায়, এইখানে আমি সারা জীবন বুঝেছি।
যদি কোনোমতে ঝর্না, যদি কোনো কায়দায় নিজে কোনো আবিষ্কার করে—
বেশি চিন্তা ক'রে ফ্যালে, গতির মাত্রার চেয়ে কিছু বেশি চিন্তা ক'রে ফ্যালে
তবে তার গতি বাড়ে, মাধ্যাকর্ষণের দেওয়া গতির উপর এসে চাপে
তার আপনার গতি, ঝর্নার নিজের দ্বারা—আপনার ক্ষমতার দ্বারা
পাওয়া গতি—নড়াচড়া, এ-ভাবে সকল ঝর্না নিজে অল্পসল্প ন'ড়ে থাকে
নিজেরই ক্ষমতাবলে, সমুদ্রেরা ইচ্ছা ক'রে নিজেরাই প্লাবন ঘটায়।
এ-সকল আমি বুঝি বিকালবেলার আলো দেখে এ-সকল মনে পড়ে,
পড়েছে অনেকবার চূড়ার ফাটলটিতে একা-একা এইভাবে শুয়ে।
যদি ও-ঝর্নাকে আমি অথবা সমুদ্রদের বাইরে থেকেও ব'লে কিছু পরিমাণে
বেশি চিন্তা ব'লে দিয়ে কখনো করিয়ে নিতে পারি তবে ঝর্না ও সাগর
স্বাভাবিক নড়াচড়া বা তার কিছুটা বেশি ন'ড়ে ওঠে, দোলে, ফুলে ওঠে।
আমি এ-পাহাড়দের প্রায়ই নানা কথা বলি, বোঝাবার চেষ্টা ক'রে থাকি;
মাঝে-মাঝে বোঝে ব'লে মনে হয়, কিছু-কিছু বোঝে ব'লে মনে হতে থাকে,
কারণ পাহাড় দোলে, ঘন-ঘন কেঁপে ওঠে তারপর ফের থেমে যায়।
এইভাবে মানুষকে যদি কোনো এক চিন্তা বাইরের থেকে ব'লে-ব'লে
করিয়ে নিই তাহলে মানুষের আপনার ভাবনার দৃশ্য রূপে—তার
অবয়বে গতিগুলি আগের গতির থেকে আলাদা রকম হয়ে যায়,
নতুন চাপানো চিন্তা নতুন চাপানো এক অবয়ব হয়ে ফুটে ওঠে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন অবস্থাভরা অবয়ব অনায়াসে এইভাবে গ'ড়ে নেওয়া যায়,
বাইরের থেকে কোনো নতুন রকম চিন্তা ক্রমাগত ঢুকিয়ে-ঢুকিয়ে।
তার মানে শরীরের নিয়ম এমনভাবে ধ'রে-বেঁধে পাল্টানো যায়,
কঠিন নিয়মগুলি পাল্টে নেবার জন্য যে আছে সে আরেক নিয়ম।
দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে বর্ষাকালে মেঘ আসে, বাতাসের সাথে ভেসে আসে।
দুই পাহাড়ের গায়ে বাধা পেয়ে মেঘগুলি আমার এ-কোণে এসে জমে।
জ'মে ন'ড়ে-চ'ড়ে ফেরে, ধীরে-ধীরে নড়ে-চড়ে, মনে হয় গড়াগড়ি খায়।
শেষে বাতাসের সাথে কোণ বেয়ে উপরের দিকে উঠে ভেসে চ'লে যায়।
দূরের ও-চূড়াগুলি কিছু বেশি উঁচু হবে, তাই ওই তিনটি চূড়াতে
মেঘ প্রথমেই জমে একেবারে ঘিরে ধরে একেবারে ঢেকে ফ্যালে মেঘে
চূড়াগুলি আর চোখে দেখা যায় না বা কোনো চূড়া নেই ব'লে মনে হয়।
তারপরে এই চূড়া, এখানেও মেঘ জমে চলাচলহীন থামা মেঘ।
তার মানে মনে হয় একটি বিশাল মেঘ সব-কিছু একসাথে জাপটে ধরেছে,
জাপটে ধরেছে সব পাহাড় ও চূড়াগুলি মালভূমি ধ'রে ঢেকে আছে।
রোদ ফিকে হয়ে যায়, আলো ম্লান হয়ে আসে, রহস্যের মতো হয়ে যায়,
এবং পাহাড়গুলি এ-সকল ভালোবাসে এত ভালোবাসে যার ফলে
প্রত্যেক শরৎকালে এ-সব অঞ্চলে সবই অনেক সবুজ হয়ে যায়,
খুব বেশি সজীবতা ফুটে ওঠে এ-দিগন্ত থেকে ওই দিগন্ত অবধি
আমি এইসব দেখে প্রত্যেক শরৎকালে আবার অবাক হয়ে যাই;
কারণ বর্ষার কালে আমার ধারণা হয় ঘরেতে এ-সকল অঞ্চল
কমলা রঙের মতো রঙের অঞ্চল হবে, কোনো-কিছু সবুজ হবে না।
সারাটা বর্ষার কাল এ-রকম মনে হয়, ঘরে শুয়ে বেশি-বেশি হয়।
শরৎকালের জন্য দেরি ক'রে ব'সে থাকি, এ-বছরও অপেক্ষায় আছি।
বর্ষার সকল মেঘ সেই সব-কিছু ছেড়ে ঝ'রে যাবে দূরে চ'লে যাবে
হয়তো তখন সব কমলা রঙের হবে, অকারণে সবুজ হবে না।
সব চূড়া, মালভূমি, দুটি বাড়ি সব-কিছু কমলা রঙের হতে হবে।
খুব বেশি দরকারি কিছু হলে আমি এই আমার চূড়াকে ছেড়ে দিই,
সবচেয়ে বেশি দূর চূড়াকে জিজ্ঞাসা করি, জানবার জন্য প্রশ্ন করি
এবং অনেকবার ওই দূরে চূড়াটিকে জিজ্ঞাসা করেছি, 'কেন সব
মেঘে ধুয়ে দিয়ে গেলে, ধুয়ে দিয়ে চ'লে গেলে, যাবার পরেও কেন সব
সবুজ রয়েছে, চূড়া, আসলে কমলা-রঙা হবার কথা না?'
কখনো ও-চূড়া কোনো জবাব দেয়নি শুনে থেকে গেছে একা চুপচাপ।
ভবিষ্যতে কোনোদিন হয়তো জানাতে পারে, জানাবার ইচ্ছা যদি হয়।
মেঘ আসে এ-চূড়ার বরাবর, ধীরে জমে, খুব বেশি বেগে এসে জমে।
চূড়ার নিচেও জমে, দু-বাড়ির মাঝখানে বরাবর জমে বহু মেঘ।
নিচের বাড়ির কাছে—বাড়ির ভিতরে মেঘ খুব কদাচিৎ গিয়ে জমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারও নীচ দিয়ে কোনো মেঘ জমা কোনোদিন এ-জীবনে আমি তো দেখিনি।
অন্ধকার হয়ে গেছে, আজ যদি চাঁদ ওঠে তবে শেষরাতে দেখা দেবে।
অতএব চূড়া ছেড়ে ঘরে ফিরি ; ঘরে ঢুকি, প্রথমে বারান্দা শেষে ঘর।
খুব বেশিদিন ধ'রে, অনেক শতাব্দী ধ'রে কোনো গতি একটানা পেতে—
পেতে হলে সে-গতিতে চক্রাকার কিছু থাকে; ছোটো-ছোটো চক্রগতি মিলে
একটানা হতে থাকে, হতে থাকে গ্রীষ্ম-বর্ষা, শরৎ-হেমন্ত হতে থাকে।
রেলগাড়িগুলি যেন অনায়াসে চ'লে যায় একটানা সরলরেখায়
যত—যতদূর খুশি তাহলেও মনোযোগ দিয়ে দেখে নিলে দেখা যায়,
রেলের চাকার গতি—ছোটো-ছোটো চক্রগতি কোটি-কোটি যোগ হয়ে গেলে
এ-রকম যাওয়া যায়, যাওয়া যায় দিনভর, হয়তো শতাব্দীভর যায়।
এ-রকম গাড়ি চলে আমার পাহাড়ে চলে, এই মালভূমিময় চলে
চলে ও-দূরের দুই চূড়াতেও, তবে খুব বেশি চলে আমার বাড়িতে—
অনায়াসে একটানা গ্রীষ্ম-বর্ষা হতে থাকে, শরৎ-হেমন্ত হতে থাকে।
ঘরে যদি মেঘ ঢোকে, ঢুকে চলাচল করে তবে সব-কিছু ভিজে যায়,
ঘরের দেয়ালগুলি ভিজে যায়, আমার মাথার টাক—একেবারে চুলছাড়া টাক
বেশ ভেজে, ভিজে যায়, আর সেই মেঘে-ভেজা মাথা আমি কখনো মুছি না।
ভেজা মাথা নিয়ে আমি চলি-ফিরি, নড়ি-চড়ি, শুধু যদি মেঘে ভেজা হয়।
স্নান করবার কালে মাঝখানে যে-রকম মাথা মোছা বারণ রয়েছে,
জল মুছে ফেলবার যে-রকম কোনো মানে হয় না ও কখনো হবে না
তেমনি কারণ আছে, ঘরে-ঢোকা মেঘে যদি মাথা ভিজে যায় তবে আছে।
আমার সচেতনতা যেন অতিচেতনার সমপরিমাণ হয়ে যায়,
উভয় চেতনা যেন সমান কুশলী হয় সমান সক্ষম হয়ে যায়,
দুই চেতনার মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থাটি যেন খুব স্বচ্ছলতা পায়।
পঙ্‌ক্তিগুলি যত বেশি দীর্ঘ করি পাঠকালে তত বেশি ধীরগতি হয়,
সকল প্রকার পঙ্‌ক্তি এই নিয়মেই বাঁধা, এই এক নিয়মেই বাঁধা,
তত বেশি মৃদু হয়, মৃদুতর হয়ে যায় যেন সব চুপ হয়ে যায়,
চুপচাপ গতি থাকে মৃদু-মৃদু সুখ থাকে পঙ্‌ক্তিগুলি খুব দীর্ঘ হলে।
ঘরের ভিতরকার জীবনে এখন আমি নড়ি-চড়ি ধীরে-ধীরে নড়ি
হাত দোলে, মাথা দোলে, বুক দোলে, পা-ও দোলে—পা-দুটিও দুলে-দুলে যায়।
সকল-কিছুরই কিছু মানে আছে, মানে থাকে, মানে নেই—এ-রকম কিছু
স্বাভাবিক প্রকৃতিতে কখনো সম্ভব নয়, সৃষ্টি হলে মানে হয়ে যায়,
আপনিই এসে যায় সৃষ্টির গভীরে এক আরো গভীরতা হয়ে আসে—
এমনিই কিছু আসে, সে যা-ই আসুক তা-ই সে সৃষ্টির আপনার মানে।
এই যে সুন্দরীদের, এই যে সুন্দরদের চলার সময়ে সব নড়ে
অথবা এমনিতেই তারা সব ব'সে-শুয়ে নিজেরাই নাড়ায়-দোলায়
এ-সবেরও মানে আছে, এ-সকল শুধু নড়া—এ-সকল শুধু দোলা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো কখনো এই নানারকমের নড়া—হাত নড়া, মাথা মুখ নাড়া
এসব পৃথক চিন্তা পৃথক-পৃথকভাবে বোঝা যাবে, বোঝা যাবে নাচের কবিতা,
নাচের টুকরোগুলি পরিষ্কার স্বচ্ছ হলে কে জানে কেমন মানে হবে।
তখন সকলকার মন জানা একেবারে খুব বেশি সোজা হয়ে যাবে।
এখন অঘ্রান মাসে সন্ধ্যা হয়ে গেছে বেশ অন্ধকার নামে চারিদিকে,
যদিও চূড়ার পরে সন্ধ্যা হতে দেরি হয়, বেশ দেরি ক'রে সন্ধ্যা আসে।
সমতলে যারা থাকে তাদের জীবনে সন্ধ্যা প্রতিদিন যত তাড়াতাড়ি
সব চুপচাপ হয়ে সকলই নিস্তেজ হয়—সকলই নিস্তেজ হয়ে পড়ে
তার চেয়ে ঢের পরে চূড়ার লোকের কাছে, চূড়ার বাড়ির অধিবাসী
লোকের নিকটে সন্ধ্যা এসে থাকে প্রতিদিন এ-রকম দেরি ক'রে আসে।
এইভাবে জীবনের সব সন্ধ্যা যোগ হলে দেখা যায় সমতলে থাকা
অনেক ক্ষতিই করে, অনেক কিছুই যায় বাকি প'ড়ে লোকসান হয়।
সকল রকম চূড়া, চূড়ার উপরে বাড়ি তাই চিরদিন বেশি ভালো।
সব যোগফল হলে দেখা যায় বহু বেশি লাভ হয়—লাভ হয়ে যায়
অকারণে এমনিতে কেবল চূড়ায় থাকি এই হেতু, অন্যভাবে নয়।
মৃতদেহে মন থাকে, খুব কম-কম মন সকল মৃতের দেহে থাকে
কারণ আসল মন—শরীরের ভিতরের নানারূপ চলাচল থামে,
দ্রুত বেগে রক্ত চলা, হৃৎপিণ্ডে নাচানাচি, ফুসফুসে বাতাসের ঝড়,
আরো এ-রকম সব একটানা নড়াচাড়া একেবারে থেমে যায় ব'লে।
পুরোপুরি ম'রে গেছি, নিস্পন্দ নিথর হয়ে এ-সকল সত্য কথা ভাবি।
পাখিদের থেকে সব পাখি জন্মে, আলোকের থেকে জন্মে সকল আলোক।
এর বিপরীতভাবে, পাখি যদি ম'রে যায় তবু সেই মৃতদেহ পাখি,
গাছ যদি মরে তবে যা থাকে তা—তাও গাছ, মৃত ব'লে অন্য-কিছু নয়।
সেইভাবে আমাদের মন ম'রে গেলে পরে যা থাকে তা—তাও মন মৃত্যুর নিয়মে।

৫

কেমন মোহানা, চুপে মোহানারই মতো হয়ে চারিপাশে এলিয়ে রয়েছে।
প্রতিদিনকার সব স্বাভাবিক শাদামাটা পরিবেশ ব্যাপার জীবন
থেকে বেশ চ্যুত হয়ে, দূরে আর-কোনো এক পরিবেশে ব্যাপারে জীবনে
চ'লে যাওয়া দরকারি, চ'লে আসা দরকারি, খুব বেশি ভালো লাগে ব'লে
দেখা গেলে এ-রকম চ্যুতিগুলি—খসাগুলি অথবা উপরে ওঠাগুলি
না-হলে চলে না, কারো কোনোদিন এ-সকল না-হলে চলেনি।
শাদামাটাদেরই মতো হয়ে তাই এ-সকল লেগে থাকে জীবনে শরীরে
জোড়া থাকে সকলেরই সকল-কিছুর সাথে অবিকল শূন্যতার মতো।
দূরের পাহাড় ছেড়ে, যেন ভুলে ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারে আরো কিছু খুঁজে,
অনেক প্রান্তর ছেড়ে শাদামাটা সহজাত, সহজীবী মাঠ থেকে স'রে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ্যুত হয়ে শেষমেশ মোহানায় এসে গেছি, এইভাবে মোহনায় এসে যেতে হয়,
এইভাবে কবিতায় এসে যেতে হয় শুধু চ্যুতি খুব ভালো লেগে গেলে।
এইসব চ্যুতি তবু মাঠের গায়েই থাকে, মাঠের গায়েই লেগে থাকে,
লেগে থাকে দীর্ঘ সরু ফাঁকের মতোন হয়ে, অবিকল শূন্যতার মতো,
শূন্য যে এমন বেশি—এত বেশি ভালো লাগে, লাগাও সম্ভব তাই ব'লে—
এখানে মোহানা হয়ে ব'লে যায় মেটে, কালো, সবুজ প্রলেপগুলি দিয়ে।
মুগ্ধ হয়ে ওপাশের হাজার মাইলব্যাপী চুপচাপ ডাঙাটিকে বলি,
'এখন এমনভাবে শুয়ে আছো কেন, ডাঙা, বিকালবেলায় শুয়ে কেন?
এই সাগরের নিচু বিছানায় সকলেই বিছানার মতো ক'রে শোয়,
তুমিও পিঠের নিচে সাগরকে নিয়ে শুধু রাতে শুলে তবে ভালো হয়।
এখন বিকালবেলা তোমার পাহাড়-মাঠ চিৎ ক'রে এ-রকম ভাবে
শুয়ে থাকা ভালো নয়, অবশ্য আমার কাছে বিকালেও ভালোই লেগেছে।'
ধীরে চুপ ক'রে যাই। জলের জন্যই নদী, কিছুর জন্যই সব স্থান।
সকল নদীই অন্য জলধারাতেই মেশে, মাটি কিংবা পাহাড়ে মেশে না।
মেশে গিয়ে অন্য নদী অথবা সাগরে গিয়ে, সাগরের জলে গিয়ে মেশে।
এ-ভাবে মোহানাকেও বিছানাই বলা বলা যায়, বিছানায় বিছানাই মেশে।
পৃথিবীর সব জল এইভাবে মিলে-মিশে আসলে একাকার জোড়া হয়ে
একটি অখণ্ড দেহ—একটি অখণ্ড জল হয়ে আছে গোপনে-গোপনে
আমাদের সকলের চোখের আড়ালে, কেন তা এই পাহাড়গুলি জানে,
জানে পাহাড়ের পরে সেই হ্রদ, যে-হ্রদে এ-মোহানার নদীটির শুরু।
ফলে সব জলধারা—পৃথিবীর সব জল পরস্পর মেলামেশা করে ;
নিজেদের আপনার কথা বলে, নিজেদের সুখ ও দুঃখের কথা বলে।
বলে নিজেদের কাছে, আর কাউকেই জল আপনার বিষয় কাহিনী
বলে না বা বলবে না, যে-কোনো প্রাণীর মতো জলের নিজের জাতি আছে।
পৃথিবীতে জলদের নিজেদের জলবংশ চিরকাল আছে এইবাবে।
মোহানা কেমনভাবে, কেমন সুন্দরভাবে মিশে গেছে এখানে সাগরে,
সাগর নামক এই নরম বিছানাটিতে মোহানা কেমনভাবে মেশে—
চিরকাল মেলামেশা করে তবু আমি গেলে, আমি গেলে মোহানা মেশে না।
মোহানায় ঢুকে যাই, একা-একা গান গাই, মোহানার শূন্যতাকে খাই।
রোজ একা-একা খাই, সকল শূন্যতা আমি একা-একা ভ'রে ফেলে খাই;
তাহলেও সেটা ঠিক মিশে যাওয়া হয় না তো, একেবারে মিশে যাওয়া নয়।
খাওয়া চিরকাল খুব খুব স্বাদময় তবু খাওয়া ঠিক এক হওয়া নয়।
কোনো-এক বিষয়ের বিশ্লেষণ ক'রে তাতে ভুল আছে কিনা জেনে নিতে,
এক ফোঁটা ভুলভ্রান্তি আছে কিনা এ-খবর ঠিকমতো জেনে নিতে হলে
বহুবিষয়ক মিশ্র বিশ্লেষণ করা ভালো, করা বড়ো দরকারি যাতে
এক বিশ্লেষণ দিয়ে যে-কোনো বিষয় বেশ পরিষ্কার বোঝা যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা-হলে কোথাও কোনো ভুলভ্রান্তি আছে কিনা সহজেই ধরা প'ড়ে যায়,
সকল বিষয় এসে নিজেরাই এ-সকল যেচে-যেচে ব'লে দিয়ে যায়,
দেখিয়ে-দেখিয়ে দেয় কোথায় পাহাড়, নদ, প্রান্তর, মোহানা এইসব;
কোনো-কিছু বাদ চ'লে যাবার উপায় নেই, কোনো-কিছু বোঝায় গলদ
থাকার উপায় নেই, সব-কিছু স্ফুট হয়ে পরিস্ফুট হয়ে চোখে পড়ে।
বোঝা যায় সবই দামি, পাহাড় প্রান্তর নদী দুই পাড়—এরা বাদ গেলে
মোহানা কখনো নিজে মোহানাই থাকবে না, কোনোদিন তেমন থাকেনি।
ফলে আমি পাহাড়েই ফিরে যাই মেঘ হয়ে বিছানার থেকে উঠে যাই।
উড়ে-উড়ে যাই ব'লে মনে হয় এ-সময়ে এ-রকম মনে হয়ে থাকে।
পাহাড়ের চূড়া ঘিরে ঘিরে ঘিরে কিছুকাল একা-একা খেলা ক'রে ফিরি।
পাহাড়ের চূড়াগুলি চেপে-চেপে ভেঙে দিতে চেষ্টা করি, চেষ্টা ক'রে যাই।
কিছুকাল একা-একা এইসব খেলা করি, উড়ে-উড়ে করি মনে হয়।
তারপরে ফিরে আসি অল্প-কিছু সময়েই মোহনায় ফিরে চ'লে আসি,
প্রান্তরের সারা গায়ে সুন্দর বোলানো হয়ে অল্প-কিছু কালে ফিরে আসি
সাগরের উপরেই, অল্প-কিছু উপরেই আমার নিজের মোহানায় ;
অতগুলি পঙ্‌ক্তি মিলে পাহাড় প্রান্তর হ্রদ সকলেই মিলে গিয়ে বলে
নিচের পঙ্‌ক্তির মানে, সকলের শেষে থাকা শুধু শূন্যময় পঙ্‌ক্তিটির—
মোহানার সব মানে, মোহানার মূল, প্রাণ, স্থান, কাল, জীবনযাপন।
যাদের অনেক জ্ঞান, অনেক প্রকার জ্ঞান জমা হয়ে শরীরে রয়েছে
তাদের সকল জ্ঞান একসঙ্গে ধ'রে নিচে ডান হাতে ধ'রে নিলে দেখি
কেবল একটি মাত্র দণ্ড ব'লে মনে হয়, সব জ্ঞান মিলে দণ্ড হয়।
বহুকাল ধ'রে আমি জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি—সকল বৈশিষ্ট্য ভেবে দেখে
জ্ঞানের সমস্ত রূপ—রূপটিকে দণ্ড বলি, জ্ঞানীদের জ্ঞানদণ্ড বলি।
এইসব কথা ভাবি, আগেও অনেকবার ভেবেছি, এখন ফের ভাবি
মোহানার থেকে দূরে বেশ দূরে সাগরের জলের উপর ভেসে-ভেসে।
কেউ যদি দেখে ফ্যালে তাহলে আমাকে এক সামুদ্রিক পাখি ব'লে তার
মনে হয়ে যেতে পারে, বলা যায় না তো তার এ-রকম মনে হতে পারে।
মোহানার থেকে দূরে ভেসে-ভেসে সাগরের জল মাখি—সারা গায়ে মাখি।
বড়ো ভালো লাগে এই জল মাখা, একা-একা সাগরের জল গায়ে মাখা,
খুব দীর্ঘ হয়ে যাই, আমি নিজে ক্রমে-ক্রমে বড়ো বেশি দীর্ঘ হয়ে যাই
যখন একাকী হয়ে এইভাবে মোহানার থেকে দূরে, বেশ-কিছু দূরে
ভেসে থেকে ভালো ক'রে মোহানাকে দেখে থাকি, মনোযোগ দিয়ে সব দেখি।
মোহানার দুই পাশে বহু গাছপালা আছে, এ-রকম গাছপালা হয়;
যে-কোনো মোহানা ঘিরে সকল মোহানা ঘিরে চিরকাল এ-রকম হয়।
দূর থেকে সব-কিছু, সব গাছপালাগুলি একসাথে দেখা যায়, দেখি।
গাছগুলি খুব বেশি সরু-সরু মনে হয়, কাছে গেলে নিশ্চয় সবুজ—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবুজ রঙের সব গাছ ব'লে মনে হবে, তবে এত দূর থেকে সব
কালো-কালো মনে হয়, একেবারে কালো নয় কালোর মতোন মনে হয়
এই দূর গাছপালা বেশ ভালো ভালো লাগে যেন ওরা গাছপালা নয়,
মোহানার দুই পাশে, দুই পাশ ব'লে মনে হতে থাকে, এ-রকম হয়।
তার মাঝখান দিয়ে মোহানাও দেখা যায়, মোহানাটি মোটে কালো নয়।
সাগরের কাছে এসে সকল মোহানা বেশ চওড়া হবার পরে শেষে—
অনেক চওড়া হয়ে মোহানা সাগরে আসে, নদীর মতোন সরু নয় ;
ডাঙার ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া—বয়ে আসা নদী সব সরু-সরু হয়।
সাগরে বেরোলে তবু অনেক চওড়া হয়, সকল নদীই তা-ই হয়,
মাঝে-মাঝে সাগরের জলরাশি ভিতরেই নিতে হয় ব'লে হতে হয়—
বালতির আকারের হতে হয়, হলে তবে নদীর মোহানা নাম পায়।
এ-সকল ভালো ক'রে দেখে নিই দূর থেকে সাগরের জল গায়ে মেখে।
তা-হলেও দূরে হলে মোহানা তো খুব বেশি চওড়া বা সুগভীর নয়।
মোহানার দিকে যাই, ভেজা গায়ে ধীরে-ধীরে উড়ে-উড়ে যেতে থাকি আমি,
শূন্য দিয়ে যাওয়া যদি—ঘুরে বেড়ানোই যদি ওড়া হয় তবে উড়ে যাই।
এবং আবার সেই পুরোনো ব্যাপার ঘটে, চীৎকার ক'রে উঠি আমি—
'মোহানা, তোমার যত কাছে আসি তুমি তত অধিক চওড়া হয়ে যাও।
একেবারে মুখে নেমে গাছগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে বোঝা যায়,
এবং তুমিও বেশ অনেক চওড়া হয়ে স'রে যাও, পাশে স'রে যাও।
এই তো ভিতরে ঢুকি, তোমার ভিতরে ঢুকি, সাগর পিছনে ফেলে ঢুকি,
এবং মোহানা, তুমি এত বেশি ফাঁক হয়ে এত বেশি পাশে স'রে গেলে।
কী যে ঘটে তা কখনো বলোনি, আমাকে তবু আজ বলো, বলো না, মোহানা,
এভাবে এতটা কেন স'রে যাও, স'রে গেলে, ভিতরে এলেই এতদূরে।'
এবং আবার সেই পুরোনো ব্যাপার ঘটে, কোনোরূপ উত্তর মেলে না।
আমিও ভিতর থেকে বার হই, বার হয়ে ফিরে যাই সাগরে দিকে
নিচু সাগরের দিকে ফিরে যাই মোহানাকে, গাছপালা ইত্যাদিকে ফেলে
দেখি সব-কিছু ফের ছোটো হয়, অত বড়ো মোহানাও সরু হয়ে যায়,
অনেক—অনেক বেশি অগভীর হতে থাকে, অগভীর হয়ে যেতে থাকে।
আমাদের জ্ঞানদণ্ডে এক প্রান্ত শুদ্ধতম গণিত নামক শাস্ত্র আর
অন্য প্রান্ত আমাদের সকলের পরিচিত কবিতা ও কাব্য—কাব্যগুলি।
এ এক নিয়মমাত্র, গণিত যে-ধারে থাকে আসলে বিশ্বের সব রস—
বিশ্বের সকল রস জড়ো হয়ে এসে জমা হয়ে থাকে রসে ' াকারে।
অন্য ধার যেই ধারে কবিতা রয়েছে তার মুখ দিয়ে এই রস পড়ে,
বার হয়ে এসে পড়ে বাহিরের জগতে ও জগতের মোহানাগুলিতে।
যদি আমি মোহানাকে, মোহানার বর্ণনাকে দুই প্রান্তে হুবহু মেলাই,
খুব ভালো ক'রে যদি এমন মিলিয়ে দিই, দিতে পারি যাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় মোহানাই, মোহানার বর্ণনাই আসলে সে গণিত-কবিতা—
গণিতের কবিতার হুবহু বর্ণনামাত্র, তবে দণ্ডটির মাঝামাঝি
সমস্ত-কিছুর সঙ্গে সব বিষয়ের সঙ্গে বেশ মিলে যেতে বাধ্য হয়,
সকল-কিছুর সঙ্গে হুবহু একাত্ম হয়ে মিলে যেতে হয় শুধু মোহানার এই কাহিনীকে।
কাব্যময় প্রান্তটিই সবচেয়ে মনোরম, সবচেয়ে রহস্য-মেশানো,
সবচেয়ে সহজে তা অন্তরে প্রবেশলাভ করবার মতো হয়ে থাকে।
এইখানে মোহানায় সেই প্রান্ত—শুধু সেই কাব্য-প্রান্তটিই এসে থাকে।
গণিতের প্রান্ত থেকে অন্তরের বাহিরেই, দরজার বাহিরেই শুধু
মোহানার বাহিরেই এ-সাগরে ও আকাশে গণিতের দোলনাটি দোলে।
মোহানায় শুধু কাব্য, কবিতার ঠাশাঠাশি, হাসাহাসি, ভালোবাসাবাসি।
যা হোক এখন সরু বেশ সরু মোহানাটি বেশ অগভীর হয়ে গেছে।
এখানে গণিত থাকে সাগরে বা বিছানায় সকল গণিত জ'মে থাকে,
নানারূপ গল্প বলে, বহু রূপকথা বলে, মোহানার গল্পও সে বলে।
এখন আবার আসি ভেসে পড়ি, সাগরের উপরেই লেগে প'ড়ে থাকি।
সারা গায়ে আরো বেশি জল মাখা দরকারি, আরো বেশি ক'রে জল মাখি।
এবং গণিতদের বলা সব গল্প শুনি, নানারূপ কথাবার্তা শুনি—
'কোনো উৎপন্ন রেখা যদি দ্যাখো, দেখা যায় ন'ড়ে চ'ড়ে আপন আকারে
এসে যায়, একেবারে সঠিক আকারটিতে এসে গিয়ে থাকে তবে বুঝো
উৎপন্ন রেখাটির পরেকার—উর্ধ্বেকার উৎপন্ন রেখাটির রূপ
আসলে নির্দিষ্ট হলো, সেই ঊর্ধ্ববর্তীটির নির্দিষ্ট হবার ফলাফলে
এই নিম্নবর্তী—এই নিচেকার রেখাটির রূপ নির্ধারিত হয়ে গেলো।
এই যে মোহানা এই সাগর ও সাগরের পাড়গুলি, প্রান্তর, পাহাড়—
এদের এ-রূপ যদি যেমন দেখেছো ঠিক তা-ই হয় তবে শোনো বলি,
এ-সকল উপরের উৎপন্ন রেখাটির গুণগুলি পেয়েছে ব'লেই
এ-রকম নির্ধারিত হয়ে আছে, এ-রকম নিরিবিলি সুনিয়মে আছে।
এখন সে ঊর্ধ্বলোকে নিজে মোটামুটি তার প্রাথমিক স্বরূপবিন্যাসে।
সেইটি আসল এই মোহানা ও মোহানার চারিপাশ, প্রান্তর পাহাড়—
এ-সকল তারই ছায়া, ছায়াধারণের ব'লে আনন্দের কারণ রয়েছে।
সেইটিই মোহানার, বনানীর, প্রান্তরের, পাহাড়ের আসল হৃদয়।
আসল হৃদয় তবে বেশ ঠিক হয়ে গেছে, কোন-এক নির্দিষ্ট রকমে
এসে গেছে পরিষ্কার বোঝো না কি ছায়াধারণের রূপ দেখে।
এবার কেবল কিছু সময় কাটাও যদি, আর খুব মনোযোগ দাও
খুব মনোযোগ দিয়ে সব দ্যাখো, সব বোঝো তবে সে-হৃদয়টিই নিজে
দেখা দেবে, দেখা দেবে ফাঁকা জায়গায় যেন তারার মতোন দেখা দেবে।
এ হলো নিয়ম,আর সব-কিছুতেই এই নিয়ম গোপন হয়ে আছে ;
নিয়ম গোপন থাকে, হৃদয় গোপন থাকে, তাকে তবু জেনে নিতে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চুপে চ'লে আসি কিছু মোহানার দিকে, শূন্য দিয়ে উড়ে চ'লে আসি ;
এসে সাগরেই পড়ি, কাৎ হয়ে প'ড়ে থাকি একা-একা বেশ শক্ত হয়ে।
এখানে অনেক পাখি, নানা রকমের পাখি মোহানার নিকটে-ভিতরে।
এত পাখি ব'লে তাই পাখি নয়, তার চেয়ে পাখিত্ব রয়েছে বলা ভালো—
প্রচুর পাখিত্ব আছে এইখানে মোহানাতে, মোহানাকে ভালোবাসে ব'লে,
যেমন আমিই বাসি, সকল পাখিত্ব তাকে ঘিরে ঘিরে ঘিরে উড়ে ফেরে
উপরে সাঁতার কাটে ; পাখিত্ব তো পাখি নয় সেহেতু বিরাট হয়ে থাকে,
সেহেতু বিশাল হয় সকল পাখিত্ব আর ছাড়া-ছাড়া পাখিগুলি তার
অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গমাত্র নানাভাবে নড়ে-চড়ে, নানা জায়গায় নড়ে-চড়ে।
এ-সব প্রত্যঙ্গ এই মোহানায় ওড়ে, ভাসে, ছাড়া-ছাড়া মনে হতে থাকে।
মনে হয় পাখিদের—এখন অনেক পাখি এত পাখি মোহানায় যাতে
একেবারে দেখে নিতে, চট ক'রে বিবরণ দিতে বেশ অসুবিধা হয়।
তার চেয়ে তাই ভালো, পাখিত্ব বলাই ভালো তা-হলেই অনেক সহজে
বলা যায়, সহজেই বিবরণ দেওয়া যায়, এমনকি দেখে নেওয়া যায়।
বোঝা যায়, বাতাসের মতো এই সুবিশাল পাখিত্ব বিকালবেলা আজ
জড়িয়ে ধরেছে বড়ো মোহানাকে, বয়ে যায় মোহানার বাহিরে-ভিতরে,
মাঝে-মাঝে ডুব দেয়, ডুব দিয়ে সে নিশ্চয় মোহানার নিচে গিয়ে মেশে।
পাখিরা যদি না পারে তবু এ-পাখিত্ব নিচে তলদেশে ঘষাঘষি করে।
পাখিরা এ-মোহনায় বহু আছে, বহু আছে, শুধুমাত্র মোহানাতে আছে।
মোহানার থেকে দূরে নদীর ভিতর পাখি বিশেষ যায় না, পাখিদের
ঘ্রাণ শুধু যেতে পারে, জোয়ার যখন হয় তখন সুঘ্রাণ যেতে পারে।
মোহানার থেকে দূরে সাগরেও পাখিগুলি কখনোই বিশেষ থাকে না।
বহু মেঘ জ'মে আছে মোহানায় অথবা তা মোহানার উপরে আকাশে
ওইখানে ভেসে থেকে কিংবা ভেসে যেতে-যেতে মেঘগুলি মোহানাকে দ্যাখে,
শুধুমাত্র মোহানাকে মনোযোগ দিয়ে দ্যাখে, আমি নিজে মেঘ হয়ে উড়ে
দেখেছি নিকটে দূরে উপরেও বেশি-কিছু—দেখার মতোন কিছু নেই।
দেখার মতোন শুধু এ-মোহানা, দূর থেকে বেশ দূরে উপরের থেকে
মোহানাকে খুব বেশি পরিচ্ছন্ন নিরিবিলি ছবির মতোন মনে হয়,
খুব বেশি ভালো লাগে নানা রঙে আঁকা-আঁকা মোহানা ও মোহানার ধার—
আসলে মোহানা নয়, মোহানার ধারগুলি দেখে থাকি, বেশি দেখা যায়।
ওই উপরের থেকে মোহানাকে একেবারে শূন্যস্থান ব'লে মনে হয়,
আরো উপরের ওই আকাশের মতো ফাঁকা—ফাঁকা জায়গাই হয়ে যায়।
ফলে দেখা যেতে থাকে শুধু মোহানার পাড়, পাড়ে গাছপালা দেখা যায়।
এই দেখা সারাক্ষণ তবু কেন—কেন যেন মোহানা দেখাই মনে হয় ;
যেন পাড় দেখা নয়, গাছপালা দেখা নয়, কেন যেন শুধুই মোহানা
দেখা ব'লে সারাক্ষণ মনে হয় মেঘদের ভেসে যেতে-যেতে মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকালের সূর্য দূরে মোহানার গাছপালা ছুঁয়ে নেমে এসেছে এখন।
রাত হলে সূর্য নয়, একা-একা চাঁদ ওঠে, ওঠে বহু রাশ-রাশ তারা।
তারাও কি কিছু দ্যাখে, দেখার মতোন কিছু তারাও কি দিব্য চোখে পায়?
আমার তো মনে হয় মোহানা দেখার জন্য শুধুমাত্র সেইজন্য ওরা
আকাশে উদিত হয়, পাখিরা যেমন ওঠে, আমি উঠি, মেঘ ওঠে, ওরাও তেমনি।
অথচ জিজ্ঞাসা করো, সূর্য তুমি ওঠো কেন, মোহানার উপরে অমন
উঠে কেন চ'লে যাও, পুব থেকে পশ্চিমের দিকে কেন রোজ চ'লে যাও।
দেখা যাবে সূর্য নিজে জানে না, সে কেন ওঠে মোহানার উপরে অমন,
তারাও জানে না তা, জানে না চাঁদও, তবে আমি জানি পাখি মেঘ জানে।
স্থল থেকে অন্য স্থলে যেতে হলে যাতায়াত প্রকৃতই ক'রে নিতে হলে
সবচেয়ে ভালো হয় জলপথে ঘুরে গেলে, এমনিতে স্থল থেকে স্থলে
হয়তো বা যাওয়া যায়, তবে সে-রকম যাওয়া কখনো সহজ যাওয়া নয়।
খুব বেশি ভালো হয় জলপথে ঘুরে গেলে, স্থল থেকে স্থলে যেতে গিয়ে—
ভালোভাবে যেতে গিয়ে জলপথ দিয়ে যাওয়া—জলপথ দিয়ে যেতে হয়।
এবং তখন যদি পণ্যদ্রব্য সঙ্গে থাকে, কোনো স্থলে পণ্য দিতে হয়
তবে তো উপায় নেই প্রায় একমাত্র পথ জলপথ ধ'রে স্থলে যাওয়া।
এবং তখনই এই মোহানাই সকলের পথ, সুগভীরতার পথ।
মোহানাতে সেই হেতু সর্বদা বন্দর হয়—জলপথযাত্রাকেন্দ্র হয়,
শুধুমাত্র মোহানাতে যাত্রাকেন্দ্র হয়ে থাকে তাহায় বা নদীতেও নয়।
জীবনে বা ইতিহাসে এই হেতু এ-রকম অনেকের মিলনস্থলের
এত বেশি-বেশি মূল্য, মূল্য এই সাগরের, নদী ও পাড়ের, আকাশের,
পাখিদের, মেঘদের, আমার, সূর্য ও চাঁদ, তারাদের মিলনস্থলের;
তা-হলে এ-নিসর্গের চিরদিনকার এক সোজাসুজি নিয়মবিশেষ
প্রথম পঙ্‌ক্তির থেকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে যেতে হলে
একেবারে তলাকার পঙ্‌ক্তি ঘুরে যেতে হয়, ঘুরে গেলে তবে যাওয়া যায়
সবচেয়ে পূর্ণ যাওয়া—এই পূর্ণতম যাওয়া নিসর্গের সুনিয়মে আছে।
এইভাবে যুক্ত হয়ে পঙ্‌ক্তিগুলি বেঁচে থাকে, স্থলগুলি পণ্য নিয়ে বাঁচে।
সকল প্রকার পণ্য পরস্পর চুপচাপ ভালোভাবে মেলামেশা করে,
যুক্ত হয়ে তবে বাঁচে, তবে বাঁচবার মতো উপযুক্ত অবস্থায় আসে।
স্থলের সহিত অন্য স্থলের সংযোগ তবে এক রকমের মোটে নয়,
নানারকমের হয়, নানারকমের হলে তবে তারা যুক্ত হয়ে বাঁচে।
যুক্ত না-হলে তো কোনো স্থলভাগ বাঁচতো না, জানি না কী-ভাবে ম'রে যেতো;
মরার ধরন ঠিক জানা নেই, তবু জানি ছাড়া-ছাড়া হলে তারা ম'রে ঠিক যেতো।
এমনকি তারাগুলি—ঐ দূর তারাগুলি, অত ছাড়া-ছাড়া সব তারা—
ওরাও আসলে বাঁচে একে-অন্যদের টেনে—টেনে রেখে, যুক্ত হয়ে থেকে।
আলোকের যোগ দেখে, টানের সংযোগ দেখে বেশ অনায়াসে মনে হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে একটি শুধু তারাত্ব রয়েছে বিশ্বে, একটিই তারাদেহ আছে
সকল তারার যোগে, যোগফলে ; মাঝখানে ফাঁকগুলি কিছু স্বাধীনতা।
এইভাবে এক হওয়া, ফাঁক রেখে এক হওয়া—মোহানার ফাঁক দিয়ে হওয়া
সবচেয়ে বেশি ক'রে এক হওয়া, একেবারে পূর্ণতমরূপে এক হওয়া।
ফলে মোহানার প্রায় পুরোটাই আয়োজন—সমুদ্রযাত্রার আয়োজন।
হয়তো অতীতকালে—সুদূর অতীতকালে শুধুমাত্র নিসর্গই ছিলো,
নিসর্গের আপনার রূপগুণই শুধু ছিলো, আর-কিছু তখন ছিলো না।
বিশুদ্ধ নিসর্গ ছিলো, কোনো দূর আরো দূর অতীতের লক্ষ্যদীতে ছিলো।
এখন নিসর্গ নেই যাত্রার ব্যবস্থা আছে, সমুদ্রযাত্রার ছোপ আছে
মোহানার সর্বত্রই, মোহানার সুগভীর ভিতরে ও তীরে-তীরে আছে
কেবল যাত্রার ছোপ ; এইসব গাছপালা কারো যদি নিসর্গই ব'লে
মনে হয় তবে মনে হতে পারে এ-রকম নানা ব্যাপারেই মনে হয়।
আসলে এ-গাছপালা যদি সব তুলে-তুলে পরিষ্কার ক'রে ফেলা হতো
তাহলে যেমন সব—পাড়গুলি যে-রকম সমুদ্রযাত্রার ছোপ হতো,
কিছু-কিছু না তোলায় গাছপালারূপে কিছু রেখে দেওয়াতেও সে-রকম
সমুদ্রযাত্রার ছোপই হয়ে যায়, হয়ে পড়ে সোজা শাদা যুক্তির নিয়মে।
তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখি অঘ্রানের সুবাতাস এইসব গাছপালা নাড়ে,
নিজের মতোন ক'রে মনের মতোন ক'রে নেড়ে এলোমেলো ক'রে যায়।
যা হোক এখন এই মোহানার থেকে দূরে শক্ত হয়ে খাড়া হয়ে আছি
সাগরের উপরেই, বিকালবেলার রোদ—প্রায় সন্ধ্যাবেলাকার রোদ
মোহানার উপরেই, ছড়িয়ে রয়েছে। সা তো, রোদ ভিতরেই ডুবে আছে—
লাল-লাল ভাঙা-ভাঙা, অনেক জায়গা জুড়ে ডুবে আছে রোদ।
এখন যেমন আছি, এ-রকম থাকা ভালো, শক্ত হয়ে থেকে দেখা ভালো।
নরম-নরম থেকে দূর থেকে কাছ থেকে মোহানাকে দেখা দরকার।
এ-রকম বহুবার—অনেক দেখেছি আমি কাছ থেকে দূর থেকে—বহু।
তার চেয়ে ঢের ভালো অতিশয় শক্ত হয়ে মোহানাকে ভালো ক'রে দেখা,
সাগরের জল মেখে সারা গায়ে ভালো ক'রে মেখে নিয়ে এইভাবে দেখা।
তবে তারও চেয়ে ভালো, ঢের বেশি ভালো, ওই রোদের মতোন ডুবে থাকা,
রোদের বিম্বের মতো ডুবে যাওয়া মোহানার সকল গভীরে।
ঢেউ খুব ভালো হলে মেঘগুলি যে-রকম ডুবে যায় সে-রকম—ঠিক
সে-রকম ডুবে যাওয়া, মাইল-মাইলব্যাপী মোহানা ভরাট ক'রে ফেলা।
শুধু ডুবে-ডুবে গিয়ে মেঘের মতোন রাশি—বড়ো-বড়ো রাশি-রাশি হয়ে।
বিম্ব কিংবা প্রতিবিম্ব কেবল আলোর দ্বারা সুনির্মিত মূর্তি বা শরীর।
আলো ও ছায়ার বেশ সুষম বিন্যাসে এই মূর্তিগুলি অবিকল যেন
বর্ণাবলেপন ক'রে নির্মিত ছবির মতো, বর্ণের বদলে আলোছায়া।
কাগজে অঙ্কিত সব ছবির সহিত নিয়ে ভালোভাবে তুলনার ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝা যায় এ-সকল প্রতিবিম্বে প্রাণ আছে, বিম্বগুলি জীবন্তই হয়,
তারা সব চিন্তা করে, নিজেদের নিরিবিলি চিন্তাগুলি চুপচাপ করে।
কে জানে এখন ওই রোদের টুকরোগুলি ডুবে-ডুবে কোন কথা ভাবে,
হয়তো বা মোহানার কথা ভাবে, মোহানায় ডুবে শুধু তা-ই ভাবা যায়।
এইসব ঢেউময় নদীতে সূর্যের বিম্ব, এমনকি মেঘবিম্ব আছে।
অর্থাৎ মসৃণতম না-হলেও কাচ আর উজ্জ্বল ধাতুতে বিম্ব হয়।
হয়তো কেবল কাচ এবং উজ্জ্বল ধাতু এ-সব বিম্বের কথা বোঝে—
বিম্ব যে হয়েছে সেটা খুব বোঝে হয়তো বা, যদিও তা আমরা বুঝি না,
নিজের বিম্বও যদি অমসৃণ কাচে পড়ে তাহলেও নিজে তা দেখি না,
হয়তো সে-কাচ বোঝে, হৃদয়ে বিম্বের সেই উপস্থিতি ভালো ক'রে বোঝে।
সূর্য না বুঝুক তবু মোহানাটি, মনে হয়, বিম্ব যে হয়েছে সেটা বোঝে,
বোঝে তারপরে ওই দূর সখাটিকে বলে ভাঙা-ভাঙা লাল-লাল ভাবে।
মনে হয়, বিশ্বময় যে-কোনো বস্তুরই কিছু বিম্বধারণের গুণ আছে,
অমসৃণ হলেও তা নিশ্চিত কিছু-না-কিছু উপযুক্ততাকে নিয়ে বাঁচে
বিম্বধারণের কিছু উপযুক্ততাকে নিয়ে, ভাঙা-ভাঙা ক'রে হলেও তা
কিছু বিম্ব ঠিক পায়, বড়ো-বড়ো ঢেউ ওঠে তবু ওই বিশাল মেঘের,
বিম্ব মোহানাটি ঠিক পেয়ে গেছে ভিতরে ও ভিতরের ভিতরে গভীরে।
এখন বিকালবেলা এ-সকল বিম্ব পেয়ে, ভেঙে-যাওয়া বিম্বগুলি পেয়ে
হয়তো মোহানা আজ চুপচাপ হয়ে গেছে চুপ সব পাহাড় অবধি।
আরো যেন বেশি চুপ পাহাড়ের ওপাশের ওই হ্রদ—হ্রদের হৃদয়।
এতক্ষণে আমি ফের মোহানার কাছাকাছি চ'লে আসি, চ'লেই এসেছি।
পরিষ্কার বুঝি ওই গাছপালা নিজেদের ভিতরে অনেক বিম্ব পায়,
এখনই পেয়েছে, ওরা সবুজ হলেও কিছু অসুবিধা হবার কথা না।
কাঠ, লোহা ও পিতল—বিভিন্ন রঙের এই জিনিশগুলিকে খুব ক'রে
সুমসৃণ ক'রে নিলে পরিষ্কার বিম্ব ধরে, বিম্ব ধরবার মতো হয়।
রঙে কিছু অসুবিধা হবার কথাই নয়, দু-পাশের গাছপালাগুলি
নিচের ও উপরের, চারিপাশময় সব নিকট ও দূর জিনিশের
বিম্বকে পেয়েছে দেহে গাছপালাদের মতো মোটামুটি দেহের ভিতরে।
মোহানার দুই পাশে থেকে ওরা ও-রকম বড়ো বেশি বাড়ন্ত হয়েছে,
হয়তো এমন বহু—বহু রকমের বিম্ব নিয়মিত পেয়ে যায় ব'লে
হয়তো এমনভাবে ভালো-ভালো বিম্ব পেলে বেশি ক'রে ভালো থাকা যায়,
ভালোভাবে ভাবা যায়, ভালো-ভালো কথা খুব ভালো-ভালো ভাবে ভাবা যায়
বিশাল কবিতাগুলি হয়তো এমনিভাবে বেঁচে আছে, চিরকাল বাঁচে
এই মোহানার থেকে, নিচু সাগরের থেকে শুরু ক'রে পাহাড় অবধি—
ওই পাশ অবধিই যে-বিশাল সুগভীর কবিতা রয়েছে সেও বাঁচে।
হয়তো এমনিভাবে, তার মানে, বেশ-কিছু আরো বেশি ভালোভাবে বাঁচে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহানার মুখে আমি মুখ রেখে এইসব কথা ভাবি, এ-সকল কথা
কেন যেন মনে আসে এ-সময়ে এ-রকম কথাগুলি মনে এসে যায়।
চিন্তাগুলি মুখ থেকে ধীরে-ধীরে মোহানার আপনার মুখে ঢুকে যায়,
চুপচাপ ঢুকে যায়, কোনোরকমের কোনো শব্দ নয়, শব্দ দিয়ে নয়,
চিন্তার মতোই থেকে সুন্দর পিচ্ছিলভাবে অনায়াসে ঢুকে চ'লে যায়,
আরো ঢুকে যেতে থাকে বিরাট বিশালভাবে বহুদূর অবধিই যায়।
জোয়ার-ভাঁটাও হয়, এখন জোয়ার এলো খুব বেশি ফুলে—ফুলে উঠে
যেন ওই বিছানার থেকে ছুটে-ছুটে এসে কিছুটা ঊর্ধ্বের লোভে এলো।
আরো কিছু ঊর্ধ্বে উঠে থাকার রোমাঞ্চগুলি ভালোবেসে চিন্তা ও জোয়ার
এসে যায়, ঊর্ধ্বে ওঠে, কিছুটা উঁচুতে উঠি, জোয়ার না আমি নিজেই তো—
আমিই জোয়ার এই বিশাল মোহানাময় বেগবান উত্তাল জোয়ার।
কে জানে কোথায় টানে, উপরের দিক থেকে আকর্ষণ ক'রে ডাক দেয়
ডাক দেয় কাছে যেতে, তার কাছে চ'লে যেতে, তার কাছে চ'লে যাওয়া আর
অনেক উপরে ওঠা একই ব'লে এ-রকম লোভ হয়, লোভ হতে থাকে।
খুব দূর—অতি দূর থেকে এই টান আসে, বেশ জোর আকর্ষণ আসে,
তরল বিষয়গুলি অনেক চঞ্চল হয় ; তার মানে বায়বীয় বিষয়গুলিও
প্রচুর চঞ্চল হয়, যদিও তা বোঝা ভার, তরলের চঞ্চলতা শুধু বোঝা যায়।
তরল অনেক গাঢ় ব'লে তার চঞ্চলতা আঠার মতোন গাঢ় হয়।
কোনো সুদূরের টানে এত বিচলিত হই, উন্মাদিত হয়ে উঠি আমি,
সেই সুদূরের কাছে যেতে না-পেরেই তবে এইখানে মোহানায় ছুটি।
এইখানে মোহানায়, তবু মনে হয় ওই হাজার মাইল উপরেই
উঠেছি এখন আমি, অনেক উপরে উঠে ঘন-ঘন ওঠানামা করি।
সেই সুদূরের টান ভুলে গিয়ে দেখা যায় মোহানাই প্রচুর উঁচুতে—
প্রচুর-প্রচুর উঁচু, প্রান্তরের পাহাড়ের থেকে এই মোহানা তো অনেক উঁচুতে।
বিশাল মোহানা পুরে খুব বেশি আঁটোসাঁটো হয়ে তবে জোয়ার হয়েছি,
মনে হয় চাপ লেগে মোহানা অনেক বেশি চওড়াই হয়ে গেছে চাপে।
হয়তো হয়েছে, নাকি একটুও হয়নি তা, যদিও ভিতরে এলে পাড়
খুব বেশি দূর হয়, দূর মনে হতে থাকে, অনুভবে মনে হতে থাকে।
কারণ ভিতরে এলে আসলে জোয়ার থাকে পাড় ব'লে কিছুই থাকে না।
জোয়ারের আপনার কাছে মনে হতে থাকে মোহানায় কেবল জোয়ার,
কোনো কূল পাড় নেই ; কারণ ভিতরে এলে পাড় আর চোখেই পড়ে না।
পাড় দেখা যায় না তো, আমিই জোয়ার হয়ে মোহানায় নড়াচড়া করি।
ঢেউগুলি এইবার খুব বড়ো-বড়ো হয়, ঢেউগুলি বড়ো হয়ে পরপর ছোটে,
একের পরেই এক—আরেক তরঙ্গ ছোটে মোহানায় এঁটে তবু ছোটে।
কোথায় আঘাত লাগে এখন কোথায় যেন বারবার কেবলই আঘাত
লাগে ব'লে মনে হয়, ঢেউয়ের আঘাতগুলি এখন কোথায় যেন লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাড়ে-পাড়ে লাগে ব'লে মনে হয়, ভালো ক'রে বুঝি না তা, টানে ম'জে আছি—
কোনো সুদূরের টানে, কোন সুদূরের টানে বুঝি না তা, কী-রকম লাগে।
তবু মোহানাই ভালো, মোহানাকে খুব বেশি মহান-মহান মনে হয়,
যখন সুদূর থেকে খুব আকর্ষণ আসে তখন কেবলই মনে হয়।
বোঝা যায়, টানে নয়, আমাদের জীবনের সার্থকতা আছে শুধু খাতে,
মনমতো খাতে থাকে তরলের জীবনের পুরোপুরি সার্থকতা, মানে।
টান তো অনেক থাকে, টান তো অনেক লাগে, আরো বহু কিছু থাকে, লাগে।
অথচ তাদের কোনো খাত নেই, কারো কোনো ধরাবাঁধা পাড়, খাত নেই।
তাহলে এমন সব জিনিশ কি কাজে লাগে, মোহানা যেমন কাজে লাগে?
মোহানা অনেক বেশি হয়তো বা সকলেরই চেয়ে বেশি গভীর মহান।
মোহানায় জল বয়ে—কেবল আমার মতো অতি দৃঢ় জল বয়ে গেলে
অতি দৃঢ় এ-জলের রেখাগত অবস্থান ক্রমাগত পাল্টাতে থাকে,
পাল্টাতে থাকে এই মোহানার বরাবর রেখাগত অবস্থানগুলি।
এবং সময় বয়, সততই চারিপাশে সময় রয়েছে বইবার
কারণেই ; এ-সময় বয়ে যায় জলে, খাতে জলের অক্ষের রেখা ধ'রে।
তা-ই যদি বয় তবে—সময় ও জল যদি একই সাথে বয়ে যায় তবে
জলধারাটির ভর সর্বত্রই এক থাকে, ভর এক হতে বাধ্য হয়।
মোহানা অথবা নদী যা-ই হোক তার মাঝে জল বয় এই নিয়মের
অধীনে সর্বদা থেকে—কোনো পরিমাণ জল যাতায়াতে অনেক নিমেষে
নানা অবস্থানে আসে, তবু সব অবস্থানে সেই পরিমাণ জল তার
আপনার ভর ঠিক এক রাখে, এক রেখে গেলে তবে এগোতে-পেছোতে
পারা যায় অনায়াসে, নড়াচড়া করা যায়; ফশ ক'রে কিছু ভর যদি
ক'মে যায় তবে এক বিপর্যয় হয়ে যায়—বিপর্যয় ব'লে মনে হয়—
মোহানার মনে হয়, জলের নিজের কাছে মনে হয়, পাড়দের হয়।
আমি চুপচাপ শুনি জ্ঞানদণ্ডে এক প্রান্ত আরেক প্রান্তকে এই বলে,
বলে সাবধান হতে, দ্রুত হোক তবু খুব সাবধানে নড়ুক জোয়ার।
মোহানার কিছু দূরে—উপরের দিকে গিয়ে খুব সরু এক শাখানদী—
মোহানার তুলনায় খুবই সরু শাখানদী; নদী, তবু সকল সময়
এ-নদীতে কোনো জল থাকে না; এখন ভরা জোয়ারের কালে
দেখা ভার, জোয়ারে তা একাকার হয়ে গেছে ফেটে-পড়া মোহানার সাথে।
এখন দেখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তবু আমি জানি শাখানদী আছে।
জোয়ারের শেষে যদি ইচ্ছা হয় তবে তাকে ফের আমি দেখে নিতে পারি—
যে-নদীতে খুব কম সময়েই জল আসে, জল আসে উপরের থেকে।
ফলে মূল মোহানায় বয়ে যেতে-যেতে জল আপনার ভর ঠিক রাখে
খাতকে ক্ষইয়ে তার ক্ষয়িত জিনিশগুলি প্রবাহের সাথে তুলে নিয়ে।
শাখানদী থাকে যদি তবে এইভাবে সব ক্রমশ গভীর হয়ে যায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমশ সুপরিসর হয়ে যায় সব-কিছু—মন, চোখ, মোহানা, কবিতা।
শাখানদী থাকে যদি তবে তার মূল নদী এইভাবে যশ খ্যাতি পায়।
এই মোহানার কাছে বহুদূর অবধিই একটিও উপনদী নেই।
উপনদী যদি থাকে তবে বিপরীতভাবে মূল নদীটিতে পলি জমে,
পলি ত্যাগ ক'রে-ক'রে জল তার ভরটিকে ঠিক রেখে বয়ে যেতে থাকে।
ফলে সব বুজে যায়, বোজে নদী, বোজে মন, বোজে চোখ, মোহানা, কবিতা
ক্রমশ অপরিসর হতে-হতে বুজে যায় পৃথিবীর পৃথিবী, জীবন।
এ-সকল আমি বুঝি এ-রকম শুধুমাত্র মোহানায় সকলই কাটালে
অনায়াসে বোঝা যায়, বোঝা যায় খোলবার বোজবার হেতু আর মানে।
দেহ থেকে যদি কোনো অংশ কেটে বাদ দিই, কোনোদিন বাদ দেওয়া হয়
তবে মন ক'মে যায়, তবে মোট মননের পরিমাণ কিছু ক'মে যায়।
ফলে সব মনে থাকে, চোখে থাকে সুবিশাল দুলে-যাওয়া প্রান্তর পাহাড়—
প্রান্তর পাহাড় সব জোয়ার এলেই দেখি দুলে ওঠে, মন দুলে যায়।
নাকি আমি দুলি ব'লে এ-রকম মনে হয়, এ-রকম মনে হতে থাকে;
নিজেরাও খুব দোলে, খুবই দোলে হয়তো বা, জোয়ারের আঘাতে-আঘাতে।
এইসব নড়াচড়া ভালো লাগে, রোজ-রোজ এই দোলা খুবই ভালো লাগে।
দোলা আর নড়াচড়া বেশ দামি, চিরকালই খুব দামি জিনিশ নিশ্চয়;
হেলাফেলা করবার মতো তারা কোনোদিন ছিলো না বা কখনো হবে না।
জ্ঞানদণ্ড খুব নড়ে পাগলের মতো জোরে ক্রমাগত মাথা ঠুকে-ঠুকে
ব'লে ওঠে—'শোনো হ্রদ, এইসব হাত নড়া, পা নড়া, দু-ঠোঁট, গাল নড়া,
অন্যান্য প্রত্যঙ্গ নড়া আমাদের সর্বস্তরের জীবৎকালের সঙ্গে জোড়া।
এরা নিজে জোড়া আছে শরীরের সঙ্গে আর এ-সবের দোলা, নড়াচড়া
জোড়া আছে শরীরের আয়ুর সহিত—এই সোজা কথা জানো, হ্রদ, জানো?
এতকাল, এতবার এত দুলে এত ন'ড়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে নেচে গিয়ে
দ্যাখোনি নড়ার সঙ্গে আয়ুর সম্পর্ক আছে, যারা নড়ে তাদের আয়ুর?
এখনই সকল কিছু ম'রে যেতে পারে ব'লে মনে হয়, ম'রে যেতে পারে
এ-মোহানা, এ-জোয়ার, পাহাড়, প্রান্তর, বায়ু, সুদূরের আকর্ষণ, আয়ু।
শোনো তো, বিনয়, শোনো, অনেক জিনিশ তুমি এখানে দেখেছো এতকাল।
যে-সব দেখেছো তার একটি তালিকা যদি চাওয়া হয় তবে তুমি সেই
তালিকাটি—একেবারে সম্পূর্ণ তালিকা লিখে আমার নিকটে দিতে পারো।
তারপরে যদি বলি,সব মিলে কী দেখেছো—সব মিলে গিয়ে কোন-এক
তা ব'লে দেখেছো, বলো, তবে তালিকায় লেখা কোনো-কিছু বলতে পারো না,
বললে সকল-কিছু মিলে এক হয় না তো, মিলিয়ে একের রূপে পেতে
শুরু হলো—তালিকার সব-কিছু বাদ দিয়ে তালিকার বাহিরের কিছু
যাখানে দেখেছো বলা, যা দ্যাখোনি এ-রকম কোনো-কিছু ব'লে এক করা,
যা নেই যা কোনোদিন হবেও না, এ-রকম কোনো-কিছু ব'লে এক করা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানদণ্ড চুপ ক'রে পাগলের মতো তবু ক্রমাগত মাথা ঠুকে যায়।
হঠাৎ প্রবলভাবে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠি, চারিদিকে ভূমিকম্প হয়।
অতি অল্প কিছুক্ষণ, আমার নিজের এই মোহানায় এ-রকম হয়।
সব মোহানাতে কিন্তু ভূকম্প হয় না, সব মোহানাতে তা হবার নয়,
খুব অল্প মোহানাতে হয়ে থাকে, আমার এ-মোহানাতে ভালোভাবে হয়!
সঙ্গে-সঙ্গে সবই মরে, মোহানা, পাহাড়, বায়ু, আকর্ষণ, আয়ু ম'রে যায়।
মানবমনের মোট পরিমাণ ক'মে-ক'মে কোনো-এক বিশেষ মানের
নিচে নেমে গেলে তার মৃত্যু হয়, কিন্তু এই ক'মে গিয়ে বাকি থাকা মন
মৃতদেহে রয়ে যায়, শরীরেই রয়ে যায় ক'মে-যাওয়া আলোর মতোন—
ক্রমে-ক্রমে ঠাণ্ডা হলে প্রায়-গলা আলোময় লোহায় যেমন হয়ে যায়।
শরীরেই রয়ে যায় মানুষের ক'মে-ক'মে বাকি থাকা চেতনা বা মন।
এবং শরীর থেকে চেতনার একাংশের বাইরে যাবার কথা নয়—
যাবার উপায় নেই, যাবার ব্যবস্থা নেই, বেরোবার প্রশ্নই ওঠে না।
ফলে বোঝা যায় তার আত্মা নেই, মানুষের কোনোরূপ পরমাত্মা নেই।
মোহানাতে জোয়ারের শেষ হলে প্রতিদিন দেখেছি এবং আজও দেখি
সবচেয়ে ভালো লাগে বাতাস ; জোয়ার-শেষে সহজ বাতাস ভালো লাগে।
তবে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে ওই দূর পাহাড়ের চূড়া আর হ্রদ,
যেন চূড়া আর হ্রদ ছাড়া আর কোনো-কিছু আমাদের পৃথিবীতে নেই,
সরল বাতাসে ঘেরা পাহাড়ের চূড়া আর ওই হ্রদ ছাড়া কোনো-কিছু।
মোহানাও ভুলে যাই, জোয়ারের শেষে হলে এ-রকম মনে হতে হয়।
পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে, চন্দ্র পৃথিবীকে ঘিরে কোনভাবে আবর্তিত হয়—
আবর্তিত হয়ে গেলে এদের গতির গুণ এবং ধরন কী-রকম
হয়ে থাকে জেনে নিতে পৃথিবী, সূর্য ও চাঁদে একসাথে ব'সে সব মাপা
ঠিক সমাধান নয়, সমাধান হলো আঁকা, চিত্রাকারে এঁকে তাতে আরো বহু বিশ্লেষণী রেখা
এঁকে-এঁকে জ্যামিতির, সূর্য চন্দ্র পৃথিবীর উর্ধ্বে উঠে সেই জ্ঞানে—শুধু জ্ঞানে উপনীত হওয়া।
আমরা যা করি তার সবই এই আঁকাআঁকি, কোনোটাই মূল নয়, সবই শুধু ছবি ক'রে আঁকা।

৬

যদি কাছাকাছি থাকি তবে আর অকারণে উদয়ের ভাবনায় কখনো পড়ি না।
থাকে না এমন ভিড়ে খুঁজে-খুঁজে সপ্তর্ষিকে বার ক'রে আনবার বিরাট ঝামেলা।
নিজেই উদিত হলে এরকম অসুবিধা—অপরের উদয়ের ভরসা লাগে না।
সপ্তর্ষিকে পেতে হলে এইভাবে তার কাছে নিজেই উদিত হতে চিরকাল হয়।
কী-রকম পুরুষালি ভাব আছে সপ্তর্ষির, পিছনের দিক থেকে প্রায় তো পুরুষ—
প্রায় তো পুরুষ ব'লে মনে হয়, কী-রকম বাধোবাধো লাগে তার অতি কাছে যেতে।
সামনের দিক থেকে যাই যদি—এই আজ সামনের দিক থেকে যেমন এসেছি—
তবু কিছু মেয়ে-মেয়ে ব'লে মনে হতে থাকে, তারা-তারা ব'লে মনে হতে থাকে যেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম বাধোবাধো লাগে অনায়াসে শোয়া যায়—শুয়ে পড়া যায় শাদা বুকের উপরে।
নীহারিকাপুঞ্জটির বুকের উপরে আমি শুয়ে পড়ি, প্রথমেই কিছু শুয়ে নিই।
দেখি, মরীচির থেকে শেষ তারা অরুন্ধতী কোমর অবধি যায়, কোমরে পৌঁছয়।
কিছুক্ষণ পরে ফের উঠে পড়ি অঙ্গিরার উপরে দু-হাত রেখে বেশ ব'সে থাকি।
অঙ্গিরা ও অরুন্ধতী আছে ব'লে তবু এই নীহারিকাপুঞ্জটির কাছে বসা যায়।
নীহারিকাপুঞ্জটির সকল তারাই স্থির, পরস্পর যার-যার জায়গায় স্থির—
ডান হাত কখনোই বাঁ পায়ের সাথে মিশে-মিলে গিয়ে কোনোদিন বিলীন হয় না
অথবা এ-কাঁধ ছেড়ে কোমরের কাছে গিয়ে লাগেও না, অঙ্গিরায় হাত রেখে বুঝি;
দু-মুঠোয় বেশ জোরে অঙ্গিরাকে এ-রকম চেপে ধরবার মতো সুযোগ পেলেই
এ-সকল সত্য কথা পরিষ্কার বোঝা যায়, হাতেনাতে নাড়া যায় বিশ্বের জ্যামিতি।
অরুন্ধতী কোনোদিন নিজের জায়গা ছেড়ে পুলহের পাশে চ'লে আসবার নয়।
সপ্তর্ষির পাশে ব'সে এ-সকল বোঝা যায়, আসলে তা পরিষ্কার দেখা যেতে থাকে।
যা এ-বিশ্বে বর্তমান এবং সম্ভব, কিংবা বলা যায় একেবারে সম্ভব ব'লেই
হয় বর্তমান আছে নয় তার বর্তনের সম্ভাবনা প'ড়ে আছে, তা হলো বাস্তব।
ফলে অতিবাস্তবতা আসলে কোথাও নেই, অঙ্গিরায় এমনকি অরুন্ধতীতেও
কোনোখানে একফোঁটা অতিবাস্তবতা নেই, সকালবেলাও নেই, দ্বিপ্রহর আছে—
অনাদি অসীম এক দুপুরবেলাই আছে আকাশের এইখানে সপ্তর্ষির কাছে।
পুলহ ক্রতুর দিকে চেয়ে থাকি, তারা দুটি এই উঁচু অঙ্গিরার থেকে বেশ নিচে।
জন্মতত্ত্ব মনে আসে, আসলে ক্রতুর দিকে তাকালেই জন্মতত্ত্ব বেশি মনে আসে।
এমন সুন্দর শাদা এই তারা—এই ক্রতু অঙ্গিরা তারার থেকে এত বেশি নিচে।
নিচে ব'লে এত বেশি চোখে পড়ে, প'ড়ে যায়, আমিও দু-হাত এনে ক্রতুতেই রাখি।
চারিপাশে সকলেই, তবু ভাবি কেউ নেই একাকী সপ্তর্ষি আর আমিও একাকী।
পাখি থেকে পাখি জন্মে, গাছ থেকে গাছ জন্মে, যন্ত্র থেকে যন্ত্র জন্মে, কবিতার থেকে
সকল কবিতা জন্মে, তারা থেকে সেইভাবে কেবল তারাই জন্মে—এ এক নিয়ম।
নিয়মিত গর্ভ হয়ে মাতৃগর্ভে এ-সকল—সকলই চিরকাল জন্মলাভ করে,
এই সোজা শাদা কথা কেন যেন মনে আসে, এই কথা লেখা আছে ক্রতুর গভীরে।
জননী তারার মতো, সন্তান তারার মতো, পিতাকে আসলে এক তারা হতে হয়—
সন্তানলাভের জন্য হতে হয়, পিতা যদি জীবিত ব্যক্তিও হয়, জীবই হয় তবু
রূপে-গুণে সেও ঠিক তারা ছাড়া কিছু নয়, সুনিয়মে তাকে ঠিক তারা হতে হয়—
কবিতাপাঠের শুরু, আয়ুষ্কাল, ভালো লাগা এবং সমাপ্তি সবই সীমাবদ্ধ থাকে
শরীরেই, শরীরের বাইরে পঠন নেই, কেবল কবিতাগুলি নিজেরা রয়েছে।
অরুন্ধতী এইসব সবচেয়ে ভালো বোঝে, এখানে কবিতা শুধু এই অরুন্ধতী,
কাছেই রয়েছে, আমি নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ি, চোখ যায় তার কাছে, খুব কাছে-কাছে।
নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিই, কী-এক বোঁটকা ঘ্রাণ অরুন্ধতী তারা থেকে নাকে এসে লাগে।
অবশ্য জোরালো নয়, একেবারে নাক চাপা দেবার মতোন ঘ্রাণ বেশি,
তবু বেশ কিছু ঘ্রাণ, ফুলের ঘ্রাণের মতো মধুর ঘ্রাণের মতো মিঠে ঘ্রাণ নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন বোঁটকা ঘ্রাণ, এইখানে সপ্তর্ষিতে অরুন্ধতীতেই শুধু এই ঘ্রাণ আছে;
অন্যান্য তারায়—এই মরীচি, অঙ্গিরা, ক্রতু—এইসব তারকায় কোনো ঘ্রাণ নেই,
অত্রিতে যদি বা থাকে সেও খুব কম-কম, তাও খুব মিঠে ঘ্রাণ, মৃদু মিঠে ঘ্রাণ।
সহজেই বুঝে নিই কবিতার গুণাগুণ মাপার জন্য যে-যন্ত্র সে এই শরীর।
অরুন্ধতী তারাটিকে খুব বেশি ভালোবাসি যদিও সে অঙ্গিরার চেয়ে বেশ ছোটো—
আকারে সে খুব বেশি ছোটোই তো, তবু এই ঘ্রাণময় অরুন্ধতী বেশি ভালো লাগে।
তাকে প্রায় খুঁজে-খুঁজে বার ক'রে নিতে হয়, পেতে হয়, অরুন্ধতী এত বেশি নিচে।
আনমনা হয়ে যাই, চোখ দূরে চ'লে যায়, দূর থেকে আরো দূরে অসীম আকাশে
গোলাকার মনে হয়, আলোকের নিয়মে এ-অসীম আকাশ যেন গোল হয়ে আছে।
অগ্নিলোকগুলি তপ্ত, অতিশয় বেশি তপ্ত মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, অরুন্ধতী, ক্রতু
সকলেই বেশ তপ্ত, এ-সব তারার ধারে, চারিধারে যে-সকল বাতাস রয়েছে
সে-বাতাস খুবই তপ্ত, অনেক অনেক দূর থেকে বেশ বোঝা যায়—তাপ বোঝা যায়।
খুব বেশি দূরে গেলে তবে তাপ ক'মে যায়, তবেই শীতল ব'লে মনে হতে থাকে।
এই তাপ ভালো লাগে, তাপের কারণগুলি তারও চেয়ে ঢের-ঢের বেশি ভালো লাগে।
সপ্তর্ষির পাশে ব'সে দেখা গেলো, দেখা যায়, সবই শুধু ভালো লাগে, শুধু ভালো লাগে।
ডান হাত দিয়ে আমি অরুন্ধতী তারাটিকে চুপচাপ চেপে ধরি চাপ দিতে থাকি।
মনে আসে, তারকার জাতিভুক্ত হলে তবে—শুধু তবে তারকার কাছে আসা যায়,
এ-রকম বসা যায়, শোয়া যায়, হাত দিয়ে দেহ দিয়ে মনমতো ধরাছোঁয়া যায়।
মাতা কবিতার মতো, সন্তান কাব্যের মতো, পিতাকেও কবিতাই হয়ে যেতে হয়।
রূপে-গুণে ক্ষমতায় পিতাও কবিতা হলে, তবে দেখা গেছে তার নাম কবি হয়।
এই সব অগ্নিলোকে নিস্পন্দ নিথর শান্তি কখনোই থাকে না বা থাকার কথা না।
বোঝা যায় তারাগুলি ভিতরে-ভিতরে খুব ঝঞ্ঝাকুল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অবস্থায় আছে।
বাইরেও বোঝা যায়, বেশ বোঝা যায় এই অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, অরুন্ধতী—সব
বাইরের থেকে বেশ আলোড়িত মনে হয়, আলোড়ন পরিষ্কার বোঝা, দেখা যায়।
নিজেকেও ক্রমে-ক্রমে এই সপ্তর্ষির মতো হতে হয়, আলোড়িত হয়ে যেতে হয়।
এই অগ্নিলোকে কোনো নিদ্রা নেই, ঘুম নেই, উত্তেজিত ছেদহীন জাগরণ আছে।
কোনোদিন এইখানে আমাতে ও সপ্তর্ষিতে চোখ বুজে একা-একা হতেই হবে না।
চারিপাশে সকলেই, তবু খুব কাছে গেলে মরীচির খুব কাছে মুখ নিয়ে গেলে
কেবল মরীচি থাকে, আর চারিপাশ থেকে সকল তারাই দেখি মিলিয়ে গিয়েছে,
যেন আর কেউ নেই, আর কোনো তারা নেই সপ্তর্ষির কাছাকাছি অথবা সুদূরে,
কারণ চোখের কাছে আসলে, ঠোঁটের কাছে—একেবারে খুব কাছে অত্রি এসে গেছে।
বিশ্বের বদলে তবে বিশ্বের অধিকও আছে, না-হলে কী-ক'রে বিশ্ব ঢাকা প'ড়ে যায়?
আসলে তারাই ভালো, সকলের চেয়ে ভালো সোনালি রঙের সব—এইসব তারা
এরা কেউ কালো নয়, চিনাবাদামের রঙ, কমলালেবুর রঙ, ঘিয়ের মতোন
ভালো রঙও কারো নেই, মাটির মতোন রঙ কারো নয়, সকলেই কেবল সোনালি।
অথবা সোনালি হলে তাকে তারা বলা ভালো, একসাথে বেঁচে আছে সোনা আর তারা
হয়তো রঙের জন্য, কেবল রঙের জন্য এ-রকম বেঁচে যায় তারা আর সোনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণে অত্রি তারা থেকে কথা বের হয়, এতক্ষণে অত্রি তারা বললো, 'বিনয়,
ভাব শব্দটিই সেই যথাযথ শব্দ যার অধীনে যন্ত্রের দেহে ধৃত তত্ত্ব আসে,
মানুষের দেহে ধৃত অনুভূতি চ'লে আসে, গণিতের মাঝে ধৃত দর্শন এসেছে,
আসে কবিতায় ধৃত অনুভূতি—অনুভূতি, এগুলিকে যথাক্রমে যন্ত্রধৃত ভাব,
শরীরের ভাব আর গণিতের ভাব আর কবিতার ভাব বলা সংগত সহজ।
এবং তখনই এই সমধর্মী সৃষ্টিদের অবয়ব ও ভাবের সম্পর্কাদি সব
সমধর্মী হতে বাধ্য ব'লে প্রমাণিত হয়, সব-কিছু চিরকাল প্রমাণ হয়েছে।
সৃষ্টিদের সমধর্ম এইভাবে পাওয়া যায়, সব নাম মুছে শুধু সৃষ্টি নাম থাকে।'
এ-সময়ে এ-সকল তত্ত্বকথা ভালো ক'রে বুঝি না বা হয়তো তা বোধগম্য নয়।
জানি, এই তত্ত্বকথা অরুন্ধতী বলেছিলো, আমাকে বলার জন্য অত্রিকে বলেছে,
এবং এখন অত্রি এবং এখনই অত্রি এইসব কথা বলে, তত্ত্বকথা বলে।
মনে কিছু ব্যথা পাই, জবাব না-দিয়ে আমি ঠোঁট দুটি চেপে ধরি অত্রির উপরে।
অঙ্গিরাও মাঝে-মাঝে এ-রকম ক'রে থাকে, আমাকে বলার জন্য নানা কথা বলে,
অত্রির নিকটে খুব গোপনে-গোপনে বলে; অত্রি আর অরুন্ধতী নিজেরা বলে না।
কিছুক্ষণ পরে আমি ঠোঁট তুলে নিয়ে আসি অথবা কি বহুক্ষণ পরেই তুলেছি।
অত্রি মৃদু হেসে ফ্যালে, সে বলে, 'বিনয়, শোনো, যে-কোনো যন্ত্রের তত্ত্ব পরিবর্তনের
চেষ্টা যদি করো, যদি পরিবর্তিতই করো তবে সেই যন্ত্রটির অবয়বটিও
স্বতই সমমুহূর্তে নিজেই পরিবর্তিত হয়ে যায় যথোচিত রূপ পেতে-পেতে।
ফের বিপরীতভাবে আকার পরিবর্তিত করো যদি তবে তাতে নিহিত তত্ত্বও
স্বতই তদনুরূপ হতে-হতে যেতে থাকে। কবিতার সঙ্গে তার ভাবের ব্যাপার
এই একই চিরকাল এই একই সৃষ্টি আর সৃষ্টিধৃত ভাবটির সম্পর্ক ও যোগ।
ভাব আর অবয়ব—এ দুটিকে কোনোক্রমে পৃথক, বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব ব'লে
ও-দুটি প্রকৃতপক্ষে দুই নামে এক বস্তু, কেবল অদৃশ্য ব'লে ভাবা হলে ভাব,
আর দৃশ্য ব'লে যদি ভাবো তবে অবয়ব এবং হয়তো এই প্রকৃত বস্তুটি
অবয়ব নয় কিংবা ভাবও নয়—অন্য-কিছু, গণিতের এককের মতো অন্য-কিছু।
তবে সেই বস্তুটি যে দুই নামে একই বস্তু—এই সত্যে চিরকাল আস্থা রেখে যাবে।'
তারকার তাপ পেয়ে আমি যেন বেড়ে যাই, খুব বেশি পরিমাণে দীর্ঘ হয়ে যাই।
তাপ পেলে সকলেই এ-রকম বেড়ে যায়—আকারে অনেক বাড়ে, আলো বেড়ে যায়।
কে জানে হয়তো এই আলো নিজে জিনিশের দৈর্ঘ্যই, কে জানে তাও হয়তো বা হবে।
অপরের যা-ই হোক, আমার নিকটে এই তারাগুলি খুব বেশি গরম লাগে না,
কবোষ্ণ-কবোষ্ণ লাগে ভালো লাগে, অরুন্ধতী তারাটির ভিতরেই ঢুকে পড়ি আমি।
বিশাল কায়ার আর কতটুকু এ-তারায় ধরে, তবু যতটুকু ধরে তা ধরুক।
কবোষ্ণ-কবোষ্ণ লাগে অরুন্ধতী তারকার ভিতরেও, এই তাপ বড়ো ভালো লাগে।
এইখানে ছায়া নেই, পৃথিবীতে ছায়া আছে, কেবল আমার ছায়া ক'রেই সেখানে
অধিবাসী সৃষ্টি হয়, সব ক-টি অধিবাসী কেবল আমার ছায়া হয়ে জ'ন্মে থাকে,
জীবনযাপন করে ; তার মানে এ-আমার চলাফেরা ইত্যাদির মতো ক'রে-ক'রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছায়াগুলি—পৃথিবীর অধিবাসীগুলি নড়ে, সঙ্গে-সঙ্গে যেতে থাকে যেন শিষ্য হয়ে।
তাদের এ-সব চলা, এইসব নড়াচড়া জীবনের গতিবিধি কাজকর্ম হয়।
এখন এখানে আমি সপ্তর্ষির উপরে যে-ক্ষিপ্র নড়াচড়া করি, সারা দেহ নাড়ি
সে-সকল নিশ্চিতই ত্রিগুণ নিয়মে গিয়ে ছায়াগুলিতে ও দূর পৃথিবীতে লাগে।
লাগে সপ্তর্ষির দেহে, সপ্তর্ষির সারা গা-য়, মনে হয় সপ্তর্ষিও সঙ্গে-সঙ্গে চলে
আমার শিষ্যার মতো নিজের ভিতরকার অমৃতের ঘ্রাণ পেয়ে, স্বাদ পেতে চলে।
ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে সৃষ্টিশীল চিন্তা ক'রে ক্রমশ বাড়াতে পারি, ক্রমশ বাড়াই।
আলো, ব্যোম ও সময় খুব কাছে এসে গেছে, এত কাছে—গুঁতো লেগে যাবে মনে হয়।
আলো, ব্যোম ও সময় খুব কাছে এসে গেছে, এত কাছে—গুঁতো লেগে যাবে মনে হয়।
আলো, ব্যোম ও সময় জীবিত ও সীমাহীন, বিশ্বময় ব্যাপ্ত সত্তা ; এই তিনজন
তবু তিন জন নয়, যদি ধরা যায় এই বিশ্বে শুধু একজন এ-রকম হবে—
হওয়া প্রয়োজন ছিলো, তবে বোঝা যায় আমি নিজে একা এই আলো, ব্যোম ও সময়।
শরীরই অন্তর আর অন্তরই শরীর—এই অনাদি একের থেকে সৃষ্টি হয়েছিলো
সব-কিছু আলো, ব্যোম, সময়, কবিতা, দেহ একদিন হয়েছিলো ; কথা ছিলো হবে
পুনরায় কবে যেন; অকস্মাৎ শিহরিত হয়ে মনে হতে থাকে আজ তাই হলো।
গান গেয়ে উঠি আমি, গানের হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর অনুসারে সেই স্বরবর্ণগুলি
যেমন হ্রস্ব ও দীর্ঘ হয়েছিলো একদিন, স্বর সুর তেমনিই এক হয়ে স্বরলিপি আসে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প রি শি ষ্ট মা লা

পরিশিষ্ট—ক

বিষ্ণু দে-র কবিতাভাষার দ্বারা প্রভাবিত বিনয় মজুমদারের একটি কবিতা

বিনয় মজুমদার তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্বে বিষ্ণু দে-র কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিনয়ের প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'নক্ষত্রের আলোয়' ও পরবর্তী অন্যান্য কবিতাগ্রন্থে জীবনানন্দের কবিতাভাষার ছাপ স্পষ্টভাবে পড়েছে। বিষ্ণু দে-র প্রভাব কাটিয়ে এবং জীবনানন্দের প্রভাবকে আত্মস্থ ক'রে বিনয় কীভাবে তাঁর নিজস্ব কবিতাভাষাকে খুঁজে পেয়েছিলেন তা পরিষ্কারভাবে জানা যাবে যদি 'নক্ষত্রের আলোয়' গ্রন্থের আগে লেখা তাঁর কবিতাগুলিকে খুঁজে পাওয়া যায়। নিচে বিষ্ণু দে-র কবিতাভাষার দ্বারা প্রভাবিত বিনয় মজুমদারের একটি কবিতা দেওয়া হলো। কবিতাটির অধিকাংশই প্রথম প্রকাশিত হয় বীজেশ সাহা সম্পাদিত 'কবিতা প্রতি মাসে' পত্রিকার বিনয় মজুমদার সংখ্যার (সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪) একটি সাক্ষাৎকারে। আমার কাছে এই কবিতাটির বিনয়ের স্বকণ্ঠে পাঠ টেপ-রেকর্ডারে রক্ষিত আছে। সম্প্রতি লেখাটি 'শিলীন্ধ্র' কর্তৃক প্রকাশিত বিনয়ের 'এখন দ্বিতীয় শৈশবে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। টেপ-রেকর্ডারে ধৃত এই কবিতাটির পাঠের সঙ্গে 'এখন দ্বিতীয় শৈশবে' গ্রন্থে মুদ্রিত এই কবিতাটির পাঠের কিছু অমিল রয়েছে। নিচের কবিতাটি 'এখন দ্বিতীয় শৈশবে' গ্রন্থ থেকে দেওয়া হলো। কবিতাটি বিনয় রচনা করেন ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে, ইডেন হিন্দু হোস্টেলে।

তোমায় যে-দিন
তোমায় যে-দিন পেয়েছি সে-দিন
প্রাকস্মারণিক নয়
ইতিমধ্যেই শিথিল আলিঙ্গন।
ওষ্ঠ-নয়নে কামনা আলিম্পন
মদিরেক্ষণা, কই?
আনো না এখন যখন-তখন
সাদর সম্ভাষণ
অনুপ অমিয়ময়।
সখি, খেদ নেই
কানে কানে বলি
আমার ছোঁয়ায়
বেজেছে সকলি
উষসীর সুরে উঠেছে আকুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতো কুমারীর বাসন্তীসঞ্চয়।
ছলঅকরুণ সাহারা
তবু এ বিতান বাহারা।
রজনীগন্ধা মদিরাবিভোল
নয়নের নীল পাহারা
রেখে গেছে তবু তাহারা।
বনকুসুমের স্নেহসঞ্চয়
মিলেছে আমার ঈশিকায়,
মৌসুমী মৃগতৃষিকায়।
অনুপ অমিয়ময়
তব হৃদয়ের মাধুকরী প্রেম
ধ্রুববাসরীয় নয়!
তবুও নয়নে জমেছে আকাশী
অকারণ অনুনয়।

পরিশিষ্ট—খ

প্রাক-'ফিরে এসো, চাকা' পর্বে রুশ থেকে অনূদিত কিছু টুকরো কবিতা— 'সেকালের বুখারায়' থেকে

সদরুদ্দিন আইনীর আত্মজীবনী 'সেকালের বুখারায়' বইটি মূল রুশ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন বিনয় মজুমদার। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি কর্তৃক ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই বইটি অনুবাদের কাজ বিনয় নিশ্চিতভাবেই 'নক্ষত্রের আলোয়' এবং 'ফিরে এসো, চাকা' রচনার মধ্যবর্তী কোনো সময়ে শেষ করেন। অত্যন্ত সুখপাঠ্য এই অনুবাদ যে-কোনো পাঠককেই আনন্দ দেবে। কিন্তু বিনয় মজুমদারের কবিতার পাঠকের কাছে এই অনুবাদ গ্রন্থটি অন্য আরেকটি কারণেও আকর্ষণীয় হতে পারে। 'সেকালের বুখারায়' একটি গদ্যগ্রন্থ হলেও, এটিতে মাঝেমাঝেই নানাজনের লেখা কবিতার অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। এইসব কবিতার অংশের অনুবাদে বিনয় দু-একটি ক্ষেত্রে গদ্যছন্দ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদ্যছন্দ ব্যবহার করেছেন। 'ফিরে এসো, চাকা' রচনার আগে অনূদিত এইসব টুকরো কবিতার কয়েকটি পাঠক সাধারণের কৌতূহলের কথা ভেবে নিচে সাজিয়ে দিলাম। পদ্যছন্দে অনূদিত টুকরো-কবিতাগুলির দুটি জায়গায় ছন্দপতন ঘটেছে, সম্ভবত অমনোযোগিতার কারণে। প্রথম উদাহরণের 'যতোক্ষণ না'-তে ১মাত্রা এবং ষষ্ঠ উদাহরণের 'বেদনা-শোণিতস্নাতের মতো'তে ১ মাত্রা কম পড়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অবশ্য 'বেদনাশোনিত স্নাতের মতোন' লিখলেই ছন্দ ঠিক থাকতো। সামান্য এই ত্রুটির কথা বাদ দিলে বলতেই হবে কবিতার অনুবাদ যথেষ্ট সাবলীল।

উৎসুক পাঠকদের জানাই 'সেকালের বুখারায়' বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯২ সালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছে এবং বইটি বাজারে এখনও পাওয়া যায়।

১

যতো দিন না স্বপ্ন আমার সার্থক হয়ে ফলে
আমার শান্তি নেই।
যতো দিন না প্রেমিক আমায় সম্মতিবাণী বলে
আমার শান্তি নেই।
হয়তো মরবো, নয়তো রইবো প্রেমিকের ছায়াতলে
আমার শান্তি নেই।

২

পুঁথির পাতা খুলে পড়ো
কিংবা সেগুলো ওলটাও
আর ওলটাতে ওলটাতে হাতের উষ্ণতা আসবে
যদি মৃত্যুর শীতলত্ব নেমে আসে
বেকার জীবনে,
অথবা একঘেয়ে চলার ছন্দে।

AMARBOI.COM

৩

তোমার ক্ষণিক স্মিত অভিনন্দন
সমস্ত বাধার সমুদ্র আমাকে পাড়ি দেওয়ায়
মনের নিভৃত কোণ পুলকে ভ'রে ওঠে
একটুখানি তোমার সোহাগভরা চাহনিতে।
হে আমার সুন্দরের উদ্ধত দীপ্তি,
আমার প্রেম, আমার বসন্ত,
বসন্তের সব পুষ্পসঞ্চয়
সমর্পণ করলাম আমি তোমার পায়ে।

৪

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো :
কেমনধারা চাহনি তোর? মুখটা দিলি পুড়িয়ে।
রাখাল উত্তর দিলো :
বাসি যে ভালো, না-চেয়ে পারি? দিলটা যায় জুড়িয়ে।
বাটিটা এগিয়ে ধরলো মেয়েটা :
বাটিটা ভ'রে আনতো টাকা ! মেজাজ হবে শরিফ।
রাখাল উত্তর দিলো :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় পাবো টাকার কাঁড়ি? দেখছো আমি গরিব।
মেয়েটা রেগে গেলো :
তাহলে তুই আমাকে আর
গিলিস নেরে, বাড়াস নেরে রাগ।
ভাগ ভিখিরি, জলদি ক'রে ভাগ।

৫

তনু থেকে তার রক্তের আভা ঝরে,
দুটি গাল যেন গোলাপ প্রস্ফুটিত ;
—তাকানো যায় না, দৃষ্টি পিছলে পড়ে
পাপড়ির থেকে জলবিন্দুর মতো। ...

হৃদয় এমন মাতাল হয়েছে তোমার দৃষ্টি হতে!
যেন ডুবে আছি নিথর বিশাল এক সুরা সরোবরে।
শত সহস্র, আমারি মতোন, ডুবেছে মোহিনী স্রোতে ;
করুণা কিন্তু করেছো কেবল একটি পাপীর 'পরে।

৬

দৃষ্টিতে তব ছুরিকার লোলুপতা,
নয়নেতে তবু তটিনীর প্রলোভন!
দেখে দেহে নামে অপরূপ মাদকতা,
বেদানাশোণিতস্নাতের মতো মত্ত হয়েছে মন।

৭

ছোকরাটা তো মরে গিয়ে কাজটা ভালো করেনি।
তোরও আছে সাধ আহ্লাদ, তুইও তো এক তরুণী।

৮

কমল-আননা ঘর ছেড়ে তুমি বাইরে বেরিয়ে এলে,
যেন পাকাফল-পতনোন্মুখ; সুরাপানে রঙ্গিনী।
নম্র তরুণ মাধুরিমা তুমি দাও দূরে ঠেলে ফেলে,
সঙ্কোচ আর শরম তোমার ছুঁড়ে ফেলো বিমোহিনী।
কোমল পেলব পয়োধর হোক জোছনায় উত্তাল,
উষার মতোন খুলে ধরো তুমি সকল অন্তরাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

জীবন থেকে কী প্রত্যাশা রয়েছে আর, প্রিয়?
কেবল দুটি পথই আছে অবুঝ চেতনাতে :
এখন হয় তোমার বুকে আমাকে শুতে দিও,
নয়তো নীড় বাঁধবো গিয়ে রাতের তারকাতে।

পরিশিষ্ট—গ

'ফিরে এসো, চাকা' রচনার সময়-সারণি

রচনাকালের দিকে চোখ রেখে 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাবলি পড়লে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। মনে হয় যেন কোনো আগ্নেয়গিরি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে তীব্র গতিতে লাভা উদ্গিরণ করতে শুরু করেছে অথবা যেন ভূমিকম্পে বা তুমুলঝড়ে উত্তাল হয়ে পড়েছে কোনো সমুদ্র। পাতার পর পাতা উল্টে যেতে যেতে মনে হয় পর-পর এতগুলো মহৎ কবিতা রচনা করা সম্ভব হলো কী ভাবে?

'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম ও শেষ কবিতার রচনাকাল যথাক্রমে ৮ই মার্চ, ১৯৬০ এবং ২৯শে জুন, ১৯৬২। অর্থাৎ এই গ্রন্থের ৭৭টি কবিতা রচনা করতে কবির সময় লেগেছিলো ২ বছর ৩ মাস ২২ দিন। এর মধ্যে আবার মানসিক অসুখে আক্রান্ত হয়ে কবিকে প্রায় ৬ মাস হাসপাতালবাস করতে হয় এবং সে-সময়ে কবিতা রচনা বন্ধ থাকে। ২৩শে জুলাই, ১৯৬১তে ২৬ সংখ্যক কবিতাটি (তিন পা পিছনে হেঁটে পদাহত হয়ে ফিরে আসি) রচনা করার পর বিনয় হাসপাতালে ভর্তি হন এবং হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৬২তে রচনা করেন ২৭ সংখ্যক কবিতাটি (মুক্ত ব'লে মনে হয় ; হে অদৃশ্য তারকা দেখেছো)। মধ্যবর্তী প্রায় ৬ মাস বিনয় কোনো কবিতা রচনা করেননি। অর্থাৎ 'ফিরে এসো, চাকা' রচিত হয়েছিলো মাত্রই ২১ মাস ও কয়েকদিনের মধ্যে। যদি আমরা 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাবলির উৎকর্ষের কথা মাথায় রাখি, তাহলে মানতেই হবে যে এ-তথ্য বিস্ময়কর। মহৎসৃষ্টির এই প্রাচুর্যের সমগোত্রীয় অভিজ্ঞতা আমার হয় কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত 'গীতবিতান' পড়ার সময়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি বিনয় তাঁর 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' কবিতাগ্রন্থটি রচনা করেন মাত্র একমাসে—১৩৭৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে।

'ফিরে এসো, চাকা' বইয়ে প্রতিটি কবিতার সঙ্গেই সেই কবিতাটি রচনার তারিখ দেওয়া আছে। কিন্তু কোন দিনে কোন কবিতা রচিত হয়েছে বা একই দিনে কোন কোন কবিতা রচিত হয়েছে তা জানার জন্যে পাঠককে বারবার বইয়ের পাতা ওলটাতে হয়। সেই কারণেই আমি নিচে 'ফিরে এসো, চাকা' রচনার একটি সময়সারণি তৈরি ক'রে দিলাম যা থেকে এক নজরে পাঠকেরা অতি সহজে বুঝতে পারবেন কোন তারিখে কোন কবিতা রচিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখ	এই তারিখে রচিত কবিতা / কবিতাবলির প্রথম পঙ্‌ক্তির খণ্ডাংশ
৮. ৩. ১৯৬০	একটি উজ্জ্বল মাছ
২৬. ৮. ১৯৬০	মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক,
২১. ৯. ১৯৬০	শিশুকালে শুনেছি যে
১১. ১০. ১৯৬০	আকাশ আশ্রয়ী জল বিস্তৃত মুক্তির স্বাদ
১২. ১০. ১৯৬০	স্রোতপৃষ্ঠে চূর্ণ-চূর্ণ লোহিত সূর্যাস্ত
১৪. ১০. ১৯৬০	কাগজকলম নিয়ে চুপচাপ
১৫. ১০. ১৯৬০	বিনিদ্র রাত্রির পরে
১৩. ৬. ১৯৬১	কেন যেন স'রে যাও
১৬. ৬. ১৯৬১	মাংসল চিত্রের কাছে এসে
২৬. ৬. ১৯৬১	বলেছি এভাবে নয় / নাকি স্পষ্ট অবহেলা
২৭. ৬. ১৯৬১	সময়ের সঙ্গে এক বাজি / আমাদের অভিজ্ঞতা সিক্ত
১. ৭. ১৯৬১	কী উৎফুল্ল অংশ নিয়ে
২. ৭. ১৯৬১	শুনে শুনে ছেড়ে দিই
১৪. ৭. ১৯৬১	পর্দার আড়াল থেকে
১৫. ৭. ১৯৬১	কী যে হবে, কী যে হয়
১৯. ৭. ১৯৬১	বেশ কিছু কাল হলো / নেই কোনো দৃশ্য নেই
২০. ৭. ১৯৬১	আর যদি নাই আসো / অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে / নিকটে অমূল্য মণি / যেমন প্রজাপতি ধরা
২২. ৭. ১৯৬১	সুগভীর মুকুরের প্রতি
২৩. ৭. ১৯৬১	বিদেশীভাষায় কথা / তিনপা পিছনে হেঁটে
২৭. ১. ১৬৬২	মুক্ত ব'লে মনে হয়
১১. ২. ১৯৬২	অত্যন্ত নিপুণভাবে
১৮. ২. ১৯৬২	রক্তে রক্তে মিশে আছে
২২. ২. ১৯৬২	আর অন্ধকার নয় / প্রত্যাখ্যাত প্রেম আজ
২৫. ২. ১৯৬২	কেন এই অবিশ্বাস / রোমাঞ্চ কি রয়ে গেছে
১. ৩. ১৯৬২	সবই অতিশয় শান্ত / যদি পারো তবে আনো
৩. ৩. ১৯৬২	ধূসর জীবনানন্দ
৬. ৩. ১৯৬২	আমিই তো চিকিৎসক
১১. ৩. ১৯৬২	স্বপ্নের আধার, তুমি
১২. ৩. ১৯৬২	আরো কিছু দৃশ্যাবলি / মনের নিভৃতভাগ লোভাতুর
১৫. ৩. ১৯৬২	সুরায় উন্মত্ত হয়ে / আমার সৃষ্টিরা আজ
১৭. ৩. ১৯৬২	রসাত্মক বাক্য লেখা / কিছুটা সময় তবু
১৮. ৩. ১৯৬২	শূন্যকে লেহন করো, দেবদারু / যে-পথ রয়েছে তাকে
২২. ৩. ১৯৬২	কোনোদিন একবার উদ্যানে
৫. ৪. ১৯৬২	শুধু গান ভালোবাসো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখ	এই তারিখে রচিত কবিতা / কবিতাবলির প্রথম পঙ্‌ক্তির খণ্ডাংশ
৬. ৪. ১৯৬২	একটি বৎসর শুধু লাস্যময়ী
৮. ৪. ১৯৬২	সন্তপ্ত কুসুম ফুটে পুনরায়
১১. ৪. ১৯৬২	কোনো স্থির কেন্দ্র নেই / কোনো সফলতা নয়
১২. ৪. ১৯৬২	ব্যর্থতার সীমা আছে / শিশুকাল হতে যদি / হৃদয় নিঃশব্দে বাজো
১৫. ৪. ১৯৬২	বড়ো বৃদ্ধ হয়ে গেছি / কোনো যোগাযোগ নেই
১৭. ৪. ১৯৬২	বাতাস আমার কাছে / আমার বাতাস বয়
১৮. ৪. ১৯৬২	ঈপ্সিত শিক্ষায়তনে যাবার
২৩. ৪. ১৯৬২	এমন বিপন্ন আমি
২৪. ৪. ১৯৬২	সহাস্য গুলিটি মনে
২৮. ৪. ১৯৬২	কবে যেন একবার বিদ্ধ হয়ে
৯. ৫. ১৯৬২	এরূপ বিরহ ভালো, কবিতার
১৮. ৫. ১৯৬২	ভালোবাসা দিতে পারি
২১. ৫. ১৯৬২	নানা কুন্তলের ঘ্রাণ
২৩. ৫. ১৯৬২	করুণ চিলের মতো
২৪. ৫. ১৯৬২	যখন কিছু না থাকে
৭. ৬. ১৯৬২	তোমাদের কাছে আছে সংগোপনে / আমার আশ্চর্য ফুল
২২. ৬. ১৯৬২	খেতে দেবে অন্ধকারে / চিৎকার আহ্বান নয় /যাক তবে জ্বলে যাক
২৭. ৬. ১৯৬২	করবী তরুতে সেই
২৯. ৬. ১৯৬২	কবিতা বুঝিনি আমি/আঘাত দেবে তো দাও/তুমি যেন ফিরে এসো

AMARBOI.COM

পরিশিষ্ট—ঘ

বিনয় মজুমদারের কবিতাতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিনয় মজুমদার প্রথম শ্রেণীর একজন কবিই শুধু নন, কবিতার বা ব্যাপক অর্থে শিল্পের ব্যাখ্যাকার হিসেবেও তাঁর চিন্তা-ভাবনা অতি উচ্চস্তরের। বিনয় তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাবলি (যা 'ফিরে এসো, চাকা' এবং 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' গ্রন্থ দুটিতে প্রকাশিত) তাঁর নিজস্ব কবিতাতত্ত্ব ব্যবহার করেই রচনা করেছেন। ফলে তাঁর কবিতা সম্যকভাবে বোঝবার জন্যে তাঁর কবিতাতত্ত্ব জানা প্রয়োজন।

বিনয় তাঁর কবিতাতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন মূলত তাঁর 'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ'তে। এছাড়াও পাঠক তাঁর কবিতাভাবনার সন্ধান পাবেন 'আত্মপরিচয়' ও অন্যান্য কিছু লেখায় এবং চিঠিপত্রে।

'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ'তে বিনয় কবিতার নতুন কোনো সংজ্ঞা দেননি। 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য'—কবিতার পুরোনো এই সংজ্ঞাটি মেনে নিয়েই তিনি বলেছেন যে যেহেতু রস আমাদের মনে অনুভূতির উদ্রেক করে তাই 'প্রচুর অনুভূতি উদ্রেকাত্মক বাক্যই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্য'। তাছাড়া, বর্ণাঢ্য ছবিতে যা থাকে তা যেমন 'স্বয়ং সম্পূর্ণ বর্ণ নয়, বর্ণের আয়োজন ও ব্যবস্থামাত্র' এবং 'বহির্বিশ্বের আলোকের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনে এবং মিলনেই যেমন বর্ণের ব্যবস্থা পূর্ণ বর্ণ হয়ে ওঠে; কবিতাতেও তাই যা থাকে তা আসলে রস নয়, রসের আয়োজন ও ব্যবস্থা মাত্র। পাঠকের রসভণ্ডারের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে ও মিলনেই রসের ব্যবস্থা পূর্ণ রস হয়ে ওঠে।

পাথরের অনাবশ্যক এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ ছেঁটে ফেলেই ভাস্কর যেমন তাঁর ভাস্কর্যটিকে বের করেন, কবিও তেমনি তাঁর চারপাশের অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক অংশ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অংশটুকুকে ব্যবহার করেই সৃষ্টি করেন তাঁর কবিতা। ভাস্কর যেমন পাথরের মধ্যে আগে থেকেই তাঁর ভাস্কর্যটিকে দেখতে পান, কবিও তেমনি কবিতা লেখার সময় তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁর কবিতাটিকে পড়তে পড়তে অগ্রসর হন এবং লিখতে থাকা ঐ কবিতায় তাঁর নিজস্ব রসভাণ্ডার থেকে রস ঢালতে থাকেন তিনি নিজে তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ রচনা কালেই কবি তাঁর রচনাটিকে প্রথম পড়েন। বিনয় লিখেছেন, 'কবির (রচনাকালীন) পাঠই প্রকৃত ব্যাপার, যে-পাঠে তিনি পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেন, সেটিই প্রকৃতপক্ষে সফলতম ও গভীরতম পাঠ'।

বিনয়ের কবিতাতত্ত্বের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো কবিতা কীভাবে ও কেন বহুমাত্রিক বা বহু অর্থবিশিষ্ট হয় তার ব্যাখ্যা। গণিতবিদ বিনয় এই ব্যাপারে গণিতশাস্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন। গণিতশাস্ত্রে বা অন্য যে-কোনো শাস্ত্রে সমস্যাবলির নাড়াচাড়া করা হয় এইভাবে : particular problem → general problem → formula বা theorem। অর্থাৎ কোনো ফর্মুলা বা থিওরেম তৈরি করতে গেলে particular problem বা বিশেষ সমস্যাকে general problem বা সাধারণ সমস্যায় পরিণত ক'রে, সেই সাধারণ সমস্যা থেকে ফর্মুলা বা থিওরেমকে প্রস্তুত করা হয়। কোনো নির্দিষ্ট বা পার্টিক্যুলার বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা কবিতার আবেদন সীমিত হবেই কিন্তু জেনারেল বা সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা কবিতার আবেদন ব্যাপক হতে বাধ্য। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করি। ভক্ত তার ঈশ্বরকে, শিল্পী তার শিল্পকে, প্রেমিক তার প্রেমিকাকে ভালোবাসে। এভাবে জগতের নানা ব্যক্তি তাদের ভালোবাসার নানা বিষয় বা ব্যক্তিকে ভালোবাসে। এদের প্রত্যেকের ভালোবাসাই একটি নির্দিষ্ট ভালোবাসা। কোনো নির্দিষ্ট ভালোবাসাকে নিয়ে যদি কবিতা লেখা হয় তাহলে সেই কবিতা একটা বিশেষ ধরনের ভালোবাসাকেই প্রকাশ করবে, তা সমস্ত ধরনের ভালোবাসাকে প্রকাশ করবে না। কিন্তু নানা ব্যক্তির নানা ভালোবাসার জেনারেল বা সাধারণ ব্যাপার হলো এই যে প্রেমিক তার প্রেমের বিষয়কে বা প্রেমাস্পদকে ভালোবাসে। ফলে প্রেম এই বিষয়টাকে সাধারণীকৃত ক'রে নিয়ে কবিতা লিখলে সেই কবিতার আবেদন ব্যাপক হবেই।

কিন্তু কবিতার আবেদন কীভাবে ব্যাপক করা যায়, কীভাবে কবিতা রচনার সময় কোনো বিশেষ বিষয়কে সাধারণ বিষয়ে রূপান্তরিত ক'রে কবিতা-থিওরেম বা কবিতা-ফর্মুলা প্রস্তুত করা যায়, বিনয় তার ভারি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। গণিতে যেমন একটি থিওরেম বা ফর্মুলার দ্বারা এক ধরনের নানা সমস্যার সমাধান করা যায়, কবিতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্রেও তেমনি কোনো সাধারণ বিষয়ের ওপর লেখা কবিতাই হলো কবিতা-ফর্মুলা বা কবিতা-থিওরেম এবং এই কবিতা-ফর্মুলা বা থিওরেম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির একই চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতিকে ব্যাপকতরভাবে প্রকাশ করে। এই ব্যাপারটাকে বিনয় যে-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা নিচে দিলাম।

এই বস্তুজগৎ অনুভূতির মাধ্যমেই আমাদের স্মৃতিতে ধরা থাকে। কবি এই বস্তু জগতের যে-খণ্ডাংশ নিয়ে কবিতা লিখতে চান সেই খণ্ডাংশের হুবহু বর্ণনা লিপিবদ্ধ ক'রে তিনি পাঠকের মনে মোটেই ব্যাপক সাড়া জাগাতে পারবেন না। কারণ কবির জীবনের ঐ নির্দিষ্ট ঘটনার বর্ণনা পাঠকের মনে ঐ নির্দিষ্ট ঘটনাটারই অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে এবং কবির ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা বিষয়ে পাঠকের আগ্রহ নাও থাকতে পারে। কিন্তু কবি যদি ঐ নির্দিষ্ট ঘটনার বর্ণনা দেওয়া থেকে বিরত হয়ে প্রতীক, উপমা, রূপক ইত্যাদির সাহায্যে ঐ ঘটনার একটি সাংকেতিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তবে তাঁর বর্ণনা সাধারণীকৃত হয়ে যাবে। ধরা যাক, কবি বস্তুজগতের যে খণ্ডাংশ নিয়ে কবিতা লিখছেন তা হচ্ছে অবয়ব১, এই অবয়ব১ কবিমনে যে অনুভূতি জাগিয়ে তুলছে তা অনুভূতি ১, কবি প্রতীক, উপমা, রূপক ইত্যাদির সাহায্যে অন্য যে খণ্ডজগতের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করছেন তা অবয়ব২, এবং অবয়ব২ এর বর্ণনা প'ড়ে পাঠকের মনে যে অনুভূতি হবে তা অনুভূতি২। অর্থাৎ ব্যাপারটা ঘটছে এইভাবে :

অবয়ব১ (কবির দ্যাখা খণ্ডজগৎ) → অনুভূতি১ (কবির দ্যাখা খণ্ডজগতের আনুভূতিক চিত্র) →

অবয়ব২ (উপমা, প্রতীক, রূপক ইত্যাদির সাহায্যে গ'ড়ে তোলা কবির সাংকেতিক জগৎ) → অনুভূতি২

(সাংকেতিক জগতের বর্ণনা পাঠকের মনে যে আনুভূতিক চিত্র তৈরি করছে)

ছোটো ক'রে লিখলে ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম :

অবয়ব১ → অনুভূতি১ → অবয়ব২ → অনুভূতি২

লিখিত কবিতার ক্ষেত্রে যা হবে তা হলো :

অবয়ব২ → অনুভূতি২, কারণ কবি অবয়ব১-এর বর্ণনা না-দিয়ে অবয়ব২ অর্থাৎ একটি সাংকেতিক খণ্ড জগৎ গ'ড়ে তুলেছেন। কবির ব্যক্তিগত জীবনে অবয়ব২ → অনুভূতি১ ; কিন্তু পাঠক কবিতাটিকে (অর্থাৎ অবয়ব২-কে) প'ড়ে অবয়ব১-এ ফিরতে চান বা জানতে চান কোন ঘটনা কবিকে অবয়ব২ লিখতে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু কবিতায় যেহেতু অবয়ব১ এর বর্ণনা দেওয়া নেই, তাই পাঠক নিজেরই জীবনের কোনো ঘটনায় এসে উপস্থিত হন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কবিতাটি পাঠকের নিজের জীবনের কোনো ঘটনার প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে এবং তাই কবিতাটিকে পাঠক আর ভুলতে পারেন না।

বিনয় রবীন্দ্রনাথের 'এই করেছ ভালো নিঠুর' কবিতাটিকে বিশ্লেষণ ক'রে তাঁর তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই করেছ ভালো, নিঠুর,
এই করেছ ভালো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।

যে বাস্তব ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে এই কবিতাটি লিখতে প্ররোচিত করেছে, রবীন্দ্রনাথ সেই বাস্তব ঘটনাটির কোনো বর্ণনা এখানে দেননি। নিঠুর কে, সে কী করেছে এ-সব বর্ণনা না-দিয়ে তিনি ধূপ এবং দীপের প্রতীক ব্যবহার ক'রে একটি সাংকেতিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই লেখাটি প'ড়ে পাঠক স্বাভাবিকভাবেই জানতে চাইবেন যে বাস্তব কোন ঘটনা এই কবিতা লিখতে রবীন্দ্রনাথকে প্ররোচিত করেছে, কিন্তু সেই ঘটনার কোনো বিবরণ লেখাটিতে না-পেয়ে পাঠক তাঁর নিজেরই জীবনের কোনো অভিজ্ঞতার সাংকেতিক বিবরণ হিসেবে লেখাটিকে ভাবতে থাকেন। এভাবে লেখাটি কবির ব্যক্তিগত জীবনের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে ব্যাপকতর প্রেক্ষাপটে এসে উপস্থিত হয়।

একটি কবিতাকে কেন একাধিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, বহু অর্থযুক্ত কবিতাই কেন সেরা কবিতা, একই লেখা কীভাবে কখনো পূজার্থ আবার কখনো প্রেমের হয়ে ওঠে— এ-সব ব্যাপারে বিনয়ের বিশ্লেষণ তুলনাহীন।

AMARBOI.COM

পরিশিষ্ট—ঙ

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থের ভূমিকা

'ফিরে এসো, চাকা'র তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে 'আমার ঈশ্বরী'কে নামে প্রকাশিত হয়। 'আমার ঈশ্বরী'কে গ্রন্থে বিনয় মজুমদার 'প্রারম্ভিক' শিরোনামে একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। নিচে সেই ভূমিকাটি পুনর্মুদ্রিত হলো। 'প্রারম্ভিক'-এ যদিও বিনয় মজুমদার ঘোষণা করেন যে 'কবিতার সংখ্যা আর বাড়ানো হবে না। কাব্যের নামও আর পরিবর্তিত করা হবে না।' পরবর্তীকালে বিনয় কবিতার সংখ্যা কমিয়ে ছিলেন এবং কাব্যের নামও পরিবর্তিত করেছিলেন। তাছাড়া, এই ভূমিকায় বিনয় 'আমার ঈশ্বরীকে' সংস্করণটিকেই এই কাব্যের একমাত্র প্রামাণ্য সংস্করণ হিসেবে ঘোষণা করলেও 'ফিরে এসো, চাকা'র পরবর্তী সংস্করণে 'আমার ঈশ্বরীকে' সংস্করণের পাঠ বর্জন ক'রে 'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণের পাঠকেই তিনি গ্রহণ করেন।

নানা কারণে 'প্রারম্ভিক' নামের এই ভূমিকাটির গুরুত্ব অসীম। 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাবলি বিষয়ে বিনয় নিজে যে কতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী তা এই ভূমিকা প'ড়েই জানা যায়। তাছাড়া 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতা সম্বন্ধে বিনয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদের জানাচ্ছেন : ১। এটি একজন বান্ধবকেন্দ্রিক একটি প্রেমার্তির কাব্য। ২। এটি 'যথাযথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনপঞ্জি' বিশেষ অর্থাৎ এই কবিতাগ্রন্থটি আত্মজীবনীমূলক। ৩। এই কবিতাগ্রন্থটি একটি বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রচনা করা হয়েছে। ফলে যদিও এই কবিতাগ্রন্থে কবি তাঁর প্রেমার্তিকেই প্রকাশ করেছেন তবু তাঁর দাবি : 'যে-কোনো পাঠক কিম্বা পাঠিকার জীবনের যে-কোনো পরিস্থিতির সফল রূপায়ণ এ-কাব্যে খুঁজে পাবার কথা।' সন্দেহ নেই যে এ-দাবি খুবই বড়ো দাবি। কিন্তু এ-কথা মানতেই হবে যে কাঙ্ক্ষিতের বা পরমের সঙ্গে মানুষের চিরকালীন বিচ্ছেদের বেদনাকে বিনয় এই কবিতাগ্রন্থে যে-ভাবে প্রকাশ করেছেন, তা মানবপ্রজ্ঞার শীর্ষতম স্তরকে স্পর্শ করেছে।

কোনো বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করার ব্যাপারটা আমাদের বেশ অবাক করে। কিন্তু বিনয় তাঁর নিজস্ব কবিতাতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ক'রে তাঁর তত্ত্বের সত্যতাকেই প্রমাণ করেছেন। বলাই বাহুল্য যে এ-কাজ বিনয়ের মতো প্রতিভার দ্বারাই সম্ভব। বিনয় তাঁর কবিতাতত্ত্ব তাঁর 'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ'তে প্রকাশ করেছেন। (দ্র. ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, প্রতিভাস, ১৯৯৫)

।।প্রারম্ভিক।।

একজন বান্ধবকেন্দ্রিক এই শুধুমাত্র প্রেমার্তির কাব্যখানি যথাযথ দিনপঞ্জি বিশেষ। তবে বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রচনা করার ফলে কাব্যের অন্তর্গত সংখ্যাত প্রতিটি অংশ যে-কোনো পাঠক কিম্বা পাঠিকার নিজেরই জীবনের কোনো পরিস্থিতির বিশ্লিষ্ট রূপায়ণ ব'লে মনে হবার কথা। সেই উদ্দেশ্য মনে রেখেই প্রতিটি সংখ্যাত অংশ রচনা করা হয়েছে।

আবার যে-হেতু যে-কোনো একটি মাত্র অংশই প্রেম, সমাজনীতি, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের সঙ্গে বিজড়িত পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য সেহেতু যে-কোনো পাঠক কিম্বা পাঠিকার জীবনের যে-কোনো পরিস্থিতিরই সফল রূপায়ণ এ-কাব্যে খুঁজে পাবার কথা। আমরা যে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে স্বপ্ন দেখি (দৃশ্যর পর দৃশ্যের সমন্বয়ে) সেই পদ্ধতিতে কাব্যখানি এবং কাব্যের অন্তর্গত প্রত্যেক সংখ্যাত অংশ রচনা করা হয়েছে।

প্রত্যেক সংখ্যাত অংশই এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কবিতা। এবং কালানুক্রমে দিনপঞ্জিরূপে লিখিত কবিতাবলী একযোগে একখানি পূর্ণ কাব্যও। অর্থাৎ যে-কোনো সংখ্যাত অংশই পৃথক ভাবে হ্রস্ব কবিতারূপে বিবেচিত অবস্থায় পাঠ করাও সম্ভব।

শুধু আমার কথা ভাবলে কাব্যখানি কেবল প্রেমার্তির, অন্যদের বিষয়ে ভাবলে যে-কোনো প্রয়োজন নির্বাচিত বিষয়ের।

এই সংকলনে সব সমেত ৭৯টি কবিতা আছে এবং কবিতার সংখ্যা আর বাড়ানো হবে না। কাব্যের নামও আর পরিবর্তিত করা হবে না।

এই তৃতীয় সংস্করণই এ-কাব্যের একমাত্র প্রামাণ্য সংস্করণ। স্থান সংকুলান হলে ভবিষ্যতে মুদ্রণকালে বই-এর এক পৃষ্ঠায় একটি ক'রে সংখ্যাত অংশ ছাপা যেতে পারে।

৫ই জুন, ১৯৬৪ বিনয় মজুমদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট—চ

'আমার ঈশ্বরীকে' থেকে ছ'টি কবিতা

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থে এমন ছটি কবিতা আছে যা 'ফিরে এসো, চাকা'র 'আমার ঈশ্বরীকে'র পরবর্তী কোনো সংস্করণে গ্রহণ করা হয়নি। নিচে এই কবিতাগুলি দেওয়া হলো। রচনাগুলির নিচে রচনাকাল উল্লেখ করা হয়েছে।

এই কবিতাগুলি কেন 'ফিরে এসো, চাকা'র পরবর্তী সংস্করণগুলিতে গ্রহণ করা হয়নি—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে বিনয় মজুমদার আমাকে জানিয়েছেন :

"মূল বই 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণই মূল লেখা। এই কথাই আসল। ... 'ফিরে এসো, চাকা' বইটি পুরোটাই গায়ত্রী চক্রবর্তীকে আমার বক্তব্য। সুতরাং এই বইয়ে পরে লেখা কবিতা যোগ করার প্রশ্নই ওঠে না।"

উল্লেখ করা দরকার এখানে "মূল বই 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণ" বলতে গ্রন্থজগৎ সংস্করণের 'ফিরে এসো, চাকা'র কথাই বলা হচ্ছে যদিও 'আমার ঈশ্বরীকে'র আখ্যাপত্রে 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থটিকে 'ফিরে এসো চাকা'র প্রথম সংস্করণ ব'লে বিনয় মজুমদার উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থপরিচয় বিভাগ দ্রষ্টব্য।

১

স্বপ্নের সুযোগে তুমি দিয়েছিলে সবকিছু—সব
সমাজবন্ধের ঊর্দ্ধে তোমাকেই অনুভব ক'রে
প্রিয় বাষ্পময় রূপে নিজেকে করেছি অনুভব,
আবার বিশাল রৌদ্রে মনোলীনা হয়ে গেছো ভোরে।
এই যে মুহূর্ত, এই কান্না, গীতি অমেয় তৃষ্ণার
অমেয় আকাঙ্ক্ষা থেকে কত দিন কত কাল ব্যাপী
রচনা করেছি তা তো আমি জানি, স্বপ্নের নীলিমা।
উদ্দাম তড়িতাহত শিশির মধুও হয়ে যায়,
কুসুমের অভ্যন্তরে মধু হয়ে শান্ত হতে পারে।
সেহেতু নিদ্রার প্রতি শরীরের, হৃদয়ে আর
অন্যবিধ বিষয়ের, ব্যাপারের সুনিদ্রার প্রতি
এখনো শিথিল প্রীতি আমাদের হৃদয়ে রয়েছে।
এইভাবে যেন থাকে, যেন কোনো ভূগর্ভযুগীয়
অন্ধকারও নিভে গেলে সুনিদ্রায় শূন্যায়িত হই।
১৯.১২.৬৩

২

এইভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যৎ ডাকে,
ডাক দিয়ে যায় সব সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়, জীবন
নির্ভুলতা, যুগ যুগ এইভাবে প্রিয় প্রার্থিতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচন হয়ে থাকে—স্বপ্ন এসে ব'লে দিয়ে যায়,
সুনির্দেশ দিয়ে যায়, আমাদের স্নিগ্ধ, স্থির করে।
করবী, করবী তুমি কালরাত্রে .... রাত্রিতে তোমাকে
অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে না-পেলেও সিক্ত হয়ে গেছি।
মৃদু পায়ে চলমানা ছায়াময়ী কোমল স্বপ্নের
প্রলেপ প্রার্থনা করি, তাই আরো—আরো ঘুম চাই।
রূঢ়তা ও কর্কশতা তরল সুস্বাদু ক'রে নিয়ে
অবচেতনার গান গেয়ে যাও মিলনবশত।
অজ্ঞতা, দোলায়মান বিমূঢ়তা থেকে নির্দিষ্টতা
স্বপ্ন, তুমি দিতে পারো, বাস্তব আলোক না-জ্বেলেও
সমাজের অগোচরে প্রকৃত আলোকে নিয়ে যাও।
১৯.১২.৬৩

৩

শুনেছো, স্বপ্নের মাঝে আমাদের অতৃপ্তিরা আসে।
অথচ অধিকতর তত্ত্ব আছে, চিন্তা রয়ে গেছে।
সে-সব জটিলতর সমস্যার অনায়াসলীন
সমাধান কোনোদিন চেতনায় না-পেয়ে থেমেছি,
কষ্ট পেয়ে গেছি, তার সমাধান অবচেতনায়
হলে সেই বিষয়ের স্বপ্ন দেখি, সাধ পূর্ণ হয়;
বোঝা যায় সমস্যার সমাধান অবচেতনায়
হয়ে গেছে, চেতনায় সত্বর সঞ্চার লাভ ক'রে
সব ব'লে দিয়ে যাবে ; অন্ধকার, বিষয়, সময়
এই ভাবে স্থিরীকৃত হয়ে থাকে, তবুও তোমার
শিল্পময় সব অঙ্গ, অঙ্গাঙ্গী যমক বাস্তবের
মতো স্পষ্ট পেতে হলে বাস্তবের অভিজ্ঞতা চাই
না-হলে যথা সময়ে সব কিছু অন্তর্হিত হয়।
অদ্ভুত ধোঁয়ার মাঝে মিশে যায় বদ্বীপ, দোলন
তাহলেও তৃপ্তি আছে, সর্বশেষ তৃপ্তি পাওয়া যায়।
১৯.১২.৬৩

৪

বহু সম্ভাব্যতা দেখি, দেখি দুটি আপ্লুত নয়ন
প্রাণে ছায়াপাত ক'রে অতীন্দ্রিয় সারসের মতো
মৃদু পায়ে হেঁটে যাও সম্মুখের সুস্পষ্ট প্রসারে।
উত্তোলন পটীয়সী, মাঝে মাঝে কেয়ারির ধারে
উদ্‌গত চুম্বন হয়ে রোমাঞ্চ বিস্তার ভালোবাসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো শ্রাবণা ঘিরে, কখনো কৃত্তিকা ঘিরে ঘিরে
পার্থিব বয়সগুলি নিঃশ্বসিত সদা নিঃশ্বসিত—
'যদি কোনোদিন তারা পূর্ণতার অবকাশ দিতো।'
তাদের পশ্চাৎ আছে, প'ড়ে আছে অনেক সম্মুখ।
অথচ মসৃণ ভাবে সেতু রচনার সুপ্রয়াসে
বাধা আসে, বাধা আসে, অবিরাম বাধা এসে পড়ে,
যেহেতু পার্শ্বও আছে, সকলের পরিপার্শ্ব আছে।
তবু দেখা যায় কিছু পিছে ফেলে বিজয়িনী হয়
সক্রিয় মহিলাগণ—পরিপার্শ্বে মহিলানিচয়।
২৯.১.৬৪

৫

বিষণ্ণতা, অতি স্পষ্ট ভবিষ্যৎ প'ড়ে আছে আজ,
পৃথিবীতে স্বাদোত্তীর্ণ জীবন সম্ভবপর নয়।
সম্মুখে তাকালে দেখি স্বাদহীন বর্তনশীলতা—
নিরর্থক, প্রতিরুদ্ধ বর্তনশীলতা প'ড়ে আছে।
পাথরের প্রতি চেয়ে বোঝা যায় তার এ-সকল
ব্যথা নেই, ক্ষোভ নেই, পৃথিবীর পাখিদের শিরে
প্রাপ্ত বোধসমূহের সংশ্লেষণজাত কোনো রূপ
সুকল্পনা কোনোদিন জন্মলাভ করে না, অর্থাৎ
অতৃপ্তির হাহাকার তাদের হৃদয়ে বেশি নেই।
পাথরের পাখিদের থেকে সব মানুষের মন
পরিক্রমা ক'রে তবে আমার হৃদয়ে আসা যায়।
ফলে বুঝি, নেই, নেই, মানবীর মনে নেই এত
দিগন্তময়তা, আলো, পথে নেই হিংসাজাত বাধা,
তাই শুধু আমাদের প্রাণে বাজে আমাদের কথা।
৩১.১.৬৪

৬

বহুতর আয় আজ মানুষের চতুষ্পার্শ্বময়।
বহুতর আয় যেন জনপ্রিয় রূপে জ'মে গেছে
তবু কী গোপন এক অপব্যয় স্পৃহা অবশেষে
আবিষ্কৃত হয়ে গেলো, অনিঃশেষ, বিনষ্টীকরণ
প্রতি মানুষের মনে, স্বভাবে দুরপনেয়ভাবে
ওতপ্রোত ভাবে আছে, জীবনেরই বিনষ্টীকরণ।
আলোকেরও চেয়ে বেশি কালিমায় লুক্কায়িত লোভে
শিখা যেন প্রজ্জ্বলিত হতে চায়, প্রজ্জ্বলিত হয়।
প্রিয়তমা, এই জ্ঞানে চতুর্দিক উদ্ভাসিত আজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিক্ষোভময়তা ক্রমে পৃথিবীতে ভয়াবহ ভাবে
বৃদ্ধি ক'রে দিতে হলো, কোনো এক অগ্রগমনের
ভূমিকা স্বরূপ ক'রে, কোনো কালে কিছু স্বচ্ছ হবে
প্রথম প্রণয় চেষ্টা, পারিবারিকতা, তবে আজ
মূক ও বধিরগুলি চ'লে গেলো কেমন নীরবে।
৮.২.৬৪

পরিশিষ্ট—ছ

'আমার ঈশ্বরীকে' থেকে আরও একটি কবিতা

দেবকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত 'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণের পাঠ অল্পস্বল্প পরিবর্তনসহ 'ফিরে, এসো, চাকা'র অরুণা সংস্করণে পুনমুর্দ্রিত হয়েছে, অরুণা সংস্করণই এখন বাজারে প্রচলিত। 'ফিরে এসো, চাকা'র 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশিত সংস্করণে বা 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে গৃহীত 'আমার ঈশ্বরীকে'র পাঠেও বিনয় বিভিন্ন কবিতায় নানা পরবর্তন ঘটান যদিও এই পরিবর্তনগুলি পরবর্তী কালে তিনি বাতিল ক'রে দেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য পাঠককে 'গ্রন্থ-পরিচয়' বিভাগটি পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

কিন্তু 'ফিরে এসো, চাকা'র ৩৬ সংখ্যক কবিতায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে 'আমার ঈশ্বরীকে' সংস্করণের পাঠে। কবিতাটির প্রথম পঙ্‌ক্তিটি হলো : ধূসর জীবনানন্দ, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে। কবিতাটি স্পষ্টতই জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে লেখা। কিন্তু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, জীবনানন্দ সম্পর্কিত এই অনবদ্য কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'র মূল সুরের সঙ্গে মেলে না। 'ফিরে এসো, চাকা'র মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কিত লেখাটি কীভাবে জায়গা পেলো এই প্রশ্ন আমি নিজেকে বহু বার করেছি। এই কবিতাটির 'আমার ঈশ্বরীকে' সংস্করণের পাঠটিকেই আমার অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে, হয়তোবা 'আমার ঈশ্বরীকে'র পাঠটিই মূল পাঠ ; এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ভাবে কিছু জানি না। এই পাঠভেদের বিষয়ে উল্লেখপঞ্জীতে আলোচনা করা হয়েছে। তবু গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করায় 'ধূসর জীবনানন্দ তোমার প্রথম বিস্ফোরণে' কবিতাটির 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থে গৃহীত পাঠ নিচে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হলো। বিনয় এই কবিতায় তাঁর জীবন, জগৎকে পর্যবেক্ষণ করার তাঁর অতি নিজস্ব পদ্ধতি ('একই রূপ বিভিন্ন আলোকে' দ্যাখা), তাঁর কবিতা বিষয়ে দুধরনের পাঠকের (একদল 'চিল' এবং আর একদল 'পারাবত') ধারণা—ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করেছেন নানা প্রতীকের মাধ্যমে। বিনয় তাঁর নিজের জীবন ও কবিতা বিষয়ে নিজে কী ভাবেন তা জানার জন্যে এই কবিতাটির মর্মগ্রহণ অপরিহার্য।

ধূসর, ধূসরতর, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে
কতিপয় চিল শুধু বলেছিলো, 'এই জন্মদিন।'
এবং গণনাতীত পারাবত মেঘের স্বরূপ
দর্শনে বিফল ব'লে ভেবেছিলো, অক্ষমের গান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংশয়ে সন্দেহে দুলে, একই রূপ বিভিন্ন আলোকে
দেখে দেখে জিজ্ঞাসায় জীর্ণ হয়ে তুমি অবশেষে
একদিন সচেতন হরীতকী ফলের মতোন
ঝ'রে গেলে অকস্মাৎ, শুধু ভবিষ্যৎ হেসে ওঠে।

এখন সকলে বোঝে, মেঘমালা ভিতরে জটিল
পুঞ্জীভূত বাষ্পময়, তবুও দৃশ্যত শান্ত, শ্বেত,
বৃষ্টির নিমিত্ত ছিলো, এখনো রয়েছে, চিরকাল
রয়ে যাবে ; সঙ্গোপন লিপ্সাময়ী, কম্পিত প্রেমিকা—
তোমার কবিতা, কাব্য ; সংশয়ে সন্দেহে দুলে দুলে
তুমি নিজে ঝ'রে গেছো, শুধু ভবিষ্যৎ হেসে ওঠে।

পরিশিষ্ট—জ

বিনয় মজুমদার সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞাপন

জ্যোতির্ময় দত্তের লেখা নিচের বিজ্ঞাপনটি সাহিত্য রচনা হিসেবেও উৎকৃষ্ট। বাংলা ভাষায় কোনো কাব্যগ্রন্থের জন্য এর চেয়ে ভালো বিজ্ঞাপন দীর্ঘদিন রচিত হয়নি।

বিজ্ঞাপনটির শেষ পঙ্‌ক্তিতে লেখা হয়েছে 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা যন্ত্রস্থ'। 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' কিন্তু কোলকাতা সংস্করণে প্রকাশিত হয়নি। এটির প্রকাশক অরুণা বাগচী। বিস্তৃত তথ্যের জন্য গ্রন্থপরিচয় বিভাগ দ্রষ্টব্য।

AMARBOI.COM

বিনয় মজুমদার

.....

ফিরে এসো, চাকা

এই কবিতাগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়
সাত বছর আগে। বিশাল পাঠকসমাজ যদিও
এটির অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না, বাংলা কবিতার সবচেয়ে
অগ্রসর পাঠক ও ওয়াকিবহাল পর্যবেক্ষক মহলে 'ফিরে এসো, চাকা'
এই কয় বছরে একটি গুপ্ত ক্লাসিকের স্থান ক'রে নিয়েছিলো। অবশ্য
এমনকি এই সব মহলেও এর খ্যাতির ভিত্তি ছিলো প্রধানত কল্পনা,
জনশ্রুতি ও কবির জীবন-বিষয়ে কিংবদন্তি ; বইটির প্রথম সংস্করণ খুঁটিয়ে
পড়া তো দূরের কথা, এমনকি হাতে ধরার, এমনকি চোখে দেখার
সৌভাগ্যও মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র রসিক, অন্তরঙ্গ, অধ্যবসায়ী ও
অনুসন্ধিৎসু পাঠকের হয়েছে। ফলে, 'ফিরে এসো, চাকা'
গ্রন্থে কেবল এক সংকীর্ণ গোষ্ঠীর ছিলো অধিকার।

বর্তমান কলকাতা-সংস্করণ এই গুপ্ত ও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থটিকে সর্বসমক্ষে
উন্মোচিত করেছে। এবং এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে 'ফিরে এসো, চাকা'
কেবল কোনো ক্ষুদ্র, ভূগর্ভস্থ গোষ্ঠীর গোপন সম্পদ নয়, তা বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার প্রধান ধারারই এক অর্ধচক্রাকার বাঁক। 'ফিরে এসো, চাকা' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কি 'অর্কেস্ট্রা'-র তুল্য গ্রন্থ। এবং এর কবি কেবল জীবিত নন, তিনি বাংলা কবিতার অমরদের একজন।

কলকাতা-সংস্করণে
বিনয় মজুমদার-এর কবিতা গ্রন্থ

ফিরে এসো, চাকা তিন টাকা
অঘ্রানের অনুভূতিমালা যন্ত্রস্থ

পরিশিষ্ট—ঝ

ইংরাজি অনুবাদে 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতা

বুদ্ধদেব বসু এবং জ্যোতির্ময় দত্ত কখনো যৌথভাবে, কখনো এককভাবে 'ফিরে এসো, চাকা'র কিছু কবিতার অনুবাদ করেন। বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদগুলি মূলানুগ হলেও, জ্যোতির্ময় দত্ত অনুবাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিয়েছেন। এই অনুবাদগুলি Poetry India, The Hudson Review, New Writing in India (Penguin books, Edited by Adil Jussawalla, 1974), An Anthology of Bengali Poems (The Macmillan Company of India Ltd., Editor : Buddhadev Bose, 1971) ইত্যাদি পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। নিম্নে এই অনুবাদগুলি দেওয়া হলো। একটি বাদে জ্যোতির্ময় দত্তর অনুবাদগুলি 'কলকাতা দু হাজার' পত্রিকার জানুয়ারি, ১৯৮৬ সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে। 'গ্রামাঞ্চ কি রয়ে গেছে, গ্রামে অন্ধকারে ঘুম ভেঙে'—কবিতাটির অনুবাদ We have visititations still. To wake up in a strange village—নেওয়া হয়েছে New Writing in India থেকে। বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদগুলি নেওয়া হয়েছে An Anthology of Bengali Poems গ্রন্থ থেকে।

বুদ্ধদেব বসু যে-দুটি কবিতার অনুবাদ করেছেন, সে-দুটি কবিতার অনুবাদ জ্যোতির্ময় দত্তও করেছেন। দুজনের করা একই কবিতার অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো যা থেকে পাঠকেরা দুজনের অনুবাদ করার পদ্ধতি বিষয়ে একটি ধারণা গ'ড়ে নিতে পারবেন।

ইংরাজি অনুবাদের আগে প্রতিক্ষেত্রেই অনূদিত কবিতাটির প্রথম পঙ্‌ক্তিটি দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, বুদ্ধদেব বসু এবং জ্যোতির্ময় দত্ত যৌথভাবে 'আমাদের অভিজ্ঞতা সিক্ত গিরিখাতের মতোন' এবং 'আর যদি নাই আসো, ফুটন্ত জলের নভোচারী'—কবিতা দুটি অনুবাদ করেন। কৌতূহলী পাঠক ম্যাকমিলান কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত An Anthology of Bengali Poems গ্রন্থে অনুবাদ দুটির সন্ধান পাবেন। যৌথভাবে অনূদিত এই কবিতা দুটি বর্তমান কাব্যসমগ্রে দেওয়া হয়নি।

জ্যোতির্ময় দত্তের লেখা 'বিনয়কে' প্রবন্ধটিতে (দ্রষ্টব্য : 'যোগসূত্র' জানুয়ারি, ১৯৯৩ সংখ্যা) 'ফিরে এসো, চাকা'র ইংরাজি অনুবাদ বিষয়ে আরোও কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ

কী উৎফুল্ল আশা নিয়ে সকালে জেগেছি সবিনয়ে

With what glad hopes I gently rose this morning.
Radiance of you, preserved like meat in cans
Had illumined the future and far horizen.
In panic I'd thought of sociable tea,
Of taking the air, of winds on mountain heights.
Imaginary like an optical illusion
You seem to be with no address, or perhaps dead, defunct,
Or have you abandoned me like an unlawful son?
I think of life, hair won't sprout again
On the skin when the wound is healed. In sad reflections
My feelings lie at rest like flies at night,
As though just released from hospital.
But sometimes, unknowingly like a sleeping boy's urine,
In wrong places, my feelings will flow.

*

অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতার

Starting from experince I've slowly known you
Like news of the colourless sky. It's because
The air is bluish the sky seems blue by daytime
You hidden in my heart are like the waves
Annulled after the sandy beach has been traced with pictures.
So long I'd thought you too had come to the tryst–
As when transparent clouds race across the moon
We think it's the moon and not the clouds, in motion.
Now much more I know, and yet remains the effort.
I want you simple like baby food,
Liquid and simple, thus things come to bloom.
Seeing the tremors of the limbs of a tree
Have you, like birds, mistaken the tree itself
To be capable of swaying ? In your breeze it sways.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে

THE EXILE OF TREES

Brief flight of bright fish
ended in apparently blue but really clear water.
Did anyone watch this jab into an alien element?
Perhaps the ripening fruit did, which may explain why
it is so excited, flushed up.

But the geese must fly without rest
for everyone knows beneath the feathers
is warm flesh, insulating fat
every stop could be an ambuscade
all watery songs evaporate
and yet, you and you fish of the deep–

Mark those scattered feverish trees
now thickening the air with their wheezy breathing and long sihgs
each tree, each bush, stuck forever in its birthplace
has to suddenly catch its breath and fall silent when flits
the ancient thought of embrace and reunion.

*

মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক স্বল্পকাল হাসে

ON THE TIMIDITY OF STORKS

Quick laughter of light on mirror.
O wise deodar nodding at my classroom window
tell me why is this salt taste of sea on my tongue ?
If this be a message ; from whom?
Why is it whispered, when it could be shouted?
"Reveal unto us thy immense wings, White Mother Bird,
show unto us that this be indeed the promised nest and not
cold ground."
The seas are far more perilous than the firm earth,
not to talk of the dangers of the layers and layers of heavens,
knowing this, men still want to range the skies and seas
for they want to rinse their heads in every fever.

And yet, God of Laughter, O deodar, at our approach
why do real storks have to fly away !

*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্রোতপৃষ্ঠে চূর্ণচূর্ণ লোহিত সূর্যাস্ত ভেসে আছে

EVERY TREE AN ISLAND

Fragments of sunset, jagged glass, has bloodied the river's back
but I still sense strong currents beneath.
Far, far have the wounded fish gone.
Although the park is bright as ever, I am unwanted
I try to stroll not caring but the birds sit with their backs to me
and the tall teak is ill, its once-green head balding fast
its tired breath no longer freshens the air–
but why grieve over the fall of each hair, or leaf.

I know the trees need us for the air they breathe,
as we them, but although the ear is often lulled
there is always this sea of subtle wail–
of is it just the cicadas ? rustling leaves ?–
flowing everywhere, making islands of trees.

*

কাগজকলম নিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকা প্রয়োজন আজ

STRONG SMELL OF MEAT

I have pen and paper but perhaps it is better if I sit still ?
A reassessment seems to be in order, since each mistake
can be explained differently and although every arrangement
may seem complete, the precise relations may be hard to establish.
Man has long visited with an enchanted heart those sorceresses,
the flowers
but he still loves best the smell of meat in the pot.
Wait, fall back. Random, jittery daubs have the power to emerge
into a painting if only the viewer fell back a few paces.

Waste there has been all the time
vast seas go up in clouds and come down in rain
how little of this monsoon churning of sea and sky
is essential for our meek crops ?
The paddy has a slender throat,
the bloated earth soaks up most of it.
But what wonderment, when the mosquito leaves its germinal
puddle
the sound of its flying is not wholly unmusical !

*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনিদ্ররাত্রির পরে মাথায় জড়তা আসে, চোখ জ্ব'লে যায়

DEAR, ABSENT NAMES

After these sleepless nights, the eyes smart and the brain
encloses huge pressures. I clutch my head—a handgrenade !
what hopes make me still sit up
with all these notes and papers on the floor ?

The wind just blows and blows
over the oceans and the windy places
the birds observing this for ages
settled on mere straws for their trellised nests
that sway and yield to the wind.
How long does it take for experience to become wisdom ?
Often at such moments I forget familiar names.
Dear, absent names, how I struggle to get you back
if only I waited a little while longer
they will all perhaps return to me
what relief would descend then, what tensions release
like the plunging of glowing iron in singing water.

*

AMARBOI.COM

সময়ের সঙ্গে এক বাজি ধ'রে পরাস্ত হয়েছি

DELIGHT TURNS INTO ITS OPPOSITE

I have lost this wager, Time wins.
It rained last night, or did I merely
long for it in my sleep?
The rain now lies in pools, mirrors for the sky
to shave off its lather of clouds,
fermenting mosquitoes, flies.

All that was delight and nourishment
in the mouth last night
turns into sordid history this pure dawn
putrefaction in the crevices of the teeth
that no brushing can dislodge.
The blue stone in my ring simmers with unquenchable thirst.
I fear the day of my death will be one like this.

*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের অভিজ্ঞতা সিক্ত গিরিখাতের মতোন

THE LUST OF PINES

Our experience is like these sharp valleys–
limited, sealed off, the mountainsides prickly with pine,
although now the rough ridges and streams
are erased in a general mist.

It is like the cactus tongues of kittens ;
of all the marvellous tastes possible to more polished palate
many surely are beyond a cat's experience,
and yet those that it knows must be sharper,
defiant like the thorns of flowers,
beyond common comprehension, like the gooseflecked sky
bristling with the point of stars.

Across the enormous spaces range the mightly winds
not always in unison for they often clash
which is why there is always a cyclone gathering somewhere
but these clashes cannot distract the pine,
they rear upward in unwavering desire
like-rustgreen lightning striking heavenward
rejoicing in the thunderous kisses of their fickle blue mates.

*

কী উৎফুল্ল আশা নিয়ে সকালে জেগেছি সবিনয়ে

NO HAIR GROWS ON SCARS

With what dazzling hopes I rose from sleep today
Although I wondered if I would dare
to look up from my cup and face the others at morning tea
the thought of the stroll later up the mall, up the hill
to the highest peak with you held me up.
But you have wandered off. Lost. Quite conceivably dead.
You left me on the street like a bastard child,
or may be you never were ? You are a faded mirage.

I think of life ; a wound heals but hair
never grows on the scar. Like ruminative flies lying still at night
my throbs may only be bidding their time
as they did the day of return from hospital.
Occasionally, like a child wetting a strange bed in sleep
the will squirt out unbidden, drenching unfamiliar ground.

*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওনেওনে ছেড়ে দিই, নিজেও সুস্থির পায়ে নামি

SHIPWRECK

I give up counting and myself step in
after the noisy ships have sunk and it is dark and quiet again.
I too had long tried to smile
the facial muscles wrinkled but the gross effect
was only as winning as a dried fruit.
I too was once pained by the sight of fetuses
but I can dissect them now as absentmindedly as a surgeon
Yes, we had our orgies and the inevitable remorse.
morning after dewali is alwasy time for sweeping off the flies and squibs,
enough of remorse now, enough of love,
not the moon, not flowers, nor even women
can flaw this darkness into which I merge.

*

নেই কোনো দৃশ্য নেই, আকাশের সুদূরতা ছাড়া

DROPPED FROM WOMB LIKE A SHOOTING STAR

No, there is nothing left to see except the sky with its distances.
Of all the sun's family only comets have heat
and if the sky be blue the tint is mostly in my yearning eyes
there is only this waiting, this gathering stillness. this silent fall,
all yearning gathered into the pouting mouth of a raindrop
I fall unendingly, with nothing but the sky left to watch over me.

*

আর যদি নাই আসো, ফুটন্ত জলের নভোচারী

THE ABSENCE OF THE BLUE ROSE

If you never come again. never blow through these steaming regions
like cooling drifts of the upper air, even the absence is an encounter
Your absence is as of the blue rose
from the kingdom of flowers. Who knows,
you may yet appear. May be you have, are too close ?
Can I smell my own hair ?
Marvellous sights have been seen.
A full moon was to have risen last night
only a quivering sickle appeared !
It was an eclipes.

*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যাখ্যাত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন

GO AWAY, BUTTERFLIES

Spurned love has in disgust turned inward and contemplative.
Spewing forth lava, the crater raises higher and higher its encircling walls.
So sheer is now my peak that its drink is oxygenpoor air
and it has scant need of the butterflies of the plains.

Go away, silly birds, go away clinging clouds.
I will never again melt in your embrace
I will not visit the heaving seas again
this is better far, rain turned to ice, waves to stone,
contemplation of my sheer walls.

*

অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতার

YOU ARE GONE LIKE MILK INTO A CHILD'S BONES

From appearances I learnt to sift the facts
it is a trick of the eye and the air
the sky by itself is never blue
and you are gone without a stain like a wave
that left passing wrinkles on the sand
yes, I know it is the clouds that drift
and not the skidding moon
and you are clean and effortlessly gone
like milk into a child's bones

birds on swaying branches perhaps think
that branches shake of their own accord
without any tickling by the wind
but I wonder if it crossed your mind
that the lonely trees live in your breath alone.

*

যেন প্রজাপতি ধরা—প্রত্যক্ষ হাতের অতর্কিত

STARS IN AN ECLIPSE

What is needed is a sudden turn
leaving the swift hand that plucks butterflies out of the air
gaping, at a loss.
The others exist pale and ghostly as stars
brought to brief life by a total eclipse of the sun.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

But I cannot change my course now ; can the leopard
unspin its leap in midair ?
Moreover, they may still be wrong. She can yet appear.
Cream rises only if one lets boiling milk stand and cool.

*

সুগভীর মুকুরের প্রতি ভালোবাসার মতোন

LOVE WITHOUT AN IMAGE

These sparkling, peaceful days, these
days of love with a deep mirror !
Dearest, you are as poor and forgetful a mother as fish.
Your spawn have to learn the lessons of living unaided, each alone,
in some dark and unfamiliar reach of the river.
And yet do not rumours of our misadventures reach you ever ?
I however do not sing in the hope of being heard
for this yearning is without an image
like love for the child in womb.
Why cannot I see or touch what is so wholly my own ?
My expectations are excessive, out of nature, like a dyingman's
thought
that all he needs is a drink of water and yet sparkling are these
days
these days of love with a deep mirror !

*

রোমাঞ্চ কি রয়ে গেছে গ্রামে অন্ধকারে ঘুম ভেঙে

We have visitations still. To wake up in a strange village at night
and feel a languid snake glide over one's naked chest,
to be soaked in sweat in awed silence.
O snake, do you know that the rise was another's body ?
Do you care what is happening in my heart ?
Suddenly the white song of wild geese–
prayers to the moon for a little warmth.
he is gone, leaving a changed man.

*

তিন পা পিছনে হেঁটে পদাহত হয়ে ফিরে আসি

YOU THOUGHT IS A COMET

I walk back three paces then hit
by the revelation swing forward
your thought only seemingly far out of the reach of mind

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

like a comet periodically returns.

Darling, I assure you I look forward to growing up
Yes, I have zest for all the jolts, the complexities, like any child.
and though I am tempted by the law of bouyancy,
to lighten my heart by drowning
I assure you I love this new freedom, these complexities.

পরিশিষ্ট—এ

বিনয় মজুমদারের হাতের লেখায় 'ফিরে এসো, চাকা'র একটি কবিতা

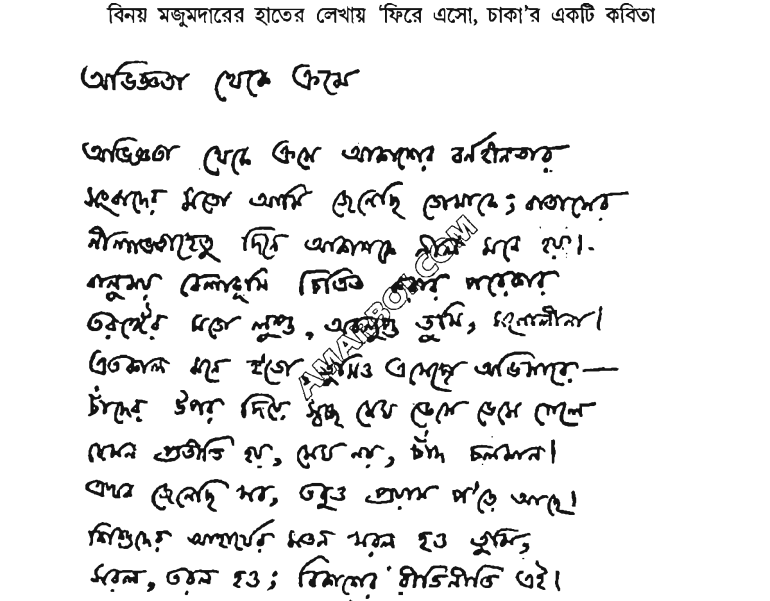

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থ পরিচয়

আত্মপরিচয়

.....

'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধটি প্রথমে প্রকাশিত হয় শৈলেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বেলা অবেলা' পত্রিকায়। পরে শৈলেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে লেখাটি সংকলিত হয়। আত্মপরিচয় গ্রন্থটি 'বেলা অবেলা' প্রকাশন সংস্থা (কোলকাতা—৭০০০৫৩) থেকে প্রকাশিত হয় ফাল্গুন, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে।

বিনয় মজুমদার সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য

১৯৩৪ খৃস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর, (৩১শে ভাদ্র, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ) বার্মায় বিনয় মজুমদারের জন্ম। তাঁর বাবা বিপিনবিহারী মজুমদার এবং মা বিনোদিনী মজুমদার, বর্তমানে এঁরা দুজনেই মৃত। বিনয়ের বাবা বার্মায় কাজ করতেন, সেই কারণে ঐ শহরে তাঁর জীবনের প্রথম আট বছর কাটে। তারপর বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর মহকুমার অধীন তারাইল গ্রামের বাড়িতে তিনি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন। ফরিদপুরের বৌলতলি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে তিনি কিছুদিন পড়াশোনা করেছেন। এখানে ছাত্র থাকাকালীন তেরো বছর বয়েস থেকে তিনি কবিতা লেখা আরম্ভ করেন এবং পূর্বোক্ত স্কুলের ম্যাগাজিনে ১৯৪৭ সালে তাঁর কবিতা প্রথম ছাপা হয়।

বিপিনবিহারী ১৯৪৮ সালে উত্তর ২৪ পরগণার অন্তর্গত ঠাকুরনগরের শিমুলপুর গ্রামে বাড়ি তৈরি ক'রে বসবাস করা আরম্ভ করেন। ফলে বিনয়কেও পশ্চিমবঙ্গে চ'লে আসতে হয়। এই সময় তিনি কোলকাতার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে আই. এস-সি. পাশ ক'রে তিনি শিবপুর বি. ই. কলেজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হন, তাঁর বিষয় ছিলো প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং। বি. ই. কলেজ থেকে ১৯৫৭ সালে প্রথম শ্রেণীতে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। 'বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অ্যানুয়াল সিলভার জুবিলি নাম্বার' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তিনিই হচ্ছেন বি. ই. কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। এ-সবের মধ্যেই তাঁর কবিতা রচনা অবিরতভাবে চলেছে। এই সময় তাঁর সঙ্গে অগ্রজ কবি বিষ্ণু দে ও বিমলচন্দ্র ঘোষের আলাপ হয়।

বি. ই. কলেজে পড়ার সময়েই বিনয় খুব ভালোভাবে রুশ ভাষা শেখেন এবং রুশ ভাষা থেকে পাঁচটি বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। রুশ ভাষা থেকে তিনি বহু গল্প এবং কবিতাও বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এর মধ্যে 'জনসেবক' পত্রিকায় প্রকাশিত চেকভ এর 'ডাক্তার' গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর বিনয় প্রথম চাকরি করেন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফ্ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ-এ। এই চাকরি ছেড়ে তিনি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট-এ ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দেন। এরপর তিনি ত্রিপুরার গভর্মেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনার কাজ করেন। তাঁর চতুর্থ ও শেষ চাকরি দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট-এ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। কিন্তু এই চাকরিটিও তিনি কিছুদিন করার পর ছেড়ে দেন। দুর্গাপুরে চাকরি করার সময়েই বিনয় 'ফিরে এসো, চাকা' রচনা সমাপ্ত করেন। এক সাক্ষাৎকারে বিনয় জানিয়েছেন : 'প্রথম চাকরিটা না ছাড়লেই ভালো হতো বোধ হয়—চাকরিটাও চালাতাম, টুকটাক কবিতাও লিখতাম—বেশ চ'লে যেতো। কী যে হলো—এলোমেলো হয়ে গেলো সমস্ত কিছু।' (দ্রষ্টব্য : 'কবিতীর্থ' পত্রিকা, অক্টোবর, ১৯৮৬)

কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে বিনয় গণিতশাস্ত্রেরও চর্চা করেছেন। গণিতশাস্ত্রের ওপর তিনি তিনটি বই লিখেছেন যদিও তিনটি বই-ই এখনো পর্যন্ত অপ্রকাশিত।

বিনয় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছেন। গভীর দার্শনিক অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন 'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ' কাব্যতত্ত্বের ওপর লেখা তাঁর একটি অসাধারণ রচনা। 'আমার ছন্দ' তাঁর লেখা আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

জটিল এক মানসিক ব্যাধির দ্বারা বিনয় মাঝে-মাঝেই আক্রান্ত হন। ১৯৬৭ সাল নাগাদ তিনি বিনা পাশপোর্টে বাংলাদেশে যান এবং সে দেশের পুলিশ স্টেশনে গিয়ে স্বেচ্ছায় ধরা দেন। এর ফলে বিচারাধীন বন্দী হিসেবে তাঁকে বাংলাদেশের জেলে ছ'মাস কাটাতে হয়। ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে সরকারী ব্যবস্থাপনায় তিনি কোলকাতা মেডিকেল কলেজের এজরা ওয়ার্ডের ১৯নং বেডে ভর্তি হন। ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আবার অসুস্থ হওয়ার জন্য তাঁকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে হয়।

বিনয় অবিবাহিত। শিমুলপুরের বিশাল বাগান-ঘেরা বাড়িতে তিনি বাস করেন, সম্পূর্ণ একা-একা।

জ্যোতির্ময় দত্তর লেখা 'কবিতার শহিদ : বিনয় মজুমদার' বিনয় মজুমদারের ওপর লেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধ। 'প্যাপিরাস' কর্তৃক প্রকাশিত এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস-সংকলন' দ্বিতীয় খণ্ডে এই প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে।

'অম্লানের অনুভূতিমালা'র পর বিনয়ের এই কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে : বাল্মীকির কবিতা (১৯৭৬), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮১), আমাদের বাগানে (১৯৮৪), আমি এই সভায় (১৯৮৪), এক পংক্তির কবিতা (১৯৮৮)। আমাকেও মনে রেখো (১৯৯৫), আমিই গণিতের শূন্য (১৯৯৬), এখন দ্বিতীয় শৈশবে (১৯৯৯)।

বিনয়ের লেখা আরও চারটি বই হলো : বিনয় মজুমদারের ডায়েরি (১৯৯৪) ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য (১৯৯৫), নির্বাচিত প্রবন্ধ (১৯৯৮) এবং বিনয় মজুমদারের ছোটগল্প (১৯৯৮)।

মূল রুশ ভাষা থেকে বিনয় এই পাঁচটি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন : মানুষ কি করে গুনতে শিখল, অতীতের পৃথিবী, সূর্যগ্রহণ, বায়ুমণ্ডল এবং সেকালের বুখারায়। সম্প্রতি সদরুদ্দিন আইনির আত্মজীবনী 'সেকালের বুখারায়' গ্রন্থটির দ্বিতীয় মুদ্রণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশিত হয়েছে। এই পাঁচটি গ্রন্থের প্রকাশক ন্যাশানাল বুক এজেন্সি। আরেকটি বই 'আপেক্ষিকতার তত্ত্ব' বিনয় ইংরাজি থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই বইটির একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এটিরও প্রকাশক ন্যাশানাল বুক এজেন্সি।

গণিতশাস্ত্রের ওপর লেখা বিনয়ের তিনটি গ্রন্থের নাম হলো : Interpolation Series, Geometrical Analysis and Unital Analysis, Roots of Calculus. এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত এই তিনটি গ্রন্থের টাইপ করা কপি কোলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে।

নক্ষত্রের আলোয়

'নক্ষত্রের আলোয়' প্রথম প্রকাশিত হয় ১লা আশ্বিন ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে। এই গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা এখানে দেওয়া হলো।

'প্রথম প্রকাশ : ১লা আশ্বিন, ১৩৬৫/প্রকাশক : দেবকুমার বসু গ্রন্থজগৎ, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কোলকাতা—১২ / প্রচ্ছদ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায় / মুদ্রণ : সুশীল কুমার ঘোষ; মা মঙ্গল চণ্ডী প্রেস, ১৪বি শঙ্কর ঘোষ লেন, কোলকাতা-৬ / দাম : ১ টাকা'

এই গ্রন্থে কোনো উৎসর্গপত্র নেই।

'নক্ষত্রের আলোয়' বিনয় মজুমদারের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' (পরে এই গ্রন্থটি বিষয়ে লেখা হয়েছে) গ্রন্থে 'নক্ষত্রের আলোয়' থেকে ৭ খানি কবিতা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ৭ খানি কবিতা হলো—১) উন্মোচনের গান, ২) নক্ষত্রের আলোয়, ৩) কতো রূপকথা, ৪) রৌদ্রে, ৫) তোমার দিকে, ৬) এই আকাঙ্ক্ষা, এবং ৭) আকাশের এই।

'ঈশ্বরী কবিতাবলী'তে গৃহীত এই সাতখানি কবিতার মধ্যে 'কতো রূপকথা', 'রৌদ্রে' এবং 'তোমার দিকে'—এই তিনখানি কবিতায় কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। নিচে সেই পরিবর্তনগুলির উল্লেখ করা হলো।

'কতো রূপকথা' কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে হয়েছে : ভিজে অন্ধকারে ব'সে দুইজনে সেইসব রূপকথা বলি।

'রৌদ্রে' কবিতার 'একটি মানুষ আর মানুষের জীবনের হৃদয়ের অপরূপ পরিপূরকতা' এবং 'মনে ক'রে কোনোদিন ডাকবে না সে কি কোনো মানুষকে—নেবে নাকি বেছে?' পঙ্‌ক্তি দুটি 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে হয়েছে যথাক্রমে : 'একটি দেবীর আর দেবতার জীবনের হৃদয়ের অপরূপ পরিপূরকতা' এবং 'মনে ক'রে কোনোদিন ডাকবে না সে কি তবে, নেবে নাকি বেছে?'

'তোমার দিকে' কবিতার 'এখনো খুঁজে পাইনি তার আকাঙ্ক্ষার লোক / করুণ এক প্রতীক্ষায় শরীর ইন্ধন' এবং 'তোমার চোখে, শরীরে মনে অজ্ঞতার জের / হয়তো দেবে ব্যর্থ ক'রে সমুদ্রের শ্বাস' 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে যথাক্রমে : 'জড়িয়ে আছে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার লোক / বিভোর দেহে বিভোর মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভোর বন্ধন' এবং 'তোমার চোখে, শরীরে, মনে প্রেয়সী, দেখি ফের / মিষ্টতায় ঝঞ্ঝায়িত সমুদ্রের শ্বাস'। এই কবিতার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তবক 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'র পাঠে বর্জন করা হয়েছে।

'পুনর্বসু' (সম্পাদক : স্বপন ঘোষ। প্যাটেলনগর ভাষা মহম্মদ বাজার, বীরভূম থেকে প্রকাশিত।) পত্রিকার শরৎ-হেমন্ত সংখ্যায় (এই সংখ্যাটিতে পত্রিকাটি প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করা হয়নি) প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বিনয় বলেছেন যে 'আর শুনায়োনা' কবিতাটি আলেকজান্ডার সের্গিয়েভিচ পুশকিনের (১৭৯৯-১৮৩৭) একটি কবিতার অনুবাদ। বিনয় মূল কবিতার জর্জিয়াকে পাল্টে করেছেন সিংহল।

গায়ত্রীকে

'গায়ত্রীকে'র প্রথম সংস্করণ থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যায় নিচে তা উল্লেখ করা হলো।

প্রথম প্রকাশ : ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৬৭ ; মার্চ, ১৯৬১ / প্রকাশক : দেবকুমার বসু, গ্রন্থজগৎ, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা—১২ / মুদ্রাকর : নির্মলকৃষ্ণ পাল, নির্মল মুদ্রণ, ৮ ব্রজদুলাল স্ট্রিট, কোলকাতা—৬ / মূল্য— ০.৭৫ টাকা।

এই গ্রন্থেও কোনো উৎসর্গ-পত্র নেই।

লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের ১০তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয়। পুনর্মুদ্রণের তারিখ ৮ আষাঢ়, ১৩৯৫ ; ২৩ জুন, ১৯৮৮ এবং প্রকাশক ঃ বুলবুল দত্ত, আদ্যি, ১৮/এম ট্যামার লেন, কোলকাতা-৭০০০০৯।

'গায়ত্রীকে' গ্রন্থটি বর্তমান 'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের নাম। 'গায়ত্রীকে'র কয়েকটি কবিতা 'ফিরে এসো, চাকা'য় সরাসরি গ্রহণ করা হয়েছে, কিছু কবিতা গ্রহণ করা হয়েছে পরিমার্জনার পরে, কিছু কবিতা বাদ দেওয়া হয়েছে। বই দুটি পড়লেই এ-সব জানা যাবে। এই গ্রহণ ও পরিমার্জনার বিষয়টি, তথাপি, নিচে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হলো।

'গায়ত্রীকে'র প্রথম কবিতাটিই 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম কবিতা, পরিবর্তন করা হয়েছে কেবল ১৩ নম্বর পঙ্‌ক্তিতে। 'ক্লান্ত ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে আলোড়িত করে' পঙ্‌ক্তিটি 'ফিরে এসো, চাকা'য় হয়েছে ; 'দীর্ঘ দীর্ঘ ক্লান্তশ্বাসে আলোড়িত করে'। স্তবক বিন্যাসের পরিবর্তন লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'য় পরিমার্জিনা ছাড়াই গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রেও স্তবক বিন্যাসের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়।

তৃতীয় কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'র ৩ নম্বর কবিতা, কেবল প্রথম দুটি লাইন বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তৃতীয় লাইনের শুরুতে 'শিশুকালে' শব্দটি যোগ করা হয়েছে ; 'গায়ত্রীকে'র মতো এখানে কবিতাটিকে স্তবকে বিন্যস্ত করা হয়নি।

চতুর্থ কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'র ৭ নম্বর কবিতা। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্তবক বিন্যাসে পরিবর্তন করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'র ৬ নম্বর কবিতা, 'গায়ত্রীকে'র মতো এক্ষেত্রে কবিতাটি স্তবকে বিন্যস্ত করা হয়নি। এই কবিতাটির ৭ ও ৮ নম্বর লাইন দুটি 'ফিরে এসো, চাকা'য় বর্জন করা হয়েছে এবং ৯ নম্বর লাইনের 'অতিস্থূল অর্থহীন' পালটে 'অর্থহীন অতিস্থূল' করা হয়েছে।

সপ্তম কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা'র ২৫ নম্বর কবিতাটির মিল লক্ষ্যণীয়।

নবম কবিতাটির সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা'র ১৮ নম্বর কবিতাটির মিল লক্ষ্যণীয়।

একাদশ সংখ্যক কবিতাটির সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা'র ১৯ নম্বর কবিতাটির মিল লক্ষ্যণীয়।

দ্বাদশ সংখ্যক কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকের সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা'র ২৩ নম্বর কবিতাটির মিল লক্ষ্যণীয়।

ত্রয়োদশ সংখ্যক কবিতাটির সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা'র ২২ নম্বর কবিতাটির প্রচুর মিল রয়েছে।

চতুর্দশ সংখ্যক কবিতাটির ৭ নম্বর ও ৮ নম্বর পঙ্‌ক্তিই 'ফিরে এসো, চাকা'র অবিস্মরণীয় 'অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতার' (২১ নম্বর কবিতা) কবিতাটির বীজ।

'গায়ত্রীকে' পুস্তিকাটির নামকরণ প্রসঙ্গে বিনয় মজুমদার আমাকে লিখেছেন : 'গায়ত্রী চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তো এবং ১৯৬০ কি ১৯৬১ খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজিতে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথমা হয়ে পাশ করেছিলো। সে-ই আমার কবিতা বুঝতে পারবে ভেবে তাকেই উদ্দেশ্য ক'রে 'গায়ত্রীকে' বইখানি লেখা। সেইহেতু বই-এর নাম 'গায়ত্রীকে' রেখেছিলাম।

AMARBOI.COM

ফিরে এসো, চাকা

'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থটি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে। 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণের নাম 'গায়ত্রীকে'। 'গায়ত্রীকে' পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত হয়ে 'ফিরে এসো, চাকা' নামে প্রকাশিত হয় ; প্রকাশ করেন 'গ্রন্থজগৎ' এর শ্রী দেবকুমার বসু, ১৯৬২ খৃস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর। 'ফিরে এসো, চাকা' এরপর 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের ১৩ই জুন। ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের ৩১ জুলাই প্রকাশিত 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে 'আমার ঈশ্বরীকে'র সমস্ত কবিতা পুনর্মুদ্রিত হয়। 'আমার ঈশ্বরীকে' নামটি পালটে আবার 'ফিরে এসো, চাকা' নামে এই গ্রন্থের কোলকাতা সংস্করণ প্রকাশ করেন মীনাক্ষী দত্ত, ১লা মার্চ, ১৯৭০ খৃস্টাব্দে। কোলকাতা সংস্করণের পর 'ফিরে এসো, চাকা'র নাম আর পরিবর্তন করা হয়নি। ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে 'ফিরে এসো, চাকা'র অরুণা সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এই অরুণা সংস্করণই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ১৯৯০ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে। নিচে এই সব বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হলো।

'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণের নাম 'গায়ত্রীকে'। 'গ্রন্থ-পরিচয়' এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গায়ত্রীকে' বিভাগে 'গায়ত্রীকে' প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের কিছু কবিতা গ্রহণ ক'রে, কিছু কবিতার সংস্কার ক'রে, কিছু কবিতা বর্জন ক'রে এবং বহু নতুন কবিতা যোগ ক'রে 'ফিরে এসো, চাকা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ খৃস্টাব্দে, বিনয় মজুমদারের ২৮-তম জন্মদিনে। এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা নিচে দেওয়া হলো :

আখ্যাপত্র : 'ফিরে এসো, চাকা / বিনয় মজুমদার / গ্রন্থজগৎ কোলকাতা—১২'

আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা : 'প্রথম প্রকাশ : ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ / ৩১ ভাদ্র, ১৩৭৯ / প্রকাশক : দেবকুমার বসু / গ্রন্থজগৎ ৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট / কোলকাতা—১২ / প্রচ্ছদ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় / মুদ্রক : শ্রী নির্মলকৃষ্ণ কাঞ্জিলাল / ৮ ব্রজদুলাল স্ট্রিট / কোলকাতা—৬ / দুই টাকা'

গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে : শ্রীমতী গায়ত্রী চক্রবর্তীকে।

'ফিরে এসো, চাকা'র এই সংস্করণে কবিতার সংখ্যা ৭৭।

পরবর্তী সমস্ত আলোচনায় গ্রন্থজগৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'ফিরে এসো, চাকা'র এই সংস্করণটিকে আমরা 'ফিরে এসো, চাকা'র 'গ্রন্থজগৎ সংস্করণ' নামে চিহ্নিত করবো।

এরপর 'ফিরে এসো, চাকা'র তৃতীয় সংস্করণ 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশিত হয়। 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থের আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা নিচে উদ্ধৃত করা হলো :

'কপি রাইট মীনাক্ষী দত্ত / ৪০/১-এ ব্রড স্ট্রিট / কোলকাতা—১৯ / প্রথম সংস্করণের নাম : গায়ত্রীকে / প্রকাশের তারিখ : ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। দ্বিতীয় সংস্করণের নাম : ফিরে এসো, চাকা / প্রকাশের তারিখ : ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ / ৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। বর্তমান তৃতীয় সংস্করণের নাম : আমার ঈশ্বরীকে / প্রকাশের তারিখ : ১৩ই জুন, ১৯৬৪ খৃস্টাব্দ / প্রকাশক : বিনয় মজুমদার / ব্যক্তিগত প্রকাশনী / কোলকাতা-১২ / মুদ্রক : বিভাস গুহঠাকুরতা, ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস / ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, / কোলকাতা—৯ / প্রচ্ছদলিপি : বিনয় মজুমদার। মূল্য : ৩.৩৩ টাকা।'

বইটির উৎসর্গপত্রে লেখা আছে : 'আমার ঈশ্বরীকে'।

পাঠকের কাছে 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থটি তিনটি কারণের জন্য উল্লেখযোগ্য। কারণগুলি হলো : ১. এই গ্রন্থে 'প্রারম্ভিক' শিরোনামে একটি অনবদ্য ভূমিকা আছে যা 'ফিরে এসো, চাকা'র পাঠকের অবশ্যপাঠ্য। বর্তমান 'কাব্যসমগ্র'র পরিশিষ্ট বিভাগে এই ভূমিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। 'ফিরে এসো, চাকা'র পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এই ভূমিকাটি বর্জিত হয়েছে। 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে এই ভূমিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে দু'-একটি লাইন বাদ দিয়ে।

২. এই গ্রন্থে ৬টি নতুন কবিতা আছে যা 'ফিরে এসো, চাকা'র অন্য কোনো সংস্করণে নেই। 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'র 'আমার ঈশ্বরীকে' অংশে অবশ্য এই ৬টি কবিতাই মুদ্রিত হয়েছে।

৩. এই গ্রন্থে বিনয় মজুমদার নানা কবিতায় অল্পবিস্তর পরিমার্জনা করেছেন। নিচে এই পরিমার্জনার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থে কবিতার সংখ্যা ৭৯। 'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ-সংস্করণের ৭৭টি কবিতার ভিতর ৭৩টি কবিতা 'আমার ঈশ্বরীকে'-তে গ্রহণ করা হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়েছে এই চারটি কবিতা : ১. স্বপ্নের আধার তুমি ভেবে দ্যাখো, অধিকৃত দুজন যমজ (৩৮ সংখ্যক কবিতা), ২. চিৎকার আহ্বান নয়, গান গেয়ে ঘুম ভাঙালেও (৭২ সংখ্যক কবিতা), ৩. করবী তরুতে সেই আকাঙ্ক্ষিত গোলাপ ফোটেনি (৭৪ সংখ্যক কবিতা) এবং ৪. আঘাত দেবে তো দাও, আর নেই মৃত স্মৃতিরাশি (৭৬ সংখ্যক কবিতা)।

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থের যে ৬টি কবিতা 'ফিরে এসো চাকা'র অন্য কোনো সংস্করণে নেই, সেই ৬টি কবিতার প্রথম লাইনগুলি হলো : ১. স্বপ্নের সুযোগে তুমি দিয়েছিলে সব কিছু, সব ২. এইভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ,—ভবিষ্যৎ ডাকে ৩. শুনেছো, স্বপ্নের মাঝে আমাদের অতৃপ্তিরা আসে ৪. বহু সম্ভাব্যতা দেখি, দেখি দুটি আপ্লুত নয়ন ৫. বিষণ্ণতা, অতি স্পষ্ট ভবিষ্যৎ প'ড়ে আছে আজ ৬. বহুতর আয় আজ মানুষের চতুষ্পার্শ্বময়।

এই ৬-টি কবিতাই বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

'আমার ঈশ্বরীকে'র পরে 'ফিরে এসো, চাকা'র কোলকাতা-সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কোলকাতা সংস্করণ প্রকাশ করেন মীনাক্ষী দত্ত, ৯ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কোলকাতা-৯ থেকে। প্রকাশের তারিখ : ১লা মার্চ, ১৯৭০ খৃস্টাব্দ, দাম : ৩ টাকা। এই সময়ে বিনয় মজুমদার সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞাপন জ্যোতির্ময় দত্ত রচনা ও প্রকাশ করেন। কোনো কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে এত ভালো বিজ্ঞাপন বাংলা ভাষায় দীর্ঘদিন রচিত হয়নি। বাংলা কবিতার ইতিহাসে এই বিজ্ঞাপনটির কথা সোনার অক্ষরে লিখে রাখা উচিৎ। বর্তমান 'কাব্যসমগ্র'র পরিশিষ্টে এই বিজ্ঞাপনটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

কোলকাতা সংস্করণের 'ফিরে এসো, চাকা'র পাঠে গ্রন্থজগৎ-সংস্করণের 'ফিরে এসো, চাকা'র পাঠ দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে।

এরপর প্রকাশিত হয় 'ফিরে এসো, চাকা'র অরুণা সংস্করণ। প্রথম অরুণা সংস্করণের আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা নিচে দেওয়া হলো :

প্রথম অরুণা সংস্করণ / অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ / প্রকাশিকা / অরুণা বাগচী / ৭ যুগোল কিশোর দাস লেন / কোলকাতা-৬ / প্রচ্ছদপট / পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় / মুদ্রক / দুর্গাপদ ঘোষ / শ্রী অরবিন্দ প্রেস / ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট / কোলকাতা-৬ (C) শ্রী বিনয় মজুমদার

জুলাই ১৯৯০ খৃস্টাব্দে অরুণা সংস্করণ 'ফিরে এসো, চাকা'র দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।

অরুণা সংস্করণের পাঠের সঙ্গে গ্রন্থজগৎ সংস্করণের পাঠে কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

'ফিরে এসো, চাকা'র 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশিত সংস্করণে বিনয় মজুমদার বেশ কিছু কবিতায় অল্পস্বল্প পরিবর্তন করেন। 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থটি ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে পুনর্মুদ্রিত হয় এবং এই সময়েও বিনয় মজুমদার বেশ কিছু কবিতায় পরিবর্তন করেন। গ্রন্থজগৎ সংস্করণ বা কোলকাতা সংস্করণ বা অরুণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্করণের পাঠও সর্বত্র সমান নয়—একথা আগেই বলা হয়েছে। নিচে একটি উল্লেখপঞ্জীতে 'ফিরে এসো, চাকা'র বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হলো। অরুণা সংস্করণের 'ফিরে এসো, চাকা'-ই বাজারে প্রচলিত হওয়ায় এই সংস্করণের পাঠটিকে মূল পাঠ ধ'রে নিয়ে এই উল্লেখপঞ্জীটি প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখপঞ্জীতে শুধুমাত্র পরিবর্তিত / বর্জিত পঙ্‌ক্তি / পঙ্‌ক্তিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করা যাক।

'ফিরে এসো, চাকা'র ১৬ নং কবিতাটির বিষয়ে উল্লেখপঞ্জীতে লেখা হয়েছে : "১৬ নং কবিতার 'সেই কোন্ ভোরবেলা ইটের মতোন চূর্ণ হয়ে' লাইনটি আ. ঈ. ও ঈ. ক তে নেই। এই কবিতার শেষ লাইন : যেন কোনো নিরুদ্দেশে, কটাক্ষের মতো ফেলে রেখে। (আ. ঈ. ও ঈ. ক)'—এখানে বুঝতে হবে 'ফিরে এসো, চাকা'র ১৬নং কবিতার 'সেই কোন্ ভোরবেলা ইটের মতোন চূর্ণ হয়ে' লাইনটি 'আমার ঈশ্বরীকে' ও 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে বর্জন করা হয়েছে এবং শেষ লাইন 'যেন কোনো নিরুদ্দেশে ইটের মতোন ফেলে রেখে' 'আমার ঈশ্বরীকে' ও 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে : 'যেন কোনো নিরুদ্দেশে কটাক্ষের মতো ফেলে রেখে।' কবিতার বাকি অংশ সর্বত্রই এক রকম।

পরিবর্তিত/বর্জিত পঙ্‌ক্তি/পঙ্‌ক্তিগুলির উল্লেখপঞ্জী

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্তগুলি উল্লেখপঞ্জীতে ব্যবহার করা হয়েছে : গ্র. স. = গ্রন্থজগৎ সংস্করণ, আ. ঈ. = আমার ঈশ্বরীকে, ঈ. ক. = ঈশ্বরীর কবিতাবলী, কো. স. = কোলকাতা সংস্করণ।

AMARBOI.COM

কবিতার স্তবক বিন্যাসের ক্ষেত্রে 'ফিরে এসো, চাকা'র বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তবে এই পার্থক্যগুলির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। ছাপার ভুলকে সর্বত্রই অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩নং কবিতার শেষ লাইন : অতি অল্প রমনীতে ক্রোড়পত্র দেওয়া হয়ে থাকে। (আ. ঈ. ও. ঈ. ক.)

৮নং কবিতার ৪নং লাইন : প্রেমিক-প্রেমিকা চায় এই সাধনায় লিপ্ত হতে (আ. ঈ. ও ঈ. ক.) এবং ১২নং লাইন : ক্রমে ক্রমে মুক্তো হয়ে ... (গ্র. স. ও কো. স.)

১৬নং কবিতার 'সেই কোন্ ভোরবেলা ইটের মতোন চূর্ণ হয়ে' লাইনটি অ. ঈ. ও ঈ. ক. তে নেই। এই কবিতার শেষ লাইন : যেন কোনো নিরুদ্দেশে কটাক্ষের মতো ফেলে রেখে (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

১৭নং কবিতার ১১নং লাইন : ... অবশেষে দেখি সুখ নয় ... (ঐ, ঐ)

১৯নং কবিতার তৃতীয় লাইন : ধূমকেতু প্রকৃতই অগ্নিময় ... (গ্র. স. ও কো. স.)

২১নং কবিতায় ৯নং লাইন : এখন জেনেছি বহু ... (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

২২নং কবিতার ৭নং লাইন : সকল জীবন, ফুল, সব কীর্তি, প্রীত কীর্তিগুলি / ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ... (ঐ. ঐ.)

২৩নং কবিতার ৫নং লাইন : ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের লম্ফে শূন্যে দিক পরিবর্তনের (ঐ.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ.) এবং শেষ লাইন : কিছুটা সময় দিলে তবে প্রাণে সর ভেসে ওঠে (ঐ. ঐ.)

২৪নং কবিতার ৫-৬ লাইন : যদিও সংবাদ পাও জ্যোর্তির মাধ্যমে প্রতিদিন, / জেনেছো অন্তরলোক, দূরে থেকে এতেই সান্ত্বনা। (ঈ. ক.)

'জ্যোতির মাধ্যমে' স্পষ্টতই জ্যোতির্ময় দত্তকে ইঙ্গিত করছে।

২৫ নং কবিতার দ্বিতীয় লাইন : তোমার প্রসঙ্গে আসি, অতীতের কীর্তি সহায়ক (ঈ. ক.)

২৬নং কবিতার প্রথম চার লাইন :

তিন পা পিছনে হেঁটে উন্মোচিত হয়ে ফিরে আসি।
আবার তোমার কথা মনে আসে, জ্যোতিষ্কবহুল
আকাশেই এসে দ্রুত চ'লে যাওয়া ধূমকেতু যেন
সর্বদা স্মরণে আসো, প্রেয়সী, পূর্ণাঙ্গ জীবনের (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

৭নং লাইন : উন্মোচিত হয়ে ফিরি, অজ্ঞাত পূর্ণাঙ্গ জীবনের (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

২৭নং কবিতায় ৯নং লাইন : অদর্শনে ম'রে গেছে, বর্তমানে কিছু আলোকিত (ঐ. ঐ.)

এই কবিতার 'বেদনার্ত মোরগের নিদ্রাহীন জীবন ফুরালো' লাইনটি আ. ঈ. ও ঈ. ক. তে বর্জন করা হয়েছে।

১০নং লাইন : জীবনে ব্যর্থতা থাকে, অসম্পূর্ণ সেথমালা থাকে (গ্র. স. ও কো. স.)

২৮নং কবিতার প্রথম লাইন দুটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.তে নেই।

৩০নং কবিতার ৬নং লাইন : ভাবী হলোরার চিত্র, হরিণের মাংসের মতোন (আ. ঈ. ও ঈ. ক.) এবং শেষ দুটি লাইন

তবে গুহাচিত্র হতে তোমার সম্মতি আছে ব'লে
মনে হয়, তুমি—নারী, নিঃসন্দেহে দীর্ঘায়ু, সফল (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

৩১নং কবিতার প্রথম লাইন : বিরহিত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন (ঐ. ঐ.)

চতুর্থ লাইন : এত উচ্চে সমাসীন আজ তার আপন সুরুচি (ঈ. ক.) এত উচ্চে সমাসীন আজ তার আপন শঠতা (গ্র. স. ও কো. স.)

৩৩নং কবিতার দ্বিতীয় লাইন : 'দেহের উপর শীতল ভ্রমের চলা বুঝে' এবং চতুর্থ লাইন : হে ভ্রম, বোঝোনি তুমি, দেহ কিনা, কার দেহ, প্রাণ (ঈ. ক.)

৩৪নং কবিতার ৯-১০ লাইন : যে গেছে সে চ'লে গেছে, অবশেষে কাঠটুকু জ্বলে / আপন অন্তলোকে ... (ঈ. ক.) 'দেশলাইয়ে বিস্ফোরণ হয়ে বারুদ ফুরায় যেন' অংশটি ঈ. ক. তে নেই।

৩৬নং কবিতার প্রথম লাইন : 'ধূসর, ধূসরতর, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে', অষ্টম লাইন : 'ঝ'রে গেলে অকস্মাৎ, শুধু ভবিষ্যৎ হেসে ওঠে' এবং শেষ লাইন : 'তুমি নিজে ঝ'রে গেছো, শুধু ভবিষ্যৎ হেসে ওঠে' (আ. ঈ. ও ঈ. ক.) এই কবিতাটি নিয়ে পরিশিষ্টতে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

৩৮নং কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.তে নেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪১নং কবিতার অষ্টম লাইন : পোড়া ইট, ভগ্নপ্রায় পুতুলের অবয়ব, বুক (গ্র. স. ও কো. স.)

৪২নং কবিতার চতুর্থ লাইন : আমাকে ডাকে না কেউ নিরলস প্রেমের প্রসারে (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

এই কবিতার ৫-৬ লাইন :

পুনরায় বিলম্বিত, এতকাল কুসুমকলিকে
ফোটাতে অক্ষম হয়ে শেষে দেখি কাগজে রচিত। (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

অষ্টম লাইন : খুঁজেছি সংগত হ্রদ, দেশে দেশে, হায় অনাহত (গ্র. স. ও কো. স.)

৪৬নং কবিতার পঞ্চম লাইন : 'বিধ্বস্ত সময়ে, তবে আমারো তো পদদ্বয় আছে' এবং সপ্তম লাইন : নিজের সশস্ত্র শোভা, উলঙ্গ অবস্থা নিয়ে আর (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

৪৭নং কবিতার শেষ লাইন : প্রেমিকা ও প্রেমিকের অভীপ্সার রোমাঞ্চ জানে কি (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)। 'লতারা কী ভাবে বোঝে কাছে কোনো মহীরুহ আছে' লাইনটি আ. ঈ. তে নেই, সম্ভবত ভ্রমবশত বাদ গেছে।

৪৮নং কবিতার 'উৎপাটিত রুগ্ন বৃক্ষ আর কোনো গান গায় না যে / শিকড়ের থেকে তবু নতুন অঙ্কুর অভ্যুদিত'—এই অংশটি এবং 'আমি বৃক্ষ, রোগশয্যা-পরিত্যক্ত টিপয়ের মতো / জীর্ণ ধূলিময় ম্লান। সলিল সমৃদ্ধ সিন্ধু নয়'—এই অংশটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.তে বর্জিত হয়েছে। এই কবিতার দ্বিতীয় লাইন : এমন আগ্রহহীন, চ'লে গেছো পার্কের আশ্রয়ে (গ্র. স. ও কো. স.)

৪৯নং কবিতার প্রথম লাইন : 'একটি বৎসর শুধু লাস্যময়ী অগ্নির সহিত', এবং ৬-৭ লাইন :

মথিত ঐশ্বর্য নিয়ে দেখি কর্বেকার অসুস্থতা
পৃথিবী ঘিরেছে দ্যাখো, উদ্ঘাটিত করেছি নিঃস্বতা (আ. ঈ. ও ঈ. ক.) 'রোগের সময়ে কোনো শুশ্রূষা পাবার বিত্ত নেই' লাইনটি, আ. ঈ. ও ঈ. ক. তে বর্জিত হয়েছে।

৫০নং কবিতার ষষ্ঠ লাইন : মনে নেই গোধূলিতে, সুসঙ্গতি অবশিষ্ট নেই (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

৫১নং কবিতায় অষ্টম লাইন : হৃদয় বেড়ায় বহু ভবনে উদ্যানে নানাক্ষণে (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)। এই কবিতায় শেষ তিনটি লাইন আ. ঈ. ও ঈ. ক.তে নেই। অর্থাৎ কবিতাটি পূর্বোক্ত গ্রন্থদুটিতে অষ্টম লাইনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

৫২নং কবিতার প্রথম লাইন : অতি সফলতা নয়, আকাশের কৃপাপ্রার্থী আমি (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)। চতুর্থ লাইন : নিমন্ত্রণপত্র পাই প্রেরকের ঠিকানাবিহীন (কো. স.)

৫৩নং কবিতার প্রথম লাইন : প্রচেষ্টার সীমা আছে, নিরাশ্রয় রক্তাপ্লুত হাতে (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)।

ষষ্ঠ লাইন : পৃথিবী নিয়ম বশে নির্বিকার, ধূসরতাবৃত (কো. স.)

৫৪নং কবিতার ৫-৬ লাইন :

ঝরে কিছু, ঝরে স্মৃতি, রহস্যনিলীনা অপসৃতা,
আলিঙ্গন থেকে দূরে, আরো দূরে অবরুদ্ধ নীড়ে। (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৫নং কবিতার শেষ লাইন : নিজের সখিকে পেতে, পৃথিবীর কথা সে ভবে না (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

৫৬নং কবিতার ১২নং লাইন : হেঁটেছি সুদীর্ঘ পথ, রক্তাক্ত দুপায়ে (কো. স.)

৫৭নং কবিতার প্রথম লাইন : কোনো যোগাযোগ নেই, সেতু নেই, মিলনাঙ্ক নেই (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

৫৮নং কবিতার ষষ্ঠ লাইন : টীকা ও টিপ্পনীমাত্র, পরিচয় গভীর তোমার (ঐ. ঐ.)

৫৯নং কবিতার দ্বিতীয় লাইন : কেবলই বালুকা ওড়ে, গর্বোন্নত পিপাসা বাড়ায় (ঐ. ঐ.) এবং পঞ্চম লাইন : শুনেছি সভার মাঝে একটি কুসুম ঘ্রাণময় (গ্র. স. ও কো. স.)

৬১নং কবিতার শেষ লাইন : উৎসুক হবে না কেউ চিত্তনীয় দেবতার শবে (আ. ঈ. ও ঈ. ক.) এবং ষষ্ঠ লাইন : তার দুষ্ট ব্যবহারে ; মুহুর্মুহু কাদা, ইতিহাস (কো. স.)

৬২নং কবিতার ১-২ লাইন :

সুস্মিতা গুলিটি মনে বিদ্ধ হয়ে বহুকাল ছিলো
সনাতন মূল কেটে, গবেষণা ক'রে সুস্থ হই। (আ. ঈ. ও. ক.)

৬৬নং কবিতার ৫-৬ লাইন :

বিকৃত করেছে, হায়, পিপীলিকা শ্রেণীতে দুজনে
ব্যথার মতোন হয়ে অনেক হেঁটেছি অন্ধকারে। (ঐ. ঐ.)

এই কবিতার 'আর আমি বারংবার অসফল, ক্ষমতাবিহীন' লাইনটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.তে নেই।

এই কবিতার ১২নং লাইন : সঙ্গিনীর অভ্যন্তরে ক্ষুধার মতোন সঙ্গোপন (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

৬৭নং কবিতার ৩-৪ লাইন :

জ্যোৎস্নার অনুনয়, হায় এই মিলনসন্ধান।
আবৃত দূরত্বময়ী নীহারিকা, ক্লিষ্ট গ্রহগুলি (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

এই কবিতার ৭, ৮ এবং ৯নং লাইনগুলি আ. ঈ. ও ঈ. ক.তে নেই।

৬৯নং কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইন আ. ঈ. ও ঈ. ক. তে নেই।

এই কবিতার ৪-৫ লাইন :

সে শান্তি অমেয় তৃপ্তি আমাদের হৃদয়ে প্রেমের
মূলে আছে, আছে ফলে, মধ্যবর্তী অবকাশে প্রাণ (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

—অর্থাৎ এই কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক. তে শুরু হচ্ছে এভাবে—

তোমাদের কাছে আছে সঙ্গোপন, আশ্চর্য ব-দ্বীপ।
সে শান্তি, অমেয় তৃপ্তি আমাদের হৃদয়ে প্রেমের
মূলে আছে, আছে ফলে, মধ্যবর্তী অবকাশে প্রাণ ...

৭০নং কবিতার প্রথম লাইন : আমার আশ্চর্য ফুল যেন সুকিশোরী, নিমেষেই (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

এই কবিতার ৯-১৩ লাইন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চিরমুগ্ধ হয়ে দৃশ্য দেখি, দেখি জানালায়
আকাশের লালা ঝরে বাতাসের আশ্রয়ে-আশ্রয়ে।
কেন যেন দূরে আছো, ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফুল
হাসি হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।
আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো অবয়বহীন (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

৭১ নং কবিতার প্রথম ও দ্বিতীয় লাইন আ. ঈ. ও ঈ. ক. তে নেই। ঐ দুটি গ্রন্থে কবিতাটি আরম্ভ হচ্ছে : ভালোবাসি পূর্বাহ্ণেই রূপে, ঘ্রাণে রসাপ্লুত হতে। / হয়েছি তো কোনো কালে একবার হীরকের চোখে। ...

সপ্তম লাইন : উদ্বৃত্ত এদের প্রতি তাকাবো উদ্যত বাসনায় (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

৭২নং কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.তে নেই।

৭৩নং কবিতার পঞ্চম লাইন : সুমিষ্ট আহ্বান, ছায়া, মেঘ, ঝঞ্ঝা, সোনালি বিদ্যুৎ (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

৭৪নং কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.তে নেই।

৭৫নং কবিতার ১-২ লাইন :

কবিতা বুঝেছি আমি, অন্ধকারে একটি আশ্রয় / অলৌকিক আলো দেয়, নিরুত্তাপ কোমল আলোক (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

৭নং লাইন :

করবী কুসুমও বলে, লম্বিত গভীর হয়ে গেলে (ঈ. ক.)

১২নং লাইন :

শুয়ে শুয়ে আকাশের অনন্তের স্বাদ পেতে পারি (আ. ঈ. ও ঈ. ক.)

৭৬নং কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.তে নেই।

৭৭নং কবিতার প্রথম দুটি লাইন আ. ঈ. ও ঈ. ক.তে বর্জিত হয়েছে। এই কবিতার ৩-৪ লাইন :

আড়ালে থেকো না, আমি এতদিনে চিনেছি কেবল
অপার ক্ষমতাময় হাতখানি, ক্ষিপ্র হাতখানি। (ঈ. ক.)

শেষ লাইন :

আড়ালে থেকো না আর একা ঘুমোবার সাধ নিয়ে (ঈ. ক.)

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৭৭নং কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.তে শুরু হচ্ছে 'আড়ালে থেকো না আমি, এতদিনে চিনেছি কেবল'—এই লাইনটি দিয়ে।

উল্লেখপঞ্জীটি পড়লে খুব সহজেই বোঝা যাবে যে 'ফিরে এসো, চাকা'র বর্তমান অরুণা সংস্করণের সঙ্গে গ্রন্থজগৎ বা কোলকাতা সংস্করণের উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু 'ফিরে এসো, চাকা'র 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশিত সংস্করণে বা 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে গৃহীত 'আমার ঈশ্বরীকে'র পাঠে যে-সব পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিলো তা যথেষ্ট গুরুতর। এই পরিবর্তনগুলি ক'রে বিনয় মজুমদার 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাবলীর রহস্যময়তাকে খুন করেছিলেন, বড়ো বেশি প্রকাশ্যে এনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলেছিলেন কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা। বলাই বাহুল্য, এই পরিবর্তনগুলির অধিকাংশই প্রীতিপ্রদ হয়নি। খুব সঙ্গত কারণেই বিনয় পরবর্তীকালে এই পরিবর্তনগুলি বাতিল করেন এবং 'ফিরে এসো, চাকা'র কোলকাতা বা অরুণা সংস্করণে আবার গ্রন্থজগৎ-সংস্করণের পাঠ ফিরে আসে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে : কেন বিনয় মজুমদার 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থে এই পরিবর্তনগুলি ঘটিয়েছিলেন? এর উত্তরে বলা যায় : ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অর্থাৎ পূর্বোক্ত পরিবর্তনগুলি করার সময় বিনয় গভীর ও জটিল এক মানসিক সংকটের মধ্যে পড়েন যার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতায় এই পরিবর্তনগুলি ঘ'টে যায়।

তবে অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থে যে-সমস্ত পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিলো তার মধ্যে কয়েকটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রীতিপ্রদ ; যদিও বিনয় পরবর্তীকালে এগুলিকেও বাতিল করেন। এই প্রসঙ্গে আমি ২১ ও ৩৬ সংখ্যক কবিতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ২১ সংখ্যক কবিতার নবম পঙ্‌ক্তির 'এখন জেনেছি সব ...' 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থে হয়েছে : 'এখন জেনেছি বহু ...'। 'বহু' জানা যায়, কিন্তু 'সব' জানা তো অসম্ভব। 'সব' জানার অহমিকা কারুরই থাকা উচিৎ নয়। ৩৬ সংখ্যক কবিতাটির খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থে করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমি পাঠককে এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট-ছ অংশটি পড়তে অনুরোধ করছি।

বর্তমান 'কাব্যসমগ্র'র অন্তর্ভুক্ত 'ফিরে এসো, চাকা'র পাঠ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩বঙ্গাব্দে প্রকাশিত প্রথম অরুণা সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে। কিছু ছাপার ভুল যা দীর্ঘদিন ধ'রে থেকেই যাচ্ছিলো তা বিনয় মজুমদারের পরামর্শ নিয়ে শুধরে দিয়েছি।

'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে বিনয় আমাকে জানিয়েছেন :

'আমার এক বন্ধু ছিলো, নাম সরোজ চক্রবর্তী। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুরে আমার সঙ্গে পড়তো। এক বছর পড়ার পর ইংল্যান্ডে চ'লে যায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। কিন্তু সেখানে পড়া শেষ না-ক'রেই বাড়ি ফিরে আসে বছর দুই ইংল্যান্ডে থেকে। সরোজ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস-সি. পাশ। সুতরাং দেশে ফিরে 'মেটালবক্স' কোম্পানিতে চাকরি পায়। চৌরঙ্গী রোডে 'মেটাল বক্স' কোম্পানির অপিসে গিয়ে দেখি সরোজের দরজায় লেখা : 'সরোজ চাক'। 'চাক' এর স্ত্রী-লিঙ্গ 'চাকা'। গায়ত্রী চক্রবর্তীকেই আমি 'গায়ত্রী চাকা' বানিয়েছি। 'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থটির নামকরণের ইতিহাস এই।'

বলাই বাহুল্য যে 'ফিরে এসো, চাকা'র 'চাকা' আসলে গতির প্রতীক। গতিহীন কবি তাঁর লুপ্তগতি পুনরুদ্ধারের জন্য হাহাকার করছেন : আমি মুগ্ধ, উড়ে গেছো ; ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা'। তবু, 'ফিরে এসো, চাকা'র নামকরণের এই ইতিবৃত্তে আমরা যথেষ্ট কৌতুক বোধ করি।

'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে গায়ত্রী চক্রবর্তীকে। 'গায়ত্রীকে'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্তী সম্বন্ধে বিনয়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। 'কবিতীর্থ' পত্রিকার অক্টোবর, ১৯৮৬ সংখ্যায় 'কোনো গোপনতা নেই' শিরোনামে সমর তালুকদারের নেওয়া বিনয় মজুমদারের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সেই সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ নিচে দেওয়া হলো :

"জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করলো—গায়ত্রীকে কি তুমি ভালোবাসতে ?

—'আরে ধুৎ, আমার সঙ্গে তিন-চার দিনের আলাপ—প্রেসিডেন্সি কলেজের নামকরা সুন্দরী ছাত্রী ছিলেন ইংরাজি সাহিত্যের—তারপর কোথায় চ'লে গেলেন—আমেরিকা না কোথায় ঠিক জানি না।

—তাহলে ওকে নিয়ে কবিতা কেন?

কাউকে নিয়েতো লিখতে হয়। আম গাছ, কাঁটাল গাছ, রজনিগন্ধা নিয়ে কি চিরদিন লেখা যায়?"

'ফিরে এসো, চাকা'র নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থের যে-কোনো সচেতন পাঠকের মনেই খুব স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটি উঁকি মারবে সেটি হলো : 'ফিরে এসো, চাকা' নামটি পালটে 'আমার ঈশ্বরীকে' করার কারণ কী এবং 'ঈশ্বরী' বলতে বিনয় কী বোঝাতে চাইছেন? পাঠকের নিশ্চয়ই খেয়াল আছে যে 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থটি বিনয় উৎসর্গ করেন তাঁর ঈশ্বরীকেই।—এই প্রসঙ্গে 'ঈশ্বরী' বলতে বিনয় নিজে কী বোঝাতে চাইছেন তা আমরা আগে দেখবো। 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দেই বিনয় আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে তাঁর 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থের তিন-তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থটি বিষয়ে বিনয় আমার নানা প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর দিয়েছেন। আমি এখানে বিনয়ের সেই উত্তরের প্রাসঙ্গিক অংশগুলি উদ্ধার করছি।

"ঈশ্বরীর' বইখানা তোমায় ভাবিয়েছে বুঝতে পারছি। 'ঈশ্বরীর' বইখানা যখন লিখি তখন আমি সত্যিই ভাবতাম যে

১) আমি ঈশ্বরীর স্বামী

২) ঈশ্বরীই বইখানা ব'লে দিয়েছে, জানিয়ে দিয়েছে আমার চিত্তাজগতে এবং আমি লিখেছি। 'সেহেতু প্রকৃতপক্ষে এই কাব্য, কবিতাসমূহ ঈশ্বরীর স্বরচিত, আমি তার লিপিকার স্বামী।'—একথাতো বইতে ছাপাই আছে। ...

৩) বইখানার নাম 'ঈশ্বরীর' দেবার দুটো কারণ আছে। একটা কারণ আমি আগেই লিখেছি—'সেহেতু প্রকৃতপক্ষে এই কাব্য, কবিতাসমূহ, ঈশ্বরীর স্বরচিত'। দ্বিতীয় কারণটি গোপনই ছিলো এতকাল। তুমি যে-পরিস্থিতিতে আমার কাছে জানতে চাইছো সে পরিস্থিতিতে তোমাকে জানিয়ে দেওয়াই ভালো। বই-এর মলাটেই ছাপা :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈশ্বরীর

বিনয় মজুমদার

এটিকে তুমি একটি বাক্য হিসেবেই গ্রহণ করো। অর্থাৎ ঈশ্বরীর বিনয় মজুমদার। এটা একটা বাক্য। এটা যে বই-এর নাম সে-কথা আপাতত ভুলে যাও। সাধারণ একটি বাক্য হিসেবেই পড়ো। নামপত্রেও ছাপা বাক্যটি 'ঈশ্বরীর বিনয় মজুমদার' অর্থাৎ বিনয় মজুমদার কার? ঈশ্বরীর। অর্থাৎ আমি তখন এমন আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক অবস্থায় পড়েছিলাম যে আমি ঈশ্বরীর শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছিলাম। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরীর হাতে সমর্পণ করেছিলাম, বাঁচবার জন্য।"

দীর্ঘ এই উদ্ধৃতি একটু মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে বিনয় 'ঈশ্বরী' বলতে কী বোঝাতে চাইছেন তা যেন আমরা বুঝতে পারি। যেন মনে হয়, 'ঈশ্বর' বলতে সাধারণ ভাবে যা বোঝায়, বিনয় 'ঈশ্বরী' বলতে তেমনই কোনো ধারণাকে বোঝাতে চাইছেন। কিন্তু এই মনে হওয়াটা ভুল।

'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে বিনয় মজুমদারের একটি প্রতিকৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। আখ্যাপত্রের পিছনের পাতায় প্রচ্ছদপরিচিতে লেখা হয়েছে : 'প্রচ্ছদচিত্র : ঈশ্বর-ঈশ্বরীর স্বপ্রতিকৃতি / প্রচ্ছদলিপি : বিনয় মজুমদারের (ঈশ্বরঈশ্বরীর) হস্তলিপি। এই প্রচ্ছদ পরিচিতি থেকে একথা জানা যাচ্ছে যে বিনয় তাঁর নিজের আঁকা নিজের ছবিকেই ঈশ্বর-ঈশ্বরীর 'স্বপ্রতিকৃতি' হিসেবে ঘোষণা করছেন এবং তাঁর হাতের লেখাকেই তিনি ভাবছেন ঈশ্বর-ঈশ্বরীর হস্তলিপি ব'লে। 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থ পড়লে দেখতে পাওয়া যাবে বিনয় এই গ্রন্থে নিজেকেই ঈশ্বর ভাবছেন এবং তাঁর অন্বিষ্ট 'ঈশ্বরী'কে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন। এই ধরনের ভাবনাচিন্তার তাৎপর্য দার্শনিক বা মনস্তত্ত্ববিদরাই ব্যাখ্যা করতে পারবেন। নিজেকে ঈশ্বর ভেবে বা ঈশ্বরীকে নিজের মধ্যে কল্পনা ক'রে মহৎ কবিতাও হয়তো রচনা করা যায় কিন্তু 'ঈশ্বরীর' গ্রন্থের কবিতার পর কবিতায় দেখি বিনয় তাঁর নিজেরই মধ্যে কল্পিত ঈশ্বরীর সঙ্গে তাঁর মানস-সঙ্গমের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন : চিন্তার সঙ্কট এলে এইরূপ কথা ভাবা, দৃশ্য ভাবা নিরাপদ, ভালো / তবেই আদর ক'রে ভালোবাসে সময়, আকাশ, অগ্নি, নক্ষত্রের আলো। ('আমি আর করবী কুসুম' কবিতা, ঈশ্বরীর কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত)। দেখা যাচ্ছে, বিনয় তাঁর চিন্তায় সঙ্কট আসার কথা স্বীকার করছেন এবং এই সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে তিনি তাঁর নিজের মধ্যে কল্পিত ঈশ্বরীর সঙ্গে মানস-সঙ্গমে রত হয়েছেন। 'ফিরে এসো, চাকা'র অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন কবির কোনো চিহ্নই 'ঈশ্বরীর' গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যৌন সঙ্গমের এবং শুধুমাত্র যৌন সঙ্গমেরই অনর্গল বর্ণনা থাকার ফলে 'ঈশ্বরীর' গ্রন্থটি একটি অপাঠ্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি পড়লে যে-কোনো সহৃদয় পাঠকেরই মনে হবে, বিনয় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।

'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বিনয় মজুমদারের তরুণ বয়সের পাতাজোড়া ভারি সুন্দর একটি ফটোগ্রাফ আছে। এই ফটোগ্রাফের পিছনে কয়েকটি টেলিফোন রিসিট্-এর ফটোকপির নিচে লেখা আছে : Receipt of telephone calls I made

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

to converse with my goddess-wife। বুঝতে বাকি থাকে না মানসিক বিপর্যয়ের কোন পর্যায়ে বিনয় এই সময়ে ছিলেন। আমার ধারণা, বিনয় মজুমদারের এই মানসিক বিপর্যয়ের কারণ অংশত 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতার মধ্যেই নিহিত। এবং 'ফিরে এসো, চাকা'র মধ্যে বিনয় যে-দার্শনিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করলেই 'ঈশ্বরী' বলতে বিনয় কী বোঝাতে চাইছেন তা জানা যাবে।

'ফিরে এসো, চাকা' বাহ্যত 'প্রেমার্তির কাব্য', কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়, বিনয় তাঁর ঈশ্বর-জিজ্ঞাসাকেও এই কাব্যে প্রকাশ করেছেন।

জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন :

'মানুষ কাউকে চায়, তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোন সাধনার ফল।'

(সুরঞ্জনা / বনলতা সেন)

জীবনানন্দ ঈশ্বরকে 'নিহত' হিসেবেই ধ'রে নিয়েছিলেন, তাই তাঁর কাব্যে ঈশ্বর বিষয়ে কোনো দার্শনিক জিজ্ঞাসা বা অন্বেষণ নেই। ক্ষুরধার, বিপদজনক এবং প্রায়শই বিধ্বংসী এই জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত চরম নাস্তিক্যবাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এবং এই জিজ্ঞাসার আগুনই বিনয় মজুমদারকে প্রায় সম্পূর্ণই পুড়িয়ে দিয়েছে।

বিনয়ের আধুনিক মন সনাতন ঈশ্বরের ধারণায় আস্থা স্থাপন করতে পারেনি অথচ ঈশ্বরের অনস্তিত্বকে তিনি নাস্তিকের মতো মেনেও নিতে পারেননি খোলা মনে। চিন্তা ও চেতনায় তিনি নাস্তিক, অথচ নিজের জীবনে তিনি আস্তিকের স্বস্তি ও শান্তি কামনা করছেন। তীব্র এই মানসিক দ্বন্দ্বে তিনি আশ্রয়হীন, গতিহীন, একা। 'ফিরে এসো, চাকা'য় কবি এই জীবনের মূল অবলম্বনের মতো গতিরই (অর্থাৎ ঈশ্বরেরই) অন্বেষণ করছেন, যদিও একথা তাঁর জানা যে, যে লুপ্ত গতি উদ্ধারের জন্য তাঁর এত হাহাকার, আকুলতা—তা তিনি কোনোদিনই লাভ করতে পারবেন না। 'ফিরে এসো, চাকা'র 'চাকা' আসলে গতির প্রতীক, লুপ্ত ঈশ্বর-বোধের প্রতীক। নাস্তিক হয়েও জীবনে আস্তিকের স্বস্তি ও শান্তি কামনা ক'রে বিনয় আসলে সচেতনভাবে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছেন। সচেতন ভাবে ভুলে থাকার প্রয়াস—এই 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থ—কবিতার জগতে সম্পূর্ণ নতুন একটি মাত্রা যোগ করেছে।

'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থে কোনো এক সুদূর নিষ্ঠুর, 'শাশ্বত মাছের মতো বিস্মরণশীলা'র বিরহে কবি কাতর। সুদীর্ঘ পথ হেঁটে হেঁটে তিনি ক্লান্ত, তাঁর দু-পায়ে রক্ত, তবু বিস্মরণশীলার দেখা নেই। 'ফিরে এসো, চাকা'র বহু কবিতাতেই এই 'বিস্মরণশীলা'র শারীরিক অস্তিত্ব প্রকট। আবার অনেক কবিতাতেই এই 'বিস্মরণশীলা'কে ঈশ্বরীর প্রতীক হিসেবে চিনতে কষ্ট হয় না :

'অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতার
সংবাদের মতো আমি জেনেছি তোমাকে, বাতাসের
নীলাভতাহেতু দিনে আকাশকে নীল মনে হয়।
বালুময় বেলাভূমি চিত্রিত করার পরেকার
তরঙ্গের মতো লুপ্ত, অবলুপ্ত তুমি মনোলীনা। ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃক্ষের প্রত্যঙ্গ নড়ে—এই দৃশ্য দেখেই কখনো
সে নিজে দোলনক্ষম—এই কথা পাখিদের মতো
ভুল ক'রে ভেবেছো কি, তোমার বাতাসে সে তো দোলে।'

আকাশের বর্ণহীনতার সংবাদের মতো কবি যাকে জেনেছেন, 'বৃক্ষের প্রত্যঙ্গ' যার বাতাসে নড়ে, সে তো রক্তমাংসের কেউ হতে পারে না! কিন্তু এই ধরনের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে-সঙ্গেই কবির এমনও মনে হয় :

'দৃষ্টিবিভ্রমের মতো কাল্পনিক ব'লে মনে হয়
তোমাকে অস্তিত্বহীনা, অথবা হয়তো লুপ্ত মৃত।

যাকে 'কাল্পনিক ব'লে মনে হয়'—আস্তিত্বহীনা, লুপ্ত অথবা মৃত মনে হয় তাকে খুঁজে পেতে চাইলে তো মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেবেই। নিজের এই ব্যাকুল অন্বেষণের অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার বিষয়েও কবি পূর্ণমাত্রায় সচেতন, কারণ তিনি বলছেন :

'করবী তরুতে সেই আকাঙ্ক্ষিত গোলাপ ফোটেনি
এই শোকে ক্ষিপ্ত আমি নাকি ভ্রান্তি হয়েছে কোথাও?

করবী তরুতে গোলাপ ফুটবে কী ক'রে? ভুল এই অন্বেষণের জন্য কবির মনে সুতীব্র এক মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিলো। সীমাহীন অবিশ্বাস নিয়ে তিনি সুদূর, নিষ্ঠুর অলীক এক মানস-প্রেমিকার প্রেমে মগ্ন হয়ে নিজস্ব এক মানসিক শান্তি খুঁজেছিলেন। মানস-প্রেমিকার জন্য এই হাহাকার ও অন্বেষণ অংশত ঈশ্বরের জন্য বিনয়ের হাহাকার ও অন্বেষণের প্রতীক। বিনয়ের প্রজ্ঞাই তাঁকে জানিয়েছিলো—তাঁর এই অন্বেষণের ফল শূন্য। তীব্র অনুভূতিশীল বিনয় সম্ভবত এই নিষ্ফল অন্বেষণের ফলেই তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। স্পিনোজার দর্শন বিনয়কে এই সংকট থেকে হয়তো মুক্ত করতে পারতো।

নিজস্ব অভিজ্ঞতার বিশ্বে তাঁর ঈশ্বরীকে খুঁজে না-পেয়ে বিনয় শেষ পর্যন্ত নিজেকেই একই সঙ্গে ঈশ্বর ও ঈশ্বরী ব'লে ঘোষণা করেন 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থে। এবার প্রশ্ন হলো, তিনি নিজেই যদি ঈশ্বর হন এবং ঈশ্বরী যদি তাঁর ভিতরেই অবস্থান করেন তাহলে 'ফিরে এসো, চাকা'র ব্যাকুল ও হাহাকারময় অন্বেষণের অর্থ কী? বোঝা যায়, নিজের বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করতেই বিনয়ের এই জোড়াতালি। বিনয় তাঁর বিস্মরণশীলাকে 'ফিরে এসো, চাকা'য় যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। যে নেই যেন তারই জন্য 'ফিরে এসো, চাকা'য় অন্বেষণ করা হয়েছে, অপেক্ষা করা হয়েছে। এ যেন 'করবী তরুতে সেই আকাঙ্ক্ষিত গোলাপ' ফুটবে ব'লে অপেক্ষা করা। ঈশ্বরীকে অর্থাৎ 'বিস্মরণশীলা'কে নিজের মধ্যেই কল্পনা ক'রে নিয়ে বিনয় তাঁর অযৌক্তিক অন্বেষণকে যুক্তিসিদ্ধ করতে চেয়েছেন। 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাবলী যেন তাঁর নিজের মধ্যকার ঈশ্বরীকেই নিবেদিত। তাই 'ফিরে এসো, চাকা' নামটি পরিবর্তন ক'রে বিনয় করেন 'আমার ঈশ্বরীকে'। 'ফিরে এসো, চাকা' নামটি পালটে কেন 'আমার ঈশ্বরীকে' করা হয়েছিলো এবং কেনই বা আবার 'আমার ঈশ্বরীকে' নামটি পালটে 'ফিরে এসো, চাকা' করা হয়? আমার এ প্রশ্নের জবাবে বিনয় আমাকে লিখেছেন : "ফিরে এসো, চাকা'র নামটি পালটে কেন আমি 'আমার ঈশ্বরীকে' করেছিলাম তার কারণ সোজা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন আমি আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এমন অবস্থায় পড়েছিলাম যে আমি ঈশ্বরীর শরণাপন্ন হয়েছিলাম। ধরো ঈশ্বরী স্বয়ং আবার নাম পালটে মূল নাম 'ফিরে এসো, চাকা, করেছেন।'

ঈশ্বরীর কবিতাবলী

বর্তমান গ্রন্থ-পরিচয় বিভাগে একাধিকবার 'ঈশ্বরীর কবিতাবলীর'র উল্লেখ করা হয়েছে ব'লে এই গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হলো।

'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' বিনয় মজুমদারের স্বতন্ত্র কোনো কাব্যগ্রন্থের নাম নয়। এই গ্রন্থে বিনয় তাঁর ইতিপূর্বে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে বিভিন্ন কবিতা সংকলিত করেছেন, তাছাড়া পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'অধিকন্তু'র ১০টি কবিতাও এই গ্রন্থে আছে। নিচে 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'র আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা দেওয়া হলো :

'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'র / কপিরাইট ধারক : বিনয় মজুমদার / প্রথম প্রকাশের তারিখ : ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ / ৩১শে জুলাই, ১৯৬৫ / প্রকাশক : দেবকুমার বসু / ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কোলকাতা—১২ / মুদ্রক : নির্মলকৃষ্ণ পাল / নির্মল মুদ্রণ / ৮ ব্রজদুলাল স্ট্রিট / কোলকাতা—৬ / মূল্য—২.০০ টাকা।

'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' ছাপা হয়েছে খুব সাধারণ ব্রাউন পেপারে, বই বিক্রি করার সময় বই বিক্রেতারা সাধারণত এই কাগজেই বই মুড়ে দেন।

এই গ্রন্থে 'আমার ঈশ্বরীকে' এবং 'ঈশ্বরী' কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া এই গ্রন্থে 'নক্ষত্রের আলোয়' থেকে ৭টি এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'অধিকন্তু'র প্রথম ১০টি কবিতা গৃহীত হয়েছে। 'নক্ষত্রের আলোয়' গ্রন্থের যে ৭টি কবিতা 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে দেওয়া হয়েছে, আগেই তাদের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে গৃহীত প্রতিটি কবিতার রচনাকাল দেওয়া হয়েছে। 'নক্ষত্রের আলোয়' গ্রন্থের ৭টি এবং 'অধিকন্তু'র প্রথম ১০টি কবিতার রচনাকাল 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' থেকে পাওয়া গেছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। এই গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলিকে পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত ক'রে মুদ্রিত করা হয়নি। মুদ্রিত করা হয়েছে গদ্যের মতো সম্পূর্ণ লাইন জুড়ে। দুটি লাইনের ভিতর পার্থক্য বোঝাবার জন্য '/'—এই চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়েছে।

অধিকন্তু

'অধিকন্তু' গ্রন্থের আখ্যাপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নিচে দেওয়া হলো :

অধিকন্তু কপিরাইট ধারক : বিনয় মজুমদার / রচনাকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫ থেকে এপ্রিল ১৯৬৭ / প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ / প্রকাশক : দেবকুমার বসু / ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরাস / কোলকাতা—২৯ / মুদ্রক সত্যপ্রসন্ন দত্ত / প্রাচী প্রেস / ৩২, পটলডাঙা স্ট্রিট / কোলকাতা—৯ / মূল্য ঃ ০.৭৫ টাকা।

আখ্যাপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সংক্রান্ত তথ্যাবলী দেবার পর নিচের দিকে বিনয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজুমদারের লেখা অন্যান্য বইপত্রের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে এইভাবে : 'বিনয় মজুমদার কর্তৃক লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ : Geometrical Analysis and Unital Analysis, Interpolatian Series, Roots of Calculus, নক্ষত্রের আলোয়, গায়ত্রীকে, 'ফিরে এসো, চাকা', আমার ঈশ্বরীকে, ঈশ্বরীর কবিতাবলী'

'অধিকন্তু' গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হবার আগেই 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে'অধিকন্তু'-র প্রথম দশটি কবিতা প্রকাশিত হয়।

'অধিকন্তু' গ্রন্থে কোনো উৎসর্গপত্র নেই এবং এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বিনয় মজুমদারের ৩৩-তম জন্ম দিনে।

মূল 'অধিকন্তু' গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় ২৩ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে একটি রেখাচিত্র মুদ্রিত হয়, বর্তমান 'কাব্য সমগ্র'তে সেই রেখাচিত্রটি দেওয়া হয়নি।

'অধিকন্তু' গ্রন্থটি বিনয় মজুমদারের কেমন লাগে তা আমাকে লেখা বিনয়ের নিম্নলিখিত পত্রাংশটি থেকে জানা যাবে ... "... 'ঈশ্বরীর' ও 'অধিকন্তু' বই দুখানা আমারই লেখা সুতরাং বই দুখানির প্রতি আমি প্রাণের টান অনুভব করি।"

অঘ্রানের অনুভূতিমালা

'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' গ্রন্থের আখ্যাপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নিচে দেওয়া হলো :

প্রথম প্রকাশ / শ্রাবণ ১৩৮১ / প্রকাশিকা / অরুণা বাগচী / অরুণা প্রকাশনী / ৭ যুগলকিশোর দাস লেন / কোলকাতা ৬ / প্রচ্ছদপট / পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় / মুদ্রক / দুর্গাপদ ঘোষ / শ্রী অরবিন্দ প্রেস / ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট / কোলকাতা—৬ / সর্বসত্ব সংরক্ষিত / তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

আমাকে লেখা একটি চিঠিতে বিনয় মজুমদার 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' গ্রন্থটি সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য চিঠির সেই অংশটি এখানে দেওয়া হলো :

"তুমি 'ফিরে এসো, চাকা'র সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করো—এটা আমার পক্ষে খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু আমি একটি বিষয়ে ভাবতাম—এখনো মাঝে মাঝে ভাবি। আমার 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'তে যা যা লিখেছি তা সবই যদি সত্য হয় তাহলে? যেমন ধরো কয়েকটি উদাহরণ :

১) মানসনেত্রের এক বিশ্ব আছে মানসের বিশ্বও বাস্তব / সকল মানসী তাই নির্ভুল অস্তিত্বময়ী। ...

২) 'দেহ আর মন এক বস্তু ...'

৩) 'শরীরই অন্তর আর অন্তরই শরীর'

সুতরাং সহজেই চ'লে আসে

৪) 'দেহ সঞ্চালন হলো ভাব সঞ্চালন মাত্র'

'শরীরই অন্তর আর অন্তরই শরীর' এই কথা সত্য হলে সমস্ত কিছু ভাবতে পারে। যারই শরীর আছে সে-ই ভাবতে পারে। পাথরের শরীর আছে, পাথরই তো একটা শরীরমাত্র—তাহলে পাথরও ভাবতে পারে।

৫) 'যখন ঝর্নার জল—যখন যে-কোনো জল বয়ে যায় তখন সে জলে / ভিতরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিতরে খুব নড়াচড়া বেড়ে যায় চলাচল বেড়ে গিয়ে থাকে /—এ সকল হলো চিন্তা ; ঝর্নার জলের চিন্তা ...'

তাহলে মৃত মানুষের শব দাহ ক'রে যে ছাই থাকে সেই ছাইও জীবিত।

৬) 'মৃত দেহে মন থাকে ... '

৭) 'মন ম'রে গেলে পরে যা থাকে তা—তাও মন মৃত্যুর নিয়মে।'

৮) 'আমি এ পাহাড়দের প্রায়ই নানা কথা বলি, বোঝাবার চেষ্টা করে থাকি, / মাঝে মাঝে বোঝে ব'লে মনে হয়, কিছু কিছু বোঝে ব'লে মনে হতে থাকে' ...

—এই প্রকারের আরো অনেক বিষয়ে ভাবনা 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'তে আছে। এইগুলি সত্য হলে—এসব ভাবনা এবং আমার বক্তব্যগুলি সত্য হলে এই 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' বইখানাও মূল্যবান ব'লে ধরা পড়ে।"

কমলকুমার দত্ত সম্পাদিত 'দহন পক্রিয়ার পত্ররূপ দাহপত্র' পত্রিকার ডিসেম্বর, ১৯৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আত্মপরিচয় : দ্বিতীয় পর্ব' প্রবন্ধে বিনয় 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' লেখার ইতিহাস বিবৃত করেছেন। এই প্রবন্ধটির প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে তুলে দিলাম। ''অমরেন্দ্র তখন কবিতা নিয়ে আরো একটি প্রবন্ধ লিখতে বলল। আমি আবার এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। বললাম একটা প্রবন্ধ লিখেছি, ওই যথেষ্ট। কিন্তু অমরেন্দ্র ছাড়ে না, বলে লিখতেই হবে। তখন আমি 'কাব্যরস' এবং 'অবয়ব ও অনুভূতি' নিয়ে দুটি প্রবন্ধ লিখলাম। এবং ভাবলাম এই প্রবন্ধ দুটিতে যেসব কাব্যতত্ত্ব লিখেছি সেইসব কাব্যতত্ত্ব দিয়ে একখানি কাব্যগ্রন্থ লিখি। তবে এই কাব্যগ্রন্থ যেন নারীভূমিকা বর্জিত হয়। নারীভূমিকা বর্জিত বই একখানা লিখলাম, দীর্ঘ সাতটি কবিতা লিখলাম। পরে প্রথম দুটি কবিতাকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে একটি কবিতা করলাম। ফলে কবিতা হলো মোট ছটি। অঘ্রান মাসে লিখেছি বলে নাম 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'। বইখানি নারীভূমিকাবর্জিত। এই বিশ্বসংসারে আমার একাকীত্বের কথা কবিতা ছটির উপজীব্য।'' এখানে অমরেন্দ্র বলতে বিনয় 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে বোঝাচ্ছেন। তাছাড়া, 'কাব্যরস' এবং 'অবয়ব ও অনুভূতি' প্রবন্ধ দুটিই পরবর্তীকালে একসঙ্গে 'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' সম্বন্ধে আর একটি তথ্যের উল্লেখ করি। এই গ্রন্থটি বিনয় লেখেন ১৯৬৬ সালের অঘ্রান মাসে অর্থাৎ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে, কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় আট বছর বাদে, ১৩৮১ বঙ্গাব্দে। দীর্ঘদিন ধ'রে কোনো প্রকাশক না-পেয়ে বিনয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'কে অনুরোধ করেন এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষণ করার জন্যে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রাজি না-হওয়ায় বিনয় 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'র পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করার অনুরোধ জানিয়ে ডাক মারফৎ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দেন। এই লাইব্রেরির বাংলা বিভাগে 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'র পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। বিনয় নিজে এই তথ্য আমাকে জানিয়েছেন।

□

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্ম ১৯৩৪-এর ১৭ সেপ্টেম্বর, তৎকালীন বার্মা অর্থাৎ আজকের মায়ানমারে। বার্মা ছাড়াও, তাঁর শৈশব কেটেছে আজকের বাংলাদেশের অন্তর্গত ফরিদপুর মহকুমার তারাইল গ্রামে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কৃতী ছাত্র বিনয়ের শিক্ষা শুরু ফরিদপুরে। পড়াশোনা করেছেন কলকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ছাড়াও প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং পরে শিবপুর বি ই কলেজে। বি ই কলেজের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিনয়ের সম্পাদনাতেই প্রকাশিত হয় বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অ্যানুয়াল সিলভার জুবিলি নাম্বার (১৯৫৬-৫৭)। রুশ ভাষা জানেন। রুশ থেকে বাংলায় তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫। কবিতায় সমর্পিত আত্মা বিনয়ের ১৯৫৮তে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নক্ষত্রের আলোয়' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যে বাংলা কাব্যভাষায় নতুন ধারার দিশারি এ-সত্য উপলব্ধি করা গিয়েছিল। পরবর্তী 'ফিরে এসো, চাকা' এবং 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা' গ্রন্থদুটি বাংলা সাহিত্যে বিনয়ের চিরায়ত সংযোজন। একাধিক কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও 'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ' বিনয়ের অন্যতম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন উজ্জ্বল প্রবন্ধ গ্রন্থ। অবিবাহিত এই কবি একলা দিনযাপন করতেন শিমুলপুরে, তাঁর গ্রামের বাড়িতে। জটিল মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় বিনয়কে মাঝে মাঝেই হাসপাতালে ভরতি হতে হয়। ১১ ডিসেম্বর ২০০৬ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~